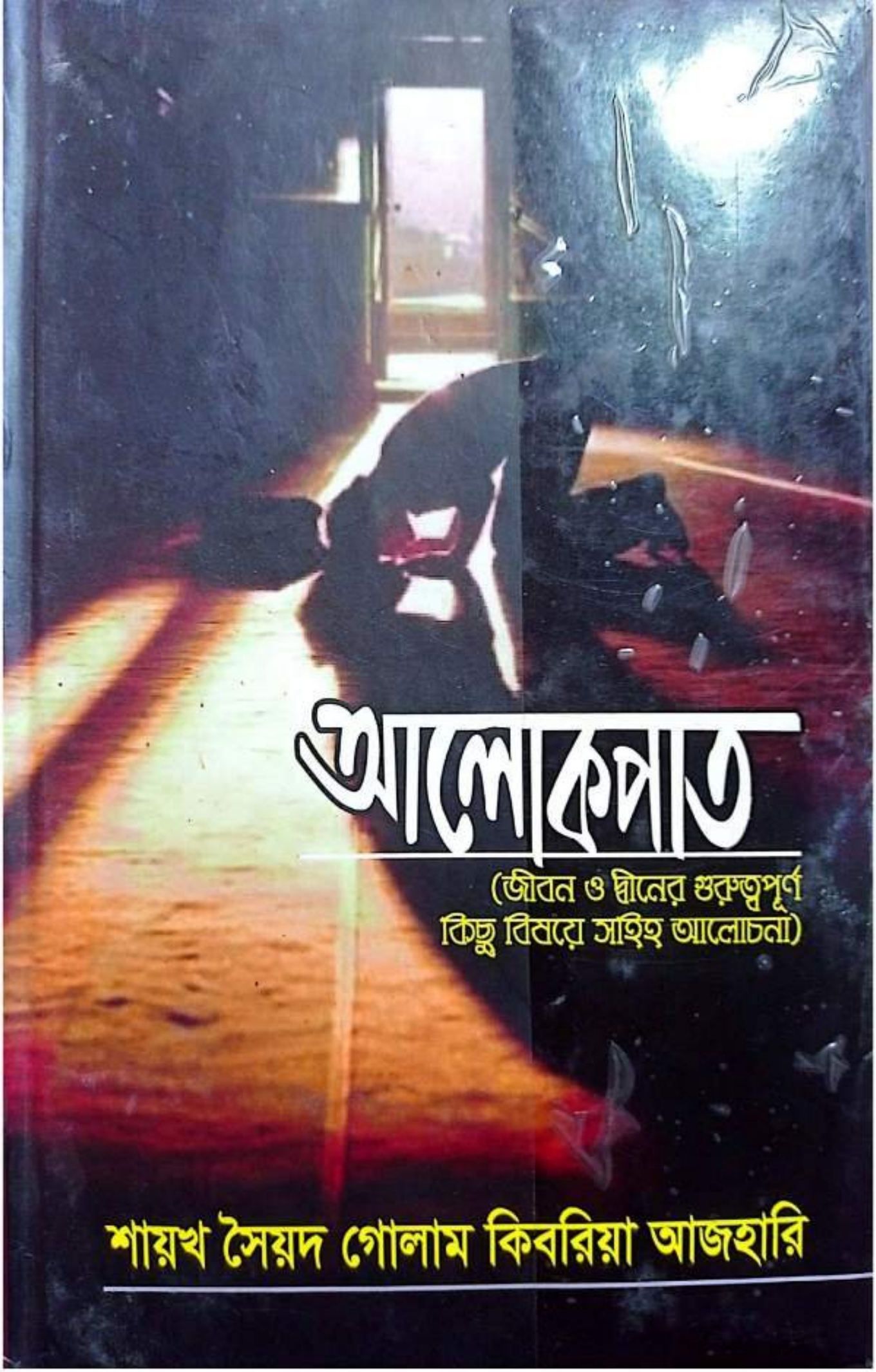

আলোকপাত

(জীবন ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ
কিছু বিষয়ে সহিহ আলোচনা)

শায়খ সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আজহারি

CamScanner

আলোকপাত

(জীবন ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সহিহ আলোচনা)

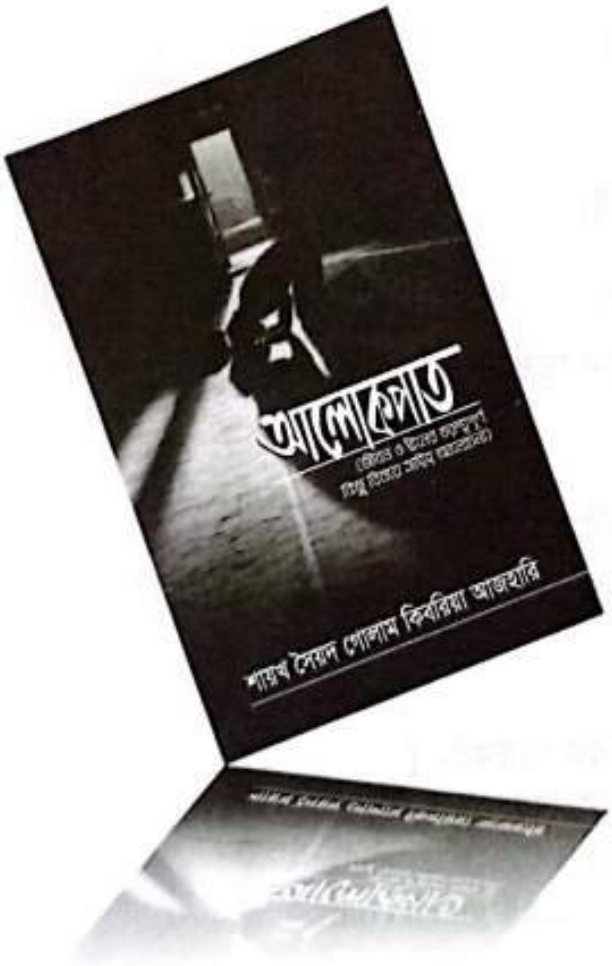

17.03.2020
6:56

শায়খ সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আজহারি

CamScanner

আলোকপাত

(জীবন ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সহিহ আলোচনা)

লেখক
শায়খ সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আজহারি
E-mail: sgkibria2008@gmail.com

স্বত্ব : গ্রন্থকার

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৯ইং

প্রচ্ছদ ডিজাইন:
ইমরান হুসাইন তুষার

অলংকরণ:
মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন
মোবাইল : ০১৮২৫৩৩৯৪৯৪

মুদ্রণ
জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্
২০৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১১-১৭৬৭২৩
E-mail: joynabpress@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান: লিবারেল ইসলামিক স্কুল, ঢাকা
কে-১০, (শাপলা বিল্ডিং সংলগ্ন) দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৩৯-৩৫০৮৭৫

হাদিয়া: ৩৫০/- টাকা

CamScanner

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা হযরত,জনাব সৈয়দ গোলাম মোস্তফা সাহেব এবং শ্রদ্ধেয় আম্মাজান বেগম সৈয়দা ফাহমিদা আক্তারের করকমলে।

বিশেষ করে আমার আম্মাজান বেগম সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার যার একমাত্র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি মিশরের প্রখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে যেতে পেরেছি এবং যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ গ্লোস্টারশায়ারে পড়ালেখা করতে যেতে পেরেছি।

CamScanner

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : আল্লাহর ভালোবাসা ১৩

- ভয়, আশা এবং ভালোবাসার সাম্যাবস্থা ১৩
- "ইকামাতুস সালাহ" আসলে কী জিনিস? ৪১
- আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদ প্রমাণ হয় নবীজির (ﷺ) নবুয়্যাত এবং সুমহান চরিত্রের প্রমাণের মাধ্যমে ৪৫
- আল কুরআনের প্রথম সুরা সূরা-ফাতিহা খানাও কি আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করি? ৫১
- আকিদাতে বিশ্বাসে কী শাখা-প্রশাখা (ফুরু) বলতে কিছু আছে? নাকি সবই মৌলিক বিষয় (উসুল)? ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রিয় নবীজির (ﷺ) ক্ষমতা ও মর্যাদা এবং সুমহান আখলাক ৬৪

- প্রিয় নবীজির (ﷺ) ক্ষমতা ও মর্যাদা আসলে আমরা কতটুকু বুঝি? ৬৪
- প্রিয় নবীজি (ﷺ) দেখতে কেমন ছিলেন? ৭৫
- মানুষকে ধোকা দেয়ার সর্ববৃহৎ অস্ত্র এখন একটিমাত্র বাক্য- "আমার পরিচয় আমি শুধু মুসলিম" ৭৮
- হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে কীভাবে দেখা যায়? হযরত বায়েজিদ বুস্তামির রাহ. আম্মাজানের চমৎকার কিছু উপদেশ ৮৪
- হে উম্মত! আপনার প্রিয় নবীকে (ﷺ) জানুন ৯২
- পবিত্র শরীরে পবিত্র স্থানে সকল সময় দরুদে মশগুল থাকা যায় ৯৬

- দরুদ শরিফ পাঠের মহান ফজিলত, ঘটনা-১ ৯৭
- দরুদ শরিফ পাঠের মহান ফজিলত, ঘটনা-২ ৯৯
- দরুদ শরিফ পাঠের মহানফজিলত, ঘটনা-৩ ১০০
- পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবির (ﷺ) অলৌকিক ক্ষমতা ১০৩
- উম্মতে মুহাম্মদির (ﷺ) শেষ ভরসা ১০৪

তৃতীয় অধ্যায় : প্রিয় নবীজির (ﷺ) সুমহান চরিত্র ১০৬

- শেষ নবীর (ﷺ) ধৈর্য্যের পরীক্ষা: এক ইহুদী পন্ডিতের ইসলাম গ্রহণ ১০৬
- সর্বশ্রেষ্ঠ সফল রাষ্ট্রনায়ক ১০৮
- হুজুর পাক নবী করিমের (ﷺ) অনুপম আদর্শ ১১১
- মানুষের সাথে দয়ার নবীজির (ﷺ) আচার-ব্যবহার ১১৩
- প্রিয় নবীর (ﷺ) প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কোন দ্বিধা সংকোচ করবেন না ১১৪
- গুনাহগার উম্মতের জন্য হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) অসাধারন দোআ ও মায়া! ১১৬
- সীরাতের পুলের কাছে প্রিয় নবীজির (ﷺ) কান্না ১১৬
- আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত, আর আমরা? ১১৭
- হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সুমহান চরিত্রই ছিল তাঁর বড় মুজিযা ১১৯

চতুর্থ অধ্যায় : আহলে বায়ত বা নবী পরিবার ১২১

- প্রিয় নবী (ﷺ) পরিবারকে আঁকড়ে ধরার হাদিস মুতাওয়াতির বা অকাট্য সনদে কেন এলো? ১২১
- আলী কুরআনের সাথে আর কুরআন আলীর সাথে ১২৯
- মুসলিম জাতির উপর আজাব আসার কারণ! ১৩১

CamScanner

- "গদির ডিক্লেয়ারেশন" মাওলা আলীর অভিষেক দিবস ____ ১৩৩
- মাওলা আলী রা. গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক ____ ১৩৬
- ইমাম হাসান ইবনে আলী রা. পঞ্চম খলিফায়ে রাশিদ, একটি অজানা সত্য ____ ১৩৯
- ইমাম হোসাইন রা. কারবালার জমিনে কেন গিয়েছিলেন? ____ ১৪১
- কারবালার জমিনে ইমাম হোসাইনের জীবনের শেষ জ্বালাময়ী ভাষণ ____ ১৪৫
- হোসাইনিয়াত ও ইয়াজিদিয়াত কেয়ামত পর্যন্ত বহমান দুটো বিপরীত ধারার চেতনার নাম ____ ১৪৬
- কারবালার চেতনা- জেনারেল শিক্ষিত ভাই ও বোনদের করকমলে আরজি! ____ ১৫৫
- আপনার সন্তানকে যদি 'হোসাইনি সৈনিক' বানাতে চান! ____ ১৫৬
- প্রিয় নবীর (ﷺ) আহলে বায়তের (আলাইহিমুস সালাম) হিকমতের (প্রজ্ঞার) পরিচয় ____ ১৬০
- ইয়াজিদ কি কাফির ছিল না মুসলমান? ____ ১৬২
- জালিমের ঘরে আলীম পয়দা: লা'নতি ইয়াজিদের পুত্র হযরত মুয়াবিয়া-২ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর খুতবা ____ ১৬৫
- আল্লামা যাহাবির বর্ণনা দৃষ্টিতে এজিদ বিন মুয়াবিয়া ও তাঁর মৃত্যু ____ ১৬৮
- সৌদি রিয়ালখোর ইয়াজিদপন্থী মোল্লাদের প্রতি! ____ ১৬৯
- মোহাররম মাস, শিয়া ফিতনা থেকে সাবধান! ____ ১৭৩
- প্রতিদান আহলে বায়তে আতহারের কাছে চাই! ____ ১৭৬

পঞ্চম অধ্যায় : তাসাউফ ও আখলাক ____ ১৭৯

- সুফিগণের তরিকা- সবার জন্য ভালোবাসা ____ ১৭৯
- এক মুসলমান সম্পর্কে আরেক মুসলমানের কি ধারণা থাকা উচিৎ: সায়্যিদ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রাহ. শিক্ষা ____ ১৮৯

CamScanner

- অশ্লীল নাটক, সিনেমা স্লো-পয়জনিং (ধীরগতির বিষ) ১৯১
- সুফিয়ানা তাফসির বা তাফসিরে ইশারি: সূরাতুল বাক্বারার ৮ খানা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ১৯৬
- বিস্মৃত কথা শোনার কলা! ২০২
- আল্লাহর বন্ধুগণের ইবাদাত ও মুফতির ইবাদাত ২০৩
- শায়খ মোহাম্মদ মোতাওয়াল্লি শা'রাবির রাহ. কঠিন আত্মশুদ্ধির সাধনা ২০৬
- সূরা কাহফেই 'মুর্শিদ ও ওলি' শব্দ দুখানা এলো কেন? ২০৮
- একজন ইমাম ও কৃষ্ণাঙ্গ দাসের অসাধারন কাহিনী ২১০
- একটি গল্প, আমাদের জন্য রুহানী শিক্ষা ২১৩
- সলফে সালিহিনের আখলাক ২১৬
- নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মাঝে আছে; একজন সাধকের অনুধাবন ২১৬
- এক মজ্জুব আল্লাহর ওলির অত্যাশ্চর্য ঘটনা! ২১৮
- হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রাহ. সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির মধ্যকার শিক্ষনীয় ঘটনা ২১৯
- 'আমিত্ব' একমাত্র পর্দা যা দীদারে ইলাহির অন্তরায় ২২১
- হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর রাহ. কাফন চোরের ঘটনা ২২৩
- সুফিগণের সুফিয়ানা আখলাক ও কালাম ২২৪
- মোল্লাতান্ত্রিক তাসাউফ-তরিকত কেন ইমাম গাজ্জালী রাহ. ছুড়ে ফেলেছিলেন? ২২৭
- সুফি ইমাম শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানীর রাহ. প্রজ্ঞা ২২৮
- অপ্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আমাদের মেমরি ফুল, কুরআন-হাদিস ও দোয়া মনে থাকবে কোথা থেকে? ২৩০
- যা চোখে দেখা যায়, তা সবসময় সত্যি হয় না! ২৩২
- তরিকত ও তাসাউফ কি? ২৩৪

CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায় : বিবিধ ২৫১

❖ ব্যক্তিগত আহবানে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)' বলে সমস্বরে আওয়াজ তোলা অথবা মিছিলে স্লোগান দেয়া ২৫১

❖ রেজা গিয়েছিল নানাশ্বশুর বাড়ি বেড়াতে, খেয়ে এলো শিরকের ফতোয়া! ২৫৮

❖ এরপরও কী বিশ্বাস করবে না অবিশ্বাসীরা? ২৬৮

❖ দাওয়াতের হিকমত ২৬৯

❖ যারা বলেন জিকিরের মাজলিস বলতে জ্ঞানচর্চার মাজলিসকেই বুঝানো হয়েছে তাদের জন্য ২৭১

❖ নির্দিষ্ট একটি মাযহাবেরই অনুসরণ কেন করতে হবে? ২৭২

❖ মাযহাবি মতপার্থক্য হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) জমানাতেও ছিল ২৭৫

❖ অনুসরণ কেন চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ! ২৭৭

❖ ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষিত মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি একটি বিনীত অনুরোধ! ২৮০

❖ আমি মাযহাব মানি না- বলাটা অহংকার ও দাম্ভিকতার লক্ষণ ২৮৩

❖ হাদিস 'সহিহ' হলেই কী আমলযোগ্য?: ইমাম আ'লা হজরতের দৃষ্টিকোণ ২৮৪

❖ উসূলে ফিকহে ইমাম আ'লা হযরতের রাহ. যুগান্তকারী অবদান ২৮৬

❖ ইতিবাচক হোন, নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ বদলান, নিন্দুকের কথায় কান দিবেন না! ২৯১

❖ মুমিনের বৈশিষ্ট্য ২৯২

❖ সমালোচনা ও জবাবদিহিতা: ফারুকে আজম হযরত ওমর রা. ২৯৪

❖ আশিকে রাসূল (ﷺ) আগে হতে হবে নাকি উম্মতে রাসূল (ﷺ) হতে হবে আগে? ২৯৭

❖ হুজুর নবী করীমের (ﷺ) পবিত্র কবর শরিফকে আমরা 'রওজা' বলি কেন? ৩০৯

- আমল ও মুহাব্বাত এক নয় ৩১০
- আল্লাহর জিকির ও ইস্তিগফারের ফজিলত ৩১১
- সফল-সুখী দাম্পত্যজীবনের মূল রহস্য ৩১৩
- কতগুলো খুব চটকদারী ডায়লগ ও আমার জবাব ৩১৪
- সবার জন্য পবিত্র 'রবিউস সানী' মাসের উপহার! ৩২১
- দুর্বল হাদিসের উপর সবলদের অত্যাচার ৩২২
- পোশাক-পরিচ্ছদ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৩৩১
- পুরুষের জন্য টাকনু-গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে (إسبال الثوب) চলার হুকুম ৩৩৬
- আমাদের হুজুরদের বিজ্ঞান ভাবনা-টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলানো সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ৩৩৮
- চেয়ারে বসে নামাজ পড়া ৩৩৯
- দুই বন্ধুর তুমুল বিতর্ক : প্রসঙ্গ খারাপ বিদআত ও ভাল বিদআত ৩৪২
- একটি উন্নত মানের 'কেরানী প্রজন্ম' অথবা 'শিক্ষিত দিনমজুর প্রজন্ম' অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য! ৩৫৫

CamScanner

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক এবং লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম প্রিয় নবীজির (ﷺ) ওপর, তাঁর পরিবার এবং সাহাবাগণের ওপর। আলোকপাত বইটি আমার প্রকাশিত প্রথম বই। বইটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। জীবন ও দ্বীনের বেশ কিছু গুরুতপূর্ণ বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকগুলো লেখা হয়ত পাঠকেরা বিচ্ছিন্নভাবে অনলাইনে পড়েছেন। তবে সবগুলো লেখা একসাথে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা বহুদিন থেকেই মনে পোষণ করে রেখেছিলাম, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাস রহমতে অবশেষে সম্ভব হয়েছে।

বইটিতে মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা, ভয় এবং রহমতের আশা, আকিদার কিছু বিষয়, প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা, সম্মান ও অনুসরণের গুরুত্ব, প্রিয় নবীজির (ﷺ) আহলে বায়তের মর্যাদা ও গুরুত্ব, তাসাউফ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শেষ একটি অধ্যায়ে দ্বীনের বিবিধ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সোশাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন পাঠকের এমন একটা মন-মানসিকতা গড়ে ওঠেছে যে, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পুরো ২০০ পৃষ্ঠার একটি বই কেউ পড়তে আগ্রহী না। বরং কোন একটি

CamScanner

বিষয়ের ওপর সংক্ষেপে আলোচনা পড়তে আগ্রহী। মূলত পাঠকদের এই চাহিদাকে সামনে রেখেই আমি এগিয়ে গিয়েছি। "আলোকপাত" আশা করি সবার ভাল লাগবে।

ভুলভ্রান্তি মানুষের থাকবেই, আমি মানুষ, ভুলের উর্ধ্বে তো অবশ্যই নই। এই বইতে ভাল যা কিছু আছে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাস রহমত, আর ভুলের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। যদি এরকম কোন কিছু কারো দৃষ্টিগোচর হয়, দয়া করে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে শোধরানোর চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।

সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আজহারি
অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লিবারেল ইসলামিক স্কুল, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৬৩৯-৩৫০৮৭৫

CamScanner

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্‌র ভালোবাসা
ভয়, আশা এবং ভালোবাসার সাম্যাবস্থা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে একমাত্র ইলাহ এবং হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে শেষ রাসুল ও নবী হিসেবে মেনে নিয়ে তিনি যত কিছু নিয়ে এসেছেন সকল কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে আমরা ইসলামে প্রবেশ করি, অর্থাৎ আমরা ঈমানের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু আমাদের মাঝে ১। আল্লাহর (ﷻ) প্রতি ভালোবাসা (মুহাব্বাত), হুজুর নবী করিমের (ﷺ) প্রতি ভালোবাসা, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়ত এবং আল্লাহর আউলিয়াগণের প্রতি ভালোবাসা ২। আল্লাহর ভয় (খউফ), দোজখের আজাবের ভয়, কাল হাশরের ময়দানের ভয়াবহতার ভয় এবং ৩। আল্লাহ পাকের রহমতের আশা (রেজা), তাঁর ক্ষমা পাওয়ার আশা, হুজুর নবী করিমের (ﷺ) শাফায়াত লাভের আশা, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের শাফায়াত লাভের আশা, এই তিনটি গুণ অর্থাৎ আল্লাহর ভয়, রহমতের আশা এবং মুহাব্বাতের মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্যতা বিরাজ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সত্যিকারের মুমিন হতে পারব না।

এদের একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির উপরে বেশি জোর দেয়া মোনাফিকির লক্ষণ। আর ভয়, আশা এবং মুহাব্বাত এই তিনটি জিনিসের মাঝে সমতাবিধান শিক্ষা দেয়াই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম, আর এটাই তরিকত ও তাসাউফের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। যেমনটা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআন শরিফে ইরশাদ করেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহ্বান করো ভয়ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (সূরা আরাফ, সূরা নং ৭: আয়াত নং ৫৬)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক (জাল্লাজালালুহু) আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, আমরা যেন তাঁর ইবাদত করি ভয় ও আশা সহকারে। এই গুণগুলো হাসিল করা সম্পূর্ণ সাধনা ও রিয়াজতের ব্যাপার। শুধু শরীয়তের জ্ঞান দ্বারাও এটি অর্জিত হবে না, আবার কারো ওয়াজ-নসিহতের কারণেও এটি অর্জিত হবে না। বরং এটি নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই জিহাদকেই হুজুর নবী করিমের (ﷺ) পরিভাষায় জিহাদে আকবার" বা বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

আবার অন্যদিকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (জাল্লাজালালুহু) ইরশাদ করছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রবল" (সূরা বাকারা, সূরা নং-২, আয়াত নং-১৬৫)

কাজেই উপরোক্ত দুই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহর (জাল্লাজালালুহু) প্রতি ভয়, ভালোবাসা এবং তাঁর রহমতের আশার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা খুব জরুরী।

CamScanner

অনুচ্ছেদ-১ : আল্লাহর (ﷻ) ভয়

আমরা যেখানেই আছি, যে অবস্থায়ই আছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা। আমরা যখন গোনাহের কাজে লিপ্ত হই তখন তিনি আমাদেরকে দেখছেন এই বিশ্বাস রেখে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের ইজ্জত ও জালালতের দিকে তাকিয়ে, যে গোনাহের রাস্তা ছেড়ে দেয় এবং গুনাহ থেকে নিজেকে পরহেজ করে, সেই সত্যিকারের মুমিন। যেমনটা আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন-

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইযযত নষ্ট করো না। (সূরা হিজর, সূরা নং-১৫, আয়াত নং-৬৯) আল্লাহ পাক (جل جلاله) আরো বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

"আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা।" (সূরা বাকারা, আয়াত নং -২০৬)

মানুষ যদি আল্লাহর (جل جلاله) ভয়ে গুনাহ ছেড়ে দেয়, তবে আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে তার ঈমান বাড়িয়ে দেন, যেমনটা ইমাম তাবরানি তাঁর মু'জামুল কাবিরে বর্ণনা করেছেন:

روى الطبراني في الكبير أن رسول الله ﷺ قال: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه.

"হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় (পুরুষের জন্য বেগানা মেয়েলোকের দিকে আর মেয়েলোকের জন্য বেগানা পুরুষের দিকে)

CamScanner

নজর ইবলিসের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি তীর। যদি কেউ তা আল্লাহর ভয়ে ছেড়ে দেয় তবে আল্লাহ তাআ'লা এর বিনিময়ে ঈমান দান করেন, যার স্বাদ সে তার অন্তরে অনুভব করে।"

আর আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের (ﷻ) সামনে আমাদেরকে কাল হাশরের ময়দানে দাঁড়াতে হবে, এই ভয়ে যদি আমরা গোনাহের রাস্তা ছেড়ে দেই, গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখি, নফসের খায়েশ খেয়াল মোতাবেক চলা থেকে নিজেকে বিরত রাখি তবে এর বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

যেমনটা আল্লাহ পাক (ﷻ) ইরশাদ করছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাজিয়াত, আয়াত নং-৪০-৪১)

বরং এরকম পরহেজগার মোত্তাকী বান্দার জন্য আল্লাহ পাক (ﷻ) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন, যেমনটা আল্লাহ পাক (ﷻ) ইরশাদ করছেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয়রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি জান্নাত। (সূরা আর রাহমান, সূরা নং ৫৫: আয়াত নং ৪৬)

আর যদি আমরা নফসের খায়েশ খেয়ালে বা শয়তানের ধোকায় পড়ে পাপের মধ্যে ডুবেই থাকি তবে জানতে হবে যে, আল্লাহর

(ﷻ) পাকড়াও খুব কঠিন। আল্লাহর (ﷻ) নিয়ামত ভোগ করে আমরা যদি তাঁর নাফরমানি করি তবে কাল হাশরের ময়দান হবে আমাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক।

যেমনটা আল্লাহ পাক (ﷻ) ইরশাদ করছেন,

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (সূরা আল বুরুজ, আয়াত নং-১২)

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক (ﷻ) আরো বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নং-৭)

আমরা যারা এই দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত আছি, আমরা কী এই দুনিয়াকে স্থায়ী মনে করা শুরু করেছি? কখনোই নয়। এই দুনিয়া কারো জন্য স্থায়ী ঠিকানা নয় এবং এই দুনিয়ার নিয়ামতও কারো জন্য স্থায়ী নয়। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (ﷻ) পবিত্র কুরআন শরিফে এই মর্মে ইরশাদ করেন,

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ

তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে?

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে?

CamScanner

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (সূরা - আশ-শুআরা, সূরা নং ২৬: আয়াত নং ১৪৬-১৪৮)

ঐ কঠিন দিনে قهار (কঠোর পরাক্রমশালী) এবং انتقام ذو (প্রবল পরাক্রমশালী কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী) আল্লাহর (ﷻ) ভয় অন্তরে থাকতে হবে। আল্লাহ পাক এই মর্মে বলেন:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"ঐ দিনকে ভয়কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হবে না। (সূরা বাকারা, সূরা নং -২, আয়াত নং -২৮১)

হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

رَوى ابنُ حِبَّانَ والترمذيُّ في جامِعِه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:

" لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ

"বান্দা কাল কেয়ামতের দিনে, ময়দানে পা পড়া মাত্র ৪ টি বিষয় সম্পর্কে জবাব না দিয়ে যেতে পারবে না। তার আয়ু কোথায় সে তা নিঃশেষ করেছে, তার শরীর (অন্য বর্ণনায় এসেছে যৌবন) কোথায় সে নিঃশেষ করেছে। যে জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছিল সে অনুযায়ী সে

কী আমল করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে সে তা উপার্জন করেছে, কোথায় খরচ করেছে"। (তিরমিজি ও সহিহ ইবনে হিব্বান) ✓

অপর সহিহ একখানা হাদিসে এসছে, প্রথম যে বিষয় সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে সালাত, নামাজ, আল্লাহর ইবাদাত।

কাজেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে জবাবদিহী ভিন্ন আমরা পাড় পাব না। আমরা আমাদের জীবন কোথায় কাটাচ্ছি, সময় বাজে কাজে অপচয় করছি কী না? যৌবন কী পাপ কাজে কাটাচ্ছি নাকি নেককাজে তার জবাবদিহি দিতে হবে। সূদ, ঘুষ, অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা সহ যেসব গোনাহের মাধ্যমে আমরা সম্পদ অর্জন করছি তার জবাব দিতে হবে। অশ্লীল ও ফাহেশ কাজে আমরা আমাদের সম্পদ ব্যয় করছি কিনা, অযথা অপচয় করছি কিনা তার জবাব দিতে হবে। মানুষই একমাত্র বিবেক ও জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী। কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ সেই জ্ঞান আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। তার বিবেক বিবেচনা না খাটিয়ে পাপে লিপ্ত থাকলে তার জবাবদিহিও আল্লাহর কাছে আমাদেরকে দিতে হবে। সেই পাকড়াও হবে ভয়াবহ পাকড়াও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন,

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (সূরা আল বুরুজ, আয়াত নং-১২)

CamScanner

অনুচ্ছেদ-২: আল্লাহর (ﷻ) ক্ষমা ও রহমতের আশা

মানুষ শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে "ইনসান"। এই ইনসান শব্দটি ن-س-ي এই তিন মূল অক্ষর বা মাদ্দাহ থেকে নির্গত। نسي শব্দের শাব্দিক অর্থই হলো ভুল-ভ্রান্তি। কাজেই মানুষ পাপ করবে, ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ভুল করার পর ভুলের উপর অটল থাকে, আল্লাহর (ﷻ) ক্ষমার আশা রাখে না, তাঁর রহমতের পরোয়া না করে, তওবা ও ইস্তেগফার করে না, সে হচ্ছে পথভ্রষ্ট। ভুল করার পর, গোনাহের কাজ করার পর যদি কারো অন্তরে অনুশোচনা আসে তবে সে প্রকৃত মুমিন।

কাজেই মানুষ একদম নিষ্পাপ, নির্ভুল ও নিষ্কলুষ হবে এটা আল্লাহ পাকও (ﷻ) চান নাই। এর জন্য মানুষ সৃষ্টি করারই প্রয়োজন ছিল না। ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিলেন। যারা শুধু আল্লাহ পাকের (ﷻ) আনুগত্যই করতেন। বরং সহীহ মুসলিম শরিফে এসেছে যে,

قال الرسول ﷺ: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم

হুজুর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা পাপ না কর তবে আল্লাহ তাআলা (ﷻ) তোমাদেরকে মিটিয়ে দিয়ে অপর এক জাতি আনবেন, যারা গুনাহ করবে অতঃপর আল্লাহ পাকের (ﷻ) কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

কারণ মানুষ যদি গুনাহ না করে তবে আল্লাহ (ﷻ) ক্ষমা করবেন কাকে? আর ক্ষমা করার সুযোগ না থাকলে আসমাউল হুসনাসমূহে আল্লাহ পাকের (ﷻ) দু'খানা নাম মুছে যাবে যা হলো- গাফুর ও

CamScanner

গাফফার। কাজেই আল্লাহর (ﷻ) কোন বান্দা গুনাহ করে ফেললে যখনই তার অনুশোচনা আসবে সঙ্গে সঙ্গে তাওবাতুন নাসুহা করে নিবে, ইস্তেগফার পাঠ করা শুরু করবে। দৃঢ়চিত্ত হতে হবে যে আর কোনদিন গোনাহে নিপতিত হব না, তাতেই ক্ষমা লাভ করবে।

বারবারও যদি কেহ গোনাহে নিপতিত হয় তবুও আল্লাহর (ﷻ) রহমতের আশা এবং ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। যেমনটা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (ﷻ) ইরশাদ করছেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আজ জুমার, সূরা নং ৩৯: আয়াত নং ৫৩)

সূরা ইউসুফে আল্লাহ পাক (ﷻ) ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভাষায় বর্ণনা করছেন:

وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায়, ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয়না। (আয়াত নং- ৮৭)

কাজেই আল্লাহর (ﷻ) ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হওয়া এবং তাঁর রহমতের আশা থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া মোনাফিকির লক্ষণ। কারণ কেহ শিরক করা ব্যাতীত পাহাড় পরিমাণ গুনাহ করেও যদি

CamScanner

আল্লাহর (ﷻ) সামনে দাঁড়ায় তাহলে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহর নিকট কায়মনো বাক্যে তওবা যদি করে কেউ তবে আল্লাহ (ﷻ) তাকে শিরকসহ সকল প্রকারের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যেমনটা আল্লাহ পাক (ﷻ) ইরশাদ করছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (সূরা নিসা ৪: আয়াত নং-৪৮)

কাজেই পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকাবস্থায়ও যদি আমাদের বোধোদয় হয় অর্থাৎ অনুশোচনা আসে তবে সাথেই সাথেই তওবা করা উচিত। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ পাক (ﷻ) তাঁর গুনাহগার বান্দাদেরকে ডেকে বলছেন-

يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ

"হে আমার আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ আকাশের মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায় অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও তবে আমি ক্ষমা করে দেব।" (সুনান তিরমিজী) যেমনটা হাদিস শরিফেও ইরশাদ হয়েছে,

كل بني آدم خطاء و خير الخطاء التوابون

হুজুর রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে, "প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে, আর উত্তম ভুলকারী সেই যে তওবা করে।"

তওবা সম্পর্কে হাদিস শরিফে আরো এসেছে যে,

CamScanner

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাতে তাঁর কুদরতী হাত (রুপক ভাবে রহমত অর্থে) বিছিয়ে দেন দিনের বেলায় গুনাহগাররা তওবা করবে এজন্য, আর দিনের বেলায় তাঁর কুদরতী হাত বিছিয়ে দেন রাতের গুনাহগাররা তওবা করবে এজন্য। যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়" (অর্থাৎ কেয়ামতের আগে পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে)। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ পাক (جل جلاله) হাদিসে কুদসীতে তাঁর নিজের সম্পর্কে আরো বলেন,

انا عند ظن عبدي بي

"আমার বান্দার আমার সম্পর্কে ধারণা যেমন আমি তেমনই। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ সে যদি আমাকে রাহীম রাহমান রুপে চেনে, তবে আমি পরম দয়ালু ক্ষমাশীল। আর যদি আমাকে শুধু কাহহার ও আজিজুন জুনতিকাম হিসেবে চিনে তবে আমি কঠোর ও পরম প্রতিশোধ পরায়নই।

আল্লাহ পাকের স্বীয় রহমত ও করুনা সম্পর্কে হাদিস শরিফে আরো ইরশাদ হয়েছে যে,

إن لله عز وجل مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والسباع وذخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة

"আল্লাহ তা'আলার একশ রহমত আছে (রহমতের একশ অংশ আছে) এর মধ্যে শুধুমাত্র এক অংশ মানব, জ্বীন, পশুপাখির জন্য

নাজীল করা হয়েছে (দুনিয়াতে), বাকি নিরানব্বই ভাগ কাল কেয়ামতের দিনের জন্য জমিয়ে রাখা হয়েছে।" (বোখারী ও মুসলিম)

এই সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে একখানা হাদিস উল্লেখ না করলেই নয়।

عن النبي ﷺ قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة

নবী করিম (ﷺ) বলেছেন যে, "যে মন থেকে খালিসভাবে স্বাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদিসগুলো নবী করিম (ﷺ) এক সময় তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণকে বর্ণনা করতে নিষেধও করেছিলেন, কারণ মানুষ এসবের উপর নির্ভরশীল হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশার সাথে সাথে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমলও করতে হবে। এর উপর নির্ভর করে আমল বন্ধ করা যাবে না। কারণ আল্লাহ পাক মানুষের নিয়তের দিকে দেখবেন, মানুষ তার অন্তরে কী নিয়ে হাজির হয় তাও দেখবেন। সেই অন্তরে তওবা ও ইস্তেগফারের নিয়ত ছিল কি না তাও দেখা হবে।

আমল ও নেক কাজ কোন অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না, কারণ কেউ জানে না পরম করুনাময়ের এই দয়ার অধিকারী কে হবে। কাজেই তওবা-ইস্তেগফার ও নেক আমল ছাড়া যাবে না। কারণ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই ক্ষমা করেন।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তওবা সূরা নং ৯: আয়াত নং ২৭)

CamScanner

অনুচ্ছেদ-৩: হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) শাফায়াতের আশা

এই সিরিজে এর আগের অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা জেনেছি আল্লাহর (ﷻ) ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা সম্পর্কে। এই পর্বে আমরা ইনশাআল্লাহ জানার চেষ্টা করব যে হুজুর নবী করিম (ﷺ) এবং আরো যারা কাল হাশরের ময়দানে কঠোর নিদানের সময়ে গুনাহগার মুসলমানদিগকে শাফায়াত করবেন ইসলামি শরীয়তে তাঁদের সেই শাফায়াতের অবস্থান কি!

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, শাফায়াত অর্থ হচ্ছে সুপারিশ। কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহর (ﷻ) গুনাহগার মুমিন মুসলমান বান্দাগণ যখন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়বে তখন আল্লাহর রাসূলগণ, শোহাদায়ে কেরাম, সিদ্দীকিন ও আল্লাহর আউলিয়াগণ, হুফফাজুল কুরআন এবং কুরআন স্বয়ং আল্লাহ তাআলার (ﷻ) নিকট গুনাহগার মুমিন মুসলমান বান্দাদের জন্য নাজাতের সুপারিশ করবেন এবং আল্লাহ পাক (ﷻ) তাঁদের সেই সুপারিশ গ্রহণ করবেন। তবে আমাদের সমাজে কিছু কিছু মুসলমানের মধ্যে শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে। একদল আছে যারা শাফায়াতকে পারলে অস্বীকার করেন। আর অস্বীকার না করলেও প্রচন্ড হেয় ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। অথবা তারা নিজেদের আমলের উপর বেশি নির্ভর করেন। আর মুসলমানদের আরেকদল শাফাআতের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলমূলক কথা বলেন এবং আমল করতে আলসেমি ও গাফিলতি করেন। এই দুটো দিকই পরিষ্কার গোমরাহী এবং কুরআন হাদিস না বুঝার কারণেই এমন হয়।

যারা শাফায়াত অস্বীকার করেন বা করতে চান তাদের জন্য বলে রাখি, কুরআন শরিফে যত জায়গায় শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না, শাফায়াতকারী থাকবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলো আয়াতই কাফিরদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। এ ব্যাপারে সবাই

একমত যে অমুসলিমরা শাফাআত পাবে না। কাজেই শাফায়াতের জন্য শর্ত হচ্ছে কালিমায়ে শাহাদাতে মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও মুখে স্বাক্ষ্য দিতে হবে এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

যেমন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (ﷻ) সূরা মুদ্দাসসিরে উল্লেখ করেছেন যে, কাফিরগণ কাল হাশরের ময়দানে আফসোস করে বলবে যে,

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।

حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ

আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

অতএব, সুপারিশকারীগণের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত নং -৪৬-৪৮)

তারা আরো বলবে যে,

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ

অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই।

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হায়, যদি কোনরুপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (সূরা শোআরা, সূরা নং -২৬, আয়াত নং-১০০- ১০২)

CamScanner

যারা শাফায়াত মানতে চায় না তারা নিচের আয়াতখানা দিয়েও দলিল দেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত নং -৪৮)

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, এই আয়াতগুলো অমুসলিমদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। শাফায়াতের পক্ষে অনেক অনেক আয়াত আছে কুরআনুল কারীমে, যেমন আল্লাহ পাক (جل جلاله) আয়াতুল কুরসীতে ইরশাদ করছেন,

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৫)

সূরা মারইয়ামে ইরশাদ হয়েছে,

لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। (আয়াত নং ৮৭)

সূরা জুখরুফে এসেছে,

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তিনি ব্যতীত তারা যাদের পুজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (আয়াত নং -৮৬)

তবে শাফায়াতের সবচাইতে অকাট্য দলিল হচ্ছে সূরা ইসরা বা বনি ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতে যেখানে আল্লাহ পাক (ﷻ) হুজুর নবী করিম (ﷺ) কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করছেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

"(হে আমার রাসূল) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠ সহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।"

আর মাকামে মাহমুদের ব্যাখ্যায় বুখারী ও মুসলিম শরিফ সহ আরো অনেক হাদিসের কিতাবে এসেছে যে, তা হচ্ছে হুজুর নবী করিমের (ﷺ) শাফাআতে উজমার বা সবচাইতে বড় শাফায়াতের মাকাম। যখন কাল কেয়ামতের দিন লোকজন সব এক নবী থেকে আরেক নবীর কাছে দৌঁড়াবে এবং কেউই শাফায়াত করতে রাজী হবেন না তখন হুজুর নবী করিম (ﷺ) আরশের নিচে সেজদায় পড়ে যাবেন এবং আল্লাহ পাক (ﷻ) বলবেন, আমার বন্ধু আমার হাবিব আপনি মাথা তুলুন আর কি চান বলুন। তখন নবীজি (ﷺ) বলবেন-

يا ربي هبلي امتي يا ربي هبلي امتي

"হে আমার রব আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন।"

তখন আল্লাহ পাক (ﷻ) একে একে বলবেন যে, যার অন্তরে দীনার পরিমাণ, দিরহাম পরিমাণ, সরিষা পরিমাণ, অণু-পরমাণু পরিমাণ ঈমান পাবেন তাকেও দোজখ থেকে বের করে নিয়ে যান। হুজুর নবী করিম গুনাহগার ঐ সকল দোজখবাসীকে দোজখ থেকে একে

CamScanner

একে বের করে নিয়ে আসবেন। (বুখারী শরিফ, তাওহীদ অধ্যায়, হাদিস নং-৭০০২, মুসলিম শরীফ, ঈমান অধ্যায়, হাদিস নং ৩৮৭)

এ সংক্রান্ত আরেকখানা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর একটি কবুলযোগ্য দোআ ছিল। আমি আমার দোআকে আমার উম্মতের জন্য কেয়ামত দিবসে শাফায়াতের জন্য গোপন করে রেখেছি। ইনশাআল্লাহ সেই তা লাভ করবে যে আল্লাহর সাথে শিরক না করে মারা যায়। (সহিহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, হাদিস নং ৩৯৮-৩৯৯)

আল্লাহ পাক (ﷻ) সূরা দোহার ৫ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

"আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি খুশি হবেন।"

আর হুজুর নবী করিম (ﷺ) ততক্ষণ পর্যন্ত খুশি হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর একজন উম্মত দোজখে পড়ে থাকবে। এজন্যই বলা হয়েছে যে, যেই অন্তর থেকে কালিমাহ শাহাদাত বিশ্বাস করবে ও মুখে স্বাক্ষ্য দিবে এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকবে সেই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

অনুচ্ছেদ-৪: আল্লাহর আউলিয়াগণের শাফায়াতের আশা

গত পর্বে আমরা জেনেছি যে, কুরআন- হাদিস অনুযায়ী হুজুর নবী করিমের (ﷺ) শাফাআতে উজমা বা সবচাইতে বড় সুপারিশ এর কি অবস্থান। সেই সাথে আমরা গত অনুচ্ছেদেই জেনেছি যে, কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহর (ﷻ) গুনাহগার মুমিন- মুসলমান বান্দাগণ যখন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়বে, তখন হুজুর নবী

CamScanner

করিমের (ﷺ) "শাফাআতে উজমা" বা "সবচাইতে বড় সুপারিশ" ছাড়াও আরো অনেক নেককার পরহেজগার বান্দাগণও তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। এই পর্বে আমরা শাফায়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে জানব ইনশাআল্লাহ।

হুজুর নবী করিম (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ৭০,০০০ বা ৭,০০,০০০ লোক, বর্ণনাকারীর সন্দেহের কারণে, একে অপরের হাত ধরাধরি করে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁদের প্রথম জন একেবারে শেষ জন প্রবেশ করার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ সকলেই একই সময়ে একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন)। আর তাঁদের চেহারা পূর্নিমার রাতের চাঁদের মত জ্বলজ্বল করতে থাকবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হাদিস শরিফে আরো এসেছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজুর রাসুলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর বান্দাগণের থেকে কিছু বান্দাকে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন। প্রশ্ন করা হলো, (ইয়া রাসুলাল্লাহ!) তাঁরা কারা আমরা যেন তাদেরকে ভালোবাসতে পারি! তিনি বলেন, তারা এমন একদল যারা একে অপরকে আল্লাহর (ﷻ) ওয়াস্তে ভালোবেসেছে, কোন ধরনের আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক না থাকার পরেও। তাদের মুখমন্ডলসমূহ আলোকিত থাকবে, তারা নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবেন, তারা ভয় পাবে না যখন মানুষ ভীত থাকবে, তারা চিন্তিত হবে না যখন মানুষ চিন্তিত হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।" (সূরা ইউনুস, সূরা নং -১০: আয়াত নং - ৬২), (নাসায়ী শরিফ, হাদিস নং ৪৯৩৫, সহিহ ইবনু হিব্বান)

CamScanner

এর আগের অনুচ্ছেদেই আমরা জেনেছি যে, "আল্লাহ তাআলার একশ রহমত আছে (রহমতের একশ অংশ আছে) এরমধ্যে শুধুমাত্র এক অংশ মানব জাতি, জ্বীনজাতি এবং পশুপাখির জন্য দুনিয়াতে নাজীল করা হয়েছে (দুনিয়াতে) বাকি নিরানব্বই ভাগ কাল কেয়ামতের দিনের জন্য জমিয়ে রাখা হয়েছে।" (বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (ﷻ) তাঁর এই নিরানব্বই ভাগ রহমত কাদের জন্য জমিয়ে রেখেছেন? এই প্রসঙ্গে ইমাম তাবরানির মু'জামুল কাবির ও ইমাম হাকিমের মুসতাদরাক আলা সাহিহাইনে এক খানা হাদিস এসেছে যেখানে হুজুর নবী করিম (ﷺ) বলছেন যে,

و ادخر عنده لأوليائه تسعة و تسعين

"আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ৯৯ ভাগ রহমত জমা রেখেছেন তাঁর আউলিয়াদের জন্য।"

প্রসঙ্গত: আলবানী সাহেবের মত কট্টরপন্থী লোকও এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন তার সহিহুল জামের মধ্যে পৃষ্ঠা নং ১৭৬৬ তে।

হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে কেউ এমনও হবে যে পুরো এক দলের জন্য শাফায়াত করবে, কেউ পুরো এক গোত্রের জন্য শাফায়াত করবে, আবার কেউ ছোট দলের জন্য শাফায়াত করবে, আবার কেউ একজনের জন্যও শাফায়াত করবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সুনান তিরমিজী, হাদিস নং ২৪৪০, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ৩/২০, ৬৩ ইবনু খোযায়মা তাওহীদ অধ্যায়ে, হাদিস নং ২/৬৩৬)

এই সংক্রান্ত আরো অসংখ্য হাদিস আছে যা এত ছোট পরিসরে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে এই সংক্রান্ত যত হাদিস বর্ণনা হয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে রহস্যপূর্ন ও দিলখোশকারী হাদিস

CamScanner

হচ্ছে, হুজুর নবী করিম (ﷺ) বলছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অতটুকু অনমনীয় নও যতটুকু, কঠোর হবে (সেই সকল) মুমিনগণ যারা কেয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে তাদের সেসমস্ত ভাইদের মুক্তির জন্য (মুহাব্বাতের ঝগড়া করবে) যারা দোজখে চলে গেছে। যখন মুমিনগণ দেখবেন যে তারা মুক্তি পেয়ে গেলেন, তখন তাদের মুমিন ভাইদের জন্য তারা আল্লাহর কাছে আবেদন করবেন "হে আমার প্রতিপালক এরা আমাদের ভাই, যাদেরকে তুমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছ, তারা আমাদের সাথে নামাজ পড়ত, আমাদের সাথে রোজা রাখত এবং আমাদের সাথে সৎকাজ করত"। তখন আল্লাহ বলবেন "যাদের অন্তরে শুধুমাত্র এক দিনার ওজন পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। তাদের মুখমন্ডল তথা আকৃতিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে"। অতঃপর মুমিনগণ সেখানে জাহান্নামীদের নিকট যাবেন। এসে দেখবেন কেউ কেউ পা পর্যন্ত, কেউ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে ডুবে আছে। এর মধ্যে যাদের তারা চিনবেন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন"। এভাবে একে একে দোযখ বাসীদের যাদেরকে মুমিনগণ চিনবেন এবং যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ, সরিষা পরিমাণ ঈমান পাওয়া যাবে তাদেরকেও মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন"। (সহীহ বুখারী, খন্ড ১০, অধ্যায়: তাওহিদ, হাদিস নং-৬৯৩২, সহিহ মুসলিম, অধ্যায়- ঈমান হাদিস নং-৩৬২, সুনানু ইবনে মাজাহ-হাদিস নং - ৬০)

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর ওলী কী না অর্থাৎ কাউকে আল্লাহ ভালোবাসেন কী না তা আমরা কীভাবে বুঝব? অর্থাৎ কে আল্লাহর ওলী আর কে আল্লাহর ওলী না তা দুনিয়ার মানুষ কীভাবে জানবে?

CamScanner

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারিম (ﷺ) বলছেন, "আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম কে আহ্বান করে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আকাশবাসীর মাঝে ঘোষণা করে দেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আকাশবাসীও তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর দুনিয়াবাসীর কাছেও সে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে"।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, "অতঃপর দুনিয়াবাসীর কাছেও সে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে"। এই বাক্যটি প্রমাণ করে যে দুনিয়াবাসী যাকে আল্লাহর মাকবুল বান্দা মনে করে সে মূলত আল্লাহর কাছে আকাশবাসীর কাছে আগে থেকেই মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য।

অপর হাদিসে এসেছে, নবী কারিমের (ﷺ) পাশ দিয়ে একটি লাশ যাচ্ছিল, তার প্রশংসা করা হলো, নবীজি (ﷺ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল। অপর আরেকটি লাশ গেল যার নিন্দা করা হলো, নবীজি (ﷺ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল। হযরত ওমর ফারুক রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার জন্য আমার মা বাবা কুরবান হোন! একটি লাশ গেল তার প্রশংসা করা হলো, আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল। অপর আরেকটি লাশ গেল যার নিন্দা করা হলো আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল, ওয়াজিব হয়ে গেল। হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যার তোমরা প্রশংসা করলে তার ওপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল, আর যার তোমরা নিন্দা করলে তার ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর স্বাক্ষী, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর স্বাক্ষী, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর স্বাক্ষী। (বুখারি, জানাজার অধ্যায়, মৃত ব্যক্তির ওপর

মানুষের প্রশংসা পরিচ্ছেদঃ হাদিস নং ১৩৬৭, সহিহ মুসলিম, জানাজার অধ্যায়, মৃত ব্যক্তির ওপর মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা পরিচ্ছেদঃ হাদিস নং-৯৪৯)

অর্থাৎ মানুষের কাছে যে নেককার পরহেজগার সে আল্লাহর কাছেও গ্রহণযোগ্য। এরই সমর্থনে আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদে আয়াত নাজিল করেছেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। (আল কুরআন সূরা বাকারা, ২: আয়াত নং-১৪৩)

কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও আউলিয়াগণের সঙ্গী হচ্ছি কিনা? উনাদের তালিম মানছি কিনা। তাদের পথে চলছি কিনা! বলা হয়েছে যাদেরকে চিনবেন তাদেরকেই শুধু শাফায়াত করবেন।

কিন্তু এই শাফায়াত আমাদের নসীব হবে কিনা তার তো কোন গ্যারান্টি নাই। কাজেই মুহাব্বাত, আমল ও সহীহ নিয়্যাতের মাধ্যমে শাফায়াত লাভের উপযুক্ত আমাদেরকে হতে হবে। তাঁরা যাতে আমাদেরকে চিনেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের দফতরে আমাদের নামটুকু কমপক্ষে তুলতে হবে। সাথে সাথে শাফায়াতকারী যারা হবেন তাঁদেরকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতে হবে এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করতে হবে। শাফাআত লাভের আশা রাখতে হবে অন্তরে।

আর চিন্তা করুন, আল্লাহ না করুন, যদি কিছুকাল আমাদের দোজখের আজাব ভোগ করতে হয়, অতঃপর শাফায়াতের মাধ্যমে

CamScanner

মুক্তি পাই, এই কিছুকালের জন্যও কি আমাদের পক্ষে এই কঠিন আজাব সহ্য করা সম্ভব? যেখানে দুনিয়ার আগুনে আমরা পাঁচ সেকেন্ডের জন্য নিজের আঙুল ধরে রাখতে পারি না, সেখানে এক সেকেন্ডের জন্যও দোজখের আগুন সহ্য করা কীভাবে সম্ভব, যেই আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত!

ইলম গোপন করা কবিরা গুনাহ, না হয়ত এরকম অনেক হাদিসই, বর্ণনাকারী বর্ণনা করতে চান নাই, কারণ মানুষ এগুলোর উপরে নির্ভরশীল হয়ে যেতে পারে। কাজেই আমরা আমল করা কোন অবস্থাতেই বাদ দিব না এবং গুনাহ থেকে নিজেকে পরহেজ করার চেষ্টা করব।

অনুচ্ছেদ-৫: 'ভালোবাসা'

সিরিয়ায় আই.এস সন্ত্রাসীদের হাতে শহীদ হওয়া শায়খ এবং ফকিহে শাম ড. সায়ী'দ রামাদান আল-বুতী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং বর্তমান আরব বিশ্বের নামকরা মুবাল্লিগে ইসলাম ও যুগশ্রেষ্ঠ সুফিদের একজন শায়খ হাবিব আলী জায়নুল আবেদিন আল জিফরী উভয়েই একসাথে একবার ফ্রান্সে গিয়েছিলেন একটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপে (Interfaith Dialogue) অংশগ্রহণ করতে। যেটা মূলতঃ ছিল খ্রীষ্টানদের সাথে ডায়লগ ও তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্পর্কিত। শায়খ হাবিব আলী আল জিফরী বর্ণনা করছেন, "সেই অনুষ্ঠানে শায়খ সায়ীদ রামাদান আল-বুতী (রাহিমাহুল্লাহ), হৃদয় বিগলিত ভাষায় আল্লাহর (ﷻ) ভয় ও ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা করলেন। অনুবাদক আরবি থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করার কথা ছিল। সেখানে একজন ফ্রেঞ্চ বিধর্মী সাংবাদিক শায়খ সায়ীদ রামাদান

CamScanner

আল-বুতী (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া শায়খ আপনি যেই ভাষায় খেতাব করেছেন আমার অন্তরকে গলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন, ভালোবাসার সাথে ভয় আসে কী করে?" অর্থাৎ আশিক ও তার মাশুকের মাঝে তো শুধু ভালোবাসা থাকবে। সেখানে ভয় কীভাবে আসে?

শায়খ সায়ীদ রামাদান আল-বুতী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রশ্ন বুঝার সাথে সাথে দু'চোখের পানি ঝরঝর করে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

وهل هناك خوف أعظم من خوف المحب؟ خوف المحب أن يفارقه محبوبه.

"প্রেমিকের ভয়ের চেয়েও বড় ভয় আছে কী দুনিয়াতে? প্রেমিকের ভয় হচ্ছে তাঁর মাহবুব, তাঁর মাশুক যদি কোন কারণে তাঁকে ছেড়ে যায়।"

অর্থাৎ প্রকৃত প্রেমিক সবসময় এই ভয়ে দিন কাটায় ও রাত পার করে যে, তার কোন ভুলের কারণে, তার কোন পাপের কারণে যদি তার মাহবুব, তার মাশুক তাকে ছেড়ে যায়। তার কোন ভুলের কারণে যদি তার মাশুক রাগ করেন, কষ্ট পান। তাই সত্যিকারের প্রেমিক বেহেশতের লোভ তো ছাড়তে পারে, কিন্তু তার মাহবুবের দীদারে ইলাহী থেকে, ইশকে ইলাহী থেকে এক সেকেন্ডের জন্যও নিজেকে দূরে রাখতে পারেন না।

এজন্যই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (جل جلاله) ইরশাদ করছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রবল" (সূরা বাকারা, সূরা নং-২, আয়াত নং -১৬৫) ভয়, আশা এবং ভালোবাসার আরো উন্নততর অর্থও আছে যা আমরা আহলে বায়ত পাক পাঞ্জাতনের নয়নমনি হযরত ইমাম আলী জায়নুল আবেদিন ইবনে হোসাইনের (আলাইহিমুস সালাম) এক বিখ্যাত উক্তি থেকে

CamScanner

পাই- একটি সম্প্রদায় মহান আল্লাহকে (ﷻ) ভয় করে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর (ﷻ) দোজখের আজাবের ভয়েই ইবাদাত করে, আর এই ইবাদাত গোলামের ইবাদাত।

"অন্য আরেকটি সম্প্রদায় মহান আল্লাহর (ﷻ) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর বেহেশতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ইবাদাত করে, এ হলো ব্যবসায়ীদের ইবাদাত।"

"অন্য আরেকটি দল মহান আল্লাহর (ﷻ) প্রতি মুহাব্বত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য (ভয় ও আশা সহকারে) মহান আল্লাহর (ﷻ) ইবাদাত করে। আর তা হলো স্বাধীন সৎলোকের ইবাদাত। (সূত্রঃ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, হাফিজ ইবনে কাসির রাহ., নবম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৭৬)

আবার আমরা যদি সূরা মায়েদার ৫৪ নং আয়াতের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাই যে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (ﷻ) মুসলমান জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে।" (সূরা মায়েদাহ, আয়াত নং-৫৪)

এই আয়াতের প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশের আলোকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ পাক (ﷻ) আমাদেরকে এই আয়াতে হুমকি দিচ্ছেন, আমরা যদি আল্লাহর (ﷻ) ভালোবাসা শূন্য কোন জাতিতে পরিনত হই, যারা নিরেট রুসুম রেওয়াজ পালন করার

মত করে আল্লাহর (ﷻ) ইবাদাত বন্দেগীগুলো পালন করে যায়, তবে আল্লাহ পাক (ﷻ) আমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতির আনয়ন করবেন যাদেরকে আল্লাহ পাক (ﷻ) ভালোবাসবেন ও যারা আল্লাহ পাককে (ﷻ) ভালোবাসবেন। মোদ্দাকথা, মোহাব্বাত শূন্য জাতি আল্লাহর (ﷻ) পছন্দ নয়। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক (ﷻ) আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি। কাজেই আল্লাহর (ﷻ) দেয়া ধর্মের মূলই হচ্ছে মোহাব্বাত। এই আয়াতের আলোকে ধর্মহীন হওয়া আর মোহাব্বাতহীন হওয়া সমার্থক।

তবে আল্লাহর (ﷻ) প্রতি বান্দার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কী? আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (ﷻ) এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন সূরা আলে ইমরানের ৩১ নং আয়াতে,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"(হে আমার হাবিব! হে আমার রাসূল!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।"

আল্লাহকে ভালোবাসলে হুজুর নবী করিম (ﷺ) অনুসরণ করতে হবে। তাঁর সীরাত এবং হুকুম আহকামের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। তবেই আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাওয়া যাবে। আবার দেখুন সাহাবায়ে কেরামগণের শিক্ষা হচ্ছে যে, তুমি যত বড় আমলদারই হও না কেন মুক্তির ব্যাপারে নিজের আমল-আখলাকের উপর নির্ভর

করো না। বরং ভালোবাসার উপর নির্ভর করো। কারণ ভালোবাসার সওদাতে কোন লস নাই।

এজন্যই প্রিয় নবীজির (ﷺ) খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলছেন, একবার এক ব্যক্তি হুজুর নবী করিম (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেয়ামত কখন হবে?" হুজুর নবী করিম (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?" তিনি বললেন, কিছুই না, কিন্তু আমি আল্লাহ (ﷻ) এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি (কাল কেয়ামতের দিনে) তাঁদের সাথেই থাকবে যাদেরকে তুমি ভালোবাস। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবীজির (ﷺ) এই কথা শোনে আমরা যত না খুশি হয়েছি, নবীজির অন্য কোন কথা আমাদেরকে এতটা খুশি করতে পারেনি। কারণ আমি নবীজিকে (ﷺ), আবু বকর, উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে ভালবাসি এবং আশা রাখি তাঁদের সাথে থাকব তাঁদের প্রতি আমার ভালোবাসার কারণে, যদিও আমার আমল তাঁদের আমলের সমান নয়। (সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত, পরিচ্ছেদ: আবু বকর সিদ্দীক রা: এর ফজিলত, হাদিস নং- ৩৪২৩)

দেখুন সাহাবায়ে কেরামগণ সারাদিন আল্লাহর (ﷻ) রাস্তায় জিহাদ করতেন এবং সারারাত আল্লাহর (ﷻ) ইবাদাত করতেন, তারপরও তাঁরা মুক্তির ব্যাপারে নিজেদের আমলের উপর বিন্দু পরিমাণ নির্ভর করেননি। বরং নির্ভর করেছেন তাঁদের ভালোবাসার উপর। আল্লাহর (ﷻ) ভালোবাসার উপর, রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ভালোবাসার উপর এবং যুগের নেককারগণের ভালোবাসার উপর। কাজেই ভালোবাসার সওদাতে কোন ঘাটতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

CamScanner

এই পুরো সিরিজের নির্যাসে আমরা পাই যে, আল্লাহর (জাল্লাজালালুহু) ভয়, দোজখের আজাবের ভয় ও হাশরের দিনের ভয়াবহতার ভয়কে পাশ কাটিয়ে, যদি কেউ শুধুমাত্র আল্লাহর (জাল্লাজালালুহু) রহমতের আশা ও মুহাব্বাতের উপর ভরসা করে আমল না করে বসে থাকে তবে সে পথভ্রষ্ট।

আবার যার মধ্যে ভয় আছে কিন্তু মুহাব্বাত নেই, আল্লাহর (জাল্লাজালালুহু) রহমতের আশাও নেই, সেও পথভ্রষ্ট। কেও নিজের আমল আখলাক দ্বারা মুক্তি পাবে না, এটাও যেমন ঠিক, আবার শুধু ভালোবাসায়ও মুক্তি পাবে না এটাও ঠিক।

সত্যিকারের মুমিনের অবস্থাটা এমন যে আল্লাহর (জাল্লাজালালুহু) কাহহার ও আজিজুন জুনতিকাম নামের দিকে তাকালে মনে হয় সে আর ক্ষমা পাবেনা। আবার আল্লাহ পাকের গাফুর-গাফফার এবং রাহীম-রাহমান নামের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন, তা সে যত বড়গুনাহগারই হোক না কেন।

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(হে আমার হাবিব! হে আমার রাসূল!) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়েদিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

এবং ইহাও (জানিয়ে দিন) যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা হিজর, সুরা নং ১৫: অয়াত নং ৪৯-৫০)

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যেন সত্যিকারভাবে তাঁকে ভালোবাসার, ভয় পাওয়ার ও তাঁর রহমতের আশা করার তৌফিক দেন আমাদের সবাইকে। আমিন।

CamScanner

'ইকামাতুস সালাহ' আসলে কী জিনিস?

ইসলাম নিছক আচারনিষ্ঠ ধর্ম নয়। ইসলাম শুধুমাত্র কিছু রুসুম রেওয়াজের সমষ্টির নাম নয়। ইসলামের প্রতিটি ইবাদাতের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে, প্রতিটি ইবাদাতে কিছু বিষয় থাকে যা করা ফরজ, এগুলোকে আমরা আহকাম-আরকানও বলে থাকি, কিছু বিষয় থাকে ওয়াজিব, কিছু বিষয় থাকে সুন্নাহ ও মুস্তাহাব। সেই ইবাদাতেই নির্দিষ্ট কিছু কাজ করা হারামও হয়, আবার মাকরুহও হয়। সালাতও তেমনি একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজের কিছু কাজ আছে ফরজ যা না করলে সাহু সিজদা দিলেও নামাজ কবুল হবেনা। কিছু কাজ আছে যা না করলে বা অতিরিক্ত করলে সাহু সেজদা দিতে হবে। সবই ঠিক আছে।

প্রতিটি মুসলমানের জন্য সময়মত নামাজ আদায় করা ফরজ, আমাদের পূর্বপুরুষের জন্য মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়ের প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে নামাজ আদায় করার প্রতিও খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যে কুরআন মাজিদে ৮২ বার বলেছেন সালাত কায়েম করতে বা প্রতিষ্ঠা করতে তার অর্থ শুধুমাত্র সালাতের মধ্যকার এই বাহ্যিক আমলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আরো ব্যাপক। এক কথায় যদি বলতে হয়, "ইকামাতুস সালাহ" মানে আমার জীবনে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা, আমার পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার নাম হলো "ইকামাতুস সালাহ"। কারণ আল্লাহর হাবিব (ﷺ) সালাত কায়েম করাকে দ্বীন কায়েম করার সাথে তুলনা করেছেন, বলেছেন,

من اقام الصلاة فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে সালাত কায়েম করল সে দ্বীন কায়েম করল, আর যে সালাত নষ্ট করল সে দ্বীন কে নষ্ট করল। (বায়হাকি শুয়াবুল ইমানে এনেছেন)

প্রতিটি ইবাদাতের যেমন নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন আছে, তেমনি প্রতিটি ইবাদাতের পেছনে কিছু উদ্দেশ্য আছে সেগুলো কেবলা হয় "মাকাসিদুশ শরীয়াহ"। সালাত যদি আমাকে অশ্লীল ও পাপকার্য থেকে দূরে না নিতে পারল তবে সালাত কায়েম করা হলো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন,

اتْلُ مَاأُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (সূরা আনকাবুত, আয়াত নং-৪৫)

সালাত আদায় করে টেবিলে ফিরেই টুপি মাথা থেকে না খুলেই যদি আমি ঘুষের টাকা নিয়ে নিই তবে তা সালাত কায়েম হলোনা। সালাত যদি আমার অন্তরে ঘুষ নেয়ার প্রতি তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি না করাতে পারে তাহলে সালাত কায়েম করা হয়নি, সালাত আদায় করা হচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে। ঠিক একইভাবে সালাত যদি আমাকে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ, মিথ্যা, গীবত, অপবাদ, ঝগড়াঝাটি, গালাগালি, মারামারি, সূদ নেয়া ও দেয়া, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি থেকে দূরে সরাতে না পারে তবে সালাত কায়েম করা হয়নি আমার দ্বারা, বরং আমি সালাত আদায় করে যাচ্ছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আরো বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র (সূরা মুমিনুন, আয়াত নং-১-২)

CamScanner

নামাজের মধ্যে যদি বিনয় নম্রতা আজিজি ইনকিসারি তাক্বওয়া না থাকে তবে সালাত কায়েম করা আমাকে দিয়ে হলোনা। আল্লাহর হাবিব (ﷺ) আরো বলেছেন,

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

"ইহসান হচ্ছে তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি মনে হয় আল্লাহকে দেখছ না, (এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে) আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

এই জায়গাতে যদি আমার সালাত আমাকে না নিয়ে আসে তবে তা ইকামাতুস সালাহ নয়, বরং তা সালাত আদায় করা মাত্র। সেসব সালাত আদায়কারী কারা যারা সালাত সম্পর্কে বেখবর? তারা কারা যারা সালাত আদায় করার পরও আল্লাহপাক তাদের জন্য দুর্ভোগ আছে বলে উল্লেখ করছেন?

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

অতএব, দুর্ভোগ সে সব নামাজীর যারা

তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর (১০৭ : ৪-৫) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

তারা কারা যারা নামাজে অলসতা বশত দাঁড়ায়? নামাজ আদায় করার পরও তারা মুনাফিকই থাকে কেন এবং তারা কারা?

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (৪ঃ১৪২)

সর্বশেষ কথা: নামাজের উপকার অনেক, নামাজের শিক্ষা অনেক। নামাজের শিক্ষাগুলো আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে না পারলে আর "ইকামাতুসসালাহ" কীভাবে হলো?

CamScanner

ইমামের ওপর আবশ্যক তিনি ইকামাতের পর ও জামায়াত শুরু করার আগে মুসল্লীদেরকে কাতার সোজা করতে আদেশ দিবেন। আল্লাহর হাবিব (ﷺ)র এই হাদিসখানার ওপর আমল করতে গিয়ে, যেখানে নবীজি (ﷺ) বলেন,

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة

"তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নাও, কাতারগুলো সোজা করা নামাজ পরিপূর্ণতার অংশ। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৮১, মুসলিম, হাদিস নং-৬৫৬)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ -رواه مسلم

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কাতার সোজা করে নাও, এবং পরস্পরে (কাতারের মাঝে) আগপিছ করিও না, তাহলে তোমাদের অন্তরগুলো মতপার্থক্য করবে। (সহিহ মুসলিম)

কাতার সোজা রাখার প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে জামায়াতের সাথে সালাতগুলোতে। কাতার সোজা করতে এত গুরুত্ব দেয়ার কারণ কী? বলা হয়েছে কাতারের মাঝে আগপিছ হলে আমাদের অন্তরসমূহকে মতপার্থক্যের মাঝে ডুবিয়ে দেয়া হবে। এর কারণ কী? এটাই ইকামাতুস সালাতের শিক্ষা। আমরা নামাজের জামায়াতে যখন দাঁড়াই তখন কে কোন মতবাদের তা আমাদের মনে থাকেনা। কে কোন রাজনৈতিক দল করি তা কারো মনে থাকেনা। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো-শ্যামবর্ণ সকলেই আমরা এক কাতারবদ্ধ হয়ে এক আল্লাহপাকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হই। এই চিরুনীর দানার মত সমান্তরালে কাতারবদ্ধ হওয়াটা মুসলিম জাতির ঐক্যের প্রতীক। আমাদের একতার প্রতীক।

CamScanner

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের: একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-৯২)

কিন্তু সেই মসজিদ থেকে বের হয়েই আমরা নিজেদের মাঝে মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়ে যাই, ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হয়ে যাই, এমনকি এখন মসজিদের ভেতরেও আমরা ঝগড়াঝাটি মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ি। উগ্রবাদী কিছু দল আছে এক দল অপর দলের মানুষকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিই মসজিদের ভেতরেই।

এ কেমন ইকামাতুস সালাহ? নামাজ কায়েমকারী কখনো অশান্তির দূত হতে পারেনা। নামাজ কায়েমকারী কখনো সমাজে ফিতনাফাসাদ, মারামারি, ঝগড়াঝাটি ও অশ্লীল বাক্য বিনিময়ের মাধ্যম হতে পারেনা। এজন্যই বলছি, আমরা নামাজ আদায়কারী হতে পারি, সালাত কায়েমকারী হতে পারি নাই।

আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদ প্রমাণ হয় নবীজির (ﷺ) নবুওয়াত এবং সুমহান চরিত্রের প্রমাণের মাধ্যমে

ইসলামের একদম শুরুর দিক। সবে অল্প কজন মাত্র প্রিয় নবীজির (ﷺ) ওপর ঈমান এনেছেন। আম্মাজান উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা খাদিজাতুল কুবরা আলাইহাস সালাম এবং তাঁর চার কন্যা, নবীজাদী হযরত ফাতিমা, হযরত রুকাইয়া, হযরত জয়নব, হযরত উম্মে কুলসুম এবং মাওলা আলী রা., হযরত জায়েদ ইবনে হারিসা রা., হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা., হযরত ওসমান রা., হযরত ইয়াসির এবং সুমাইয়া, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা., আবু জার গিফফারি রা. এবং আরো কজন মাত্র ঈমান এনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলছেন, কুরআন মাজিদের আয়াত নাজিল হয়ে গেলো,

CamScanner

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (সূরা শুয়ারা, আয়াত নং-২১৪) অর্থাৎ ওহ আমার হাবিব (ﷺ)! লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক দিন যাবৎ ইসলাম প্রচার করেছেন, তাওহিদের বাণী প্রচার করেছেন, আপনার রিসালাতের খবর প্রচার করেছেন। এখন আর নিরবে নিভৃতে কাজ করার সুযোগ নেই। আপনার গোত্র কুরাইশ বংশের মানুষকে এবার দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করুন। হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মাহবুবের নির্দেশ পাওয়া মাত্র সাফা পাহাড়ের উপর ওঠে দাঁড়ালেন। কোরাইশদের সকল উপগোত্রের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, হে বনি ফেহের! হে বনি আদি! কোরাইশদের সকল উপগোত্রের মানুষ জড়ো হলো। যারা আসতে পারল না তারা প্রতিনিধি প্রেরণ করল। চাচা আবু লাহাব সহ সকল কুরাইশরা আসলো। নবীজি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, "হে কুরাইশ আমি যদি বলি একদল ঘোড় সওয়ার সৈন্য এই সাফা পাহাড়ের পেছনে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে আছে তবে কী তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?" সবাই একবাক্যে সমস্বরে বলল- হ্যাঁ, কারণ আমরা তোমাকে কখনো সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে শুনি নাই।

অর্থাৎ আমরা মক্কার কোরাইশরাই তো তোমার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদীতার কারণে তোমাকে "আস-সাদিকুল আমীন" বা সত্যবাদী ও আমানতদার উপাধি দিয়েছি। হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আগুনের আজাবের ভয় দেখাচ্ছি। অর্থাৎ তোমরা যদি এক আল্লাহর অস্তিত্ব না মান, আল্লাহর সাথে শিরক করা পরিত্যাগ না কর এবং আমাকে যদি শেষ নবী হিসেবে না মান তবে তোমাদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ আজাব অপেক্ষা করছে। এটা শুনে পাপিষ্ঠ আবু লাহাব বলে ওঠল, "তোমার সারাদিন ধ্বংস হোক। এটার জন্যই কী তুমি আমাদেরকে এখানে একত্র করেছ?"

সাথে সাথে সূরা লাহাব নাজিল হয়ে গেল, আবু লাহাবের হস্তদ্বয়ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। (বুখারি, তাফসিরুল কুরআন অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ সূরা শুয়ারা, ওয়া আনজির আশিরাতাকাল আকরাবিন, হাদিস নং-৪৪৯২)

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে কত ভালোবাসেন। আবু লাহাব আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী কারিম (ﷺ) কে কটু কথা বলার চেষ্টা করেছে, সাথে সাথে কুরআন মাজিদের সূরা দিয়ে আল্লাহ পাক জিবরাইল আলাইহিস সালাম কে পাঠিয়ে দিলেন।

যাইহোক মূল প্রসঙ্গে আসি, এই হাদিসখানা সুস্পষ্টরুপে প্রমাণ করে যে, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আগে নিজের নিষ্কলুষতা, সত্যবাদীতা এবং আমানতদারীসহ যত সুমহান গুণ আছে সকল কিছুর স্বাক্ষী নিয়েছেন মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে, অতঃপর তাওহিদের বাণী মক্কাতে প্রচার করেছেন। এমনকি কুরআন মাজিদ যে আল্লাহর বাণী, তারও সবচাইতে বড় প্রমাণ হচ্ছে প্রিয় হাবিব (ﷺ) র সত্যবাদীতা এবং সুমহান চরিত্র।

এখানে প্রশ্ন ওঠতে পারে যে, তবে কী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবী রাসুলগণের মূখাপেক্ষী নিজের তাওহিদ একত্ববাদের দাওয়াত প্রচার করতে? না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কারো মূখাপেক্ষী নন, তিনি সামাদ। কিন্তু এটাই তাঁর সুন্নাহ বা রীতি।

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

"আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম (সুন্নাহ) ছিল। আপনি আমার নিয়মের (সুন্নাহ) কোন ব্যতিক্রম পাবেন না"। (আল কুরআন, সুরা ইসরা বা বনি ইসরাইল, ১৭: আয়াত নং-৭৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এটাই রীতি, তিনি তাঁর রাসুলগণের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রকাশিত হন। তাঁর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের অখন্ডনীয় প্রমাণ হচ্ছেন যুগে যুগে আসা রাসুলগণ।

CamScanner

এখানে খুব সূক্ষ্ম একটা ম্যাসেজ উম্মতকে দিয়ে দেয়া হয়, হে মানবজাতি! আমার নবীর রিসালাতের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি যারা আমার তাওহিদ পর্যন্ত পৌঁছাতে চাও তোমরা গোমরাহির মাঝে আছ। আমার নবীর রিসালাতের কাছে আগে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো তবেই কেবল আমি আল্লাহর একত্ববাদের সঠিক মর্ম তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

যে লোক রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা, আয়াত নং-৮০)

ইবাদাত আমরা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, ইবাদাতের একমাত্র মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। কিন্তু আত্মসমর্পন আগে আল্লাহর রাসুলের কাছে করতে হবে।

যারা মাধ্যম অন্বেষণ করা অস্বীকার করেন এখানে তাদের জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চাইলে নবী-রাসুলগণ ছাড়াই তাঁর তাওহিদ এবং ইবাদাত দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহর সুন্নাহ বা রীতি হচ্ছে তিনি মাধ্যম দ্বারা সকল কিছু করেন। তিনি চাইলে কুরআন মাজিদকে পাহাড়ের ওপর নাজিল করতে পারতেন, প্রত্যেকের এলাকায় এলাকায় ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারতেন কোন মাধ্যম ছাড়াই। যেহেতু তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি তা করেন নাই, বরং তিনি মানুষের মাঝে আগে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে চল্লিশ বছর রেখেছেন, "হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা আমার নবীকে দেখ, স্টাডি কর, তার চরিত্র মাধুর্য দেখ, তিনি মিথ্যা বলেন কিনা তা দেখ, তিনি আমানতের খেয়ানত করেন কিনা তা দেখ। তার মাঝে দুনিয়ার ক্ষমতা ও টাকা পয়সার প্রতি লোভ লালসা আছে কিনা তা দেখ"। যখন নবীজির (ﷺ) খুলুকে আজিম অর্থাৎ সুমহান চরিত্র মক্কার কাফির কুরাইশদের কাছে

প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল অতঃপর আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করলেন। যেন কেউ একথা বলতে না পারে যে, মিথ্যা বলা ও আমানতের খেয়ানত করা, মানুষকে ধোকা দেয়া তো মুহাম্মাদের পুরাতন স্বভাব (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। বরং আবু জাহলও ভাল করেই জানত যে মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য নবী, কুরআন আল্লাহর বাণী, যা সে রাতের আঁধারে প্রিয় নবীজির (ﷺ) ঘরের বেড়াতে কান লাগিয়ে শুনত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অহংকার ও প্রিয় নবীজির (ﷺ) প্রতি এবং বিশেষ করে বনু হাশিম বা নবীজির (ﷺ) পরিবারের নেতৃত্বের প্রতি তার অন্তরের হিংসা বিদ্বেষের কারণে ঈমান আনে নাই এবং কালিমার স্বাক্ষ্য সে দেয় নাই। যা অনেকবার সে অনেক জনের কাছে স্বীকার করেছে।

ঠিক একইভাবে রোমের পরাক্রমশালী বাদশাহ হিরকাল আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠাল (আবু সুফিয়ান রা. তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, এটা মক্কা বিজয়ের আগের ঘটনা) হুজুর রাসুলুল্লাহ সম্পর্কে জানার জন্য। সম্রাট হিরকাল যিনি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি আবু সুফিয়ানকে প্রিয় নবী (ﷺ) সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। আপনারা কী কখনো তাঁর ওপর মিথ্যা কথা বলার আরোপ লাগিয়েছেন? আবু সুফিয়ান বললেন, না। হিরকাল বললেন, যে মানুষের সাথে মিথ্যা বলে না সে আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলবে তা হতে পারে না।

অতঃপর আবার প্রশ্ন করলেন, তাঁর সাথীর সংখ্যা কী বাড়ছে না কমছে? আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন, বাড়ছে। হিরকাল বললেন, সত্য নবীর সাথীর সংখ্যা এভাবেই বাড়ে এবং পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হিরকাল জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদের (ﷺ) কোন সাথী কি মুহাম্মাদের দ্বীনের ওপরে অর্থাৎ চরিত্র দেখে রাগ করে ধর্মে প্রবেশের পর ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে এমন হয়েছে? আবু সুফিয়ান বললেন, না। হিরকাল বললেন, ঈমান যখন অন্তরের সাথে মিশে যায় তখন এমনই হয়।

CamScanner

হিরকাল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কখনো কাউকে ধোকা দিয়েছেন? আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন, না। হিরকাল বললেন, রাসুলগণ কখনো কাউকে ধোকা দেন না।

হিরকাল জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদেরকে তিনি কিসের আদেশ দেন? আবু সুফিয়ান বললেন, আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেন, মূর্তি পূজা ছেড়ে দিতে বলেন, আল্লাহর সাথে শিরক না করতে বলেন, নামাজ পড়তে বলেন, সত্য কথা ও আমানতদারীর কথা বলেন। হিরকাল বললেন, আপনি যা যা বলেছেন মুহাম্মাদ সম্পর্কে তা যদি সত্য হয়, তবে তিনি সত্য নবী এবং আমার পায়ের নিচের এই জমিন অর্থাৎ রোম সাম্রাজ্যও তার অধীনে চলে আসবে। (সহিহ বুখারি, ওহী নাজিলের শুরুর অধ্যায়, হাদিস নং-৭)

প্রিয় পাঠক আল্লাহ পাক যদি চাইতেন জিবরিল আলাইহিস সালাম ছাড়াই সরাসরি হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) কাছে কুরআন অবতীর্ন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। বরং একটা মাধ্যমে (সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে) কুরআন অবতীর্ন করেছেন। কাজেই মাধ্যম অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মাধ্যম দিয়েই সকল কিছু করেন। পৃথিবী সৃষ্টিও করেছেন "কুন ফা ইয়াকুন" শব্দের মাধ্যমে। এটাই তাঁর রীতি।

এই কুরআন মাজিদ যে সত্যিই আল্লাহ তায়ালার বাণী এবং হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) নিজের বানানো কোন কিতাব নয়, এর প্রমাণও হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) আখলাক ও জীবন। কারণ তিনি কখনো মিথ্যা বলেন নি, কুরাইশরা নিশ্চিত ছিল। তাই কুরআন মাজিদকে আল্লাহর বাণী নয় বলে অস্বীকার করা তাদের জন্য বিব্রতকর ছিল। নবীজি (ﷺ) কাউকে কোনদিন ধোকা দেন নাই। তো আল্লাহর নামে ধোকা দিবেন তা কল্পনাও করা যায় নি।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমাদেরকে সবার আগে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, রিসালাতের এই

CamScanner

মহান দরবারে যখন আমরা পরিপূর্ন আত্মসমর্পন করতে পারব তখনই কেবল আল্লাহর একত্ববাদের দরবারে আত্মসমর্পন করা সহজ হয়ে যাবে এবং এটাই আল্লাহর সুন্নাহ বা রীতি, বান্দাহ তোমরা আমার নবী হয়ে আমি পর্যন্ত পৌঁছাও।

আল কুরআনের প্রথম সুরা 'সূরা-ফাতিহা' খানাও কী আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করি?

আমাদের নবী করিমের (ﷺ) সবচাইতে বড় মু'জিযা খানা কি? চাঁদকে হাতের ইশারায় দুইভাগ করে ফেলা? না। মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে ফেলা? না। অসুস্থ্য ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুমে সুস্থ্য করে ফেলা? না, তাও না। অল্প সংখ্যক মুসলমান নিয়ে অধিক সংখ্যক কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে ফেলা? না, এগুলোর কেনটিই নয়।

বরং কুরআন মাজিদই হচ্ছে আমাদের নবী করিমের (ﷺ) সবচাইতে বড় মু'জিযা। আল-কুরআন আমাদের জীবন বিধান। কুরআন আমাদের পাথেয়। কিন্তু দু:খের বিষয় হচ্ছে আমরা কি কোরআন শরিফ ভালভাবে অনুধাবন করি?

কুরআন শরিফ পুরোপুরি ভালভাবে অনুধাবন করা তো দুরের কথা, আল কুরআনের প্রথম সূরা, সূরা ফাতিহা, যেই সূরাকে উম্মুল কিতাব বা কুরআনের মূল বলা হয়েছে, যা আমরা প্রতিদিন নামাজের মধ্যে অনেক অনেকবার করে পড়ি, শুনি, সেই সূরাখানাও কি আমরা সঠিকভাবে বুঝি? হ্যাঁ, এই সূরাখানার সরল অনুবাদ আমরা সবাই কমবেশি জানি। কিন্তু এই সূরার নিগুড় অর্থ কি আমরা ঠিকমত অনুধাবন করি? যদি সূরা ফাতিহাখানাও সঠিকভাবে অনুধাবন করতাম আমরা, তবে কেন আমরা বলি যে, আমরা শুধু কুরআন মানব, আমরা শুধু হাদিস মানব, আমরা শুধু হুজুর নবী মুহাম্মাদুর

CamScanner

রাসুলুল্লাল্লাহ (ﷺ) কেই অনুসরণ করব আর কাউকেই না, আমরা শুধু তাঁকেই মানব আর কাউকেই না?

কোন মুসলমান কি কখনো এটা বলতে পারে যে, আমি কুরআনের পথ অনুসরণ করব না, আমি সুন্নাহ অনুসরণ করব না, আমি নবী করিম (ﷺ) কে অনুসরণ করব না? তাহলে কি সে মুসলমান থাকবে? না, কখনোই না। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ তথা হুজুর পাক (ﷺ) কে অনুসরণ করা ছাড়া কারো কোন মুক্তি নাই। কিন্তু এর মানে কি এই যে আমরা অন্য কাউকেই অনুসরণ করতে পারব না? কারো পথেই চলতে পারব না? কারো মতই মানতে পারব না? আসুন দেখি সূরা ফাতিহা কি বলে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সূরার শুরুতেই তাঁর নিজের গুণস্তুতি ও প্রশংসা বর্ণনা করছেন। অতঃপর উবুদিয়্যাৎ ও রবুবিয়্যাত অর্থাৎ ইবাদাত এবং দুনিয়া আখিরাতের প্রকৃত মালিকানা ও প্রতিপালন ক্ষমতা একমাত্র তাঁর বলে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা শুধু মাত্র তাঁর ইবাদাত করব এবং তার কাছেই সাহায্য চাইব একথা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সূরা ফাতিহাতে বলছেন,

সুরা নং ১: আয়াত নং ৬

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,"

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যে, আমরা যেন সরল পথ অর্থাৎ "সিরাতুল মুস্তাকিম" এর পথে চলার জন্য তাঁর কাছে তৌফিক কামনা করে দোআ করি। এই দোআর আড়ালে আসলে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আদেশও করছেন যে, আমরা যেন "সিরাতুল মুস্তাকিম" ছাড়া অন্য কোন পথে না যাই। তো ইয়া রাব্বাল আলামীন "সিরাতুল মুস্তাকিম" কি? এটা

কার পথ? এটা কি পবিত্র কুরআনের পথ? হাদিস শরিফের পথ? এটা কি কোন মানুষের পথ? এটা কি শুধুমাত্র একজনেরই পথ? নাকি বহুজনের পথ? ইয়া আল্লাহ! এটা কি শুধুমাত্র তোমার প্রিয় হাবিব নবীজিরই (ﷺ) পথ? নাকি তোমার নবীজির (ﷺ) খাঁটি উম্মতগণেরও পথ?

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, সুরা ফাতিহা, আয়াত ৭-

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(আমাদেরকে পরিচালিত কর) সে সমস্ত লোকের পথে, যাদের ওপরে তুমি নেয়ামত বর্ষণ করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন জবাব দিচ্ছেন যে, সেই সিরাতুল মুস্তাকিম একজনের পথ নয়। যদি শুধুমাত্র একজনের পথই হত তবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বহুবচনের সিগাহ ব্যবহার করতেন না। صراط الذين না বলে صراط الذي বলতেন। আসুন এখন এর ব্যাখ্যাটি সবচাইতে নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব তাফসিরে ইবনে কাসীর বা তাফসিরুল কোরআনীল আজীম থেকে দেখে নেই।

তাফসীরে ইবনে কাসীরের ১ম খন্ডের ৪০ নং পৃষ্ঠায় সূরা ফাতেহার তাফসীরে বর্ণনা হচ্ছে যে, صراط الذين أنعمت عليهم ই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিমের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাঁদের পথে চলতে হবে যাদের উপর আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। যাদের উপর আল্লাহ পাক রহমত ও নিয়ামত বর্ষণ করেছেন তাঁদের রাস্তাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম। আমরা জানলাম যে, সূরা ফাতিহাতে দোআর আড়ালে আসলে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আদেশও করছেন, আমরা যেন সিরাতুল মুস্তাকিম ছাড়া অন্য কোন পথে না যাই।

CamScanner

আমরা আরো জেনেছি যে, সিরাতুল মুস্তাকিম বা সঠিক সরল পথ হচ্ছে তাঁদের পথ যাদের উপর আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নিয়ামত (করুনা) বর্ষণ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, উসুলে কুরআন অনুযায়ী, কোরআন শরিফের সবচাইতে সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বা তাফসির হচ্ছে যদি কোরআন শরিফের এক আয়াতই অপর আয়াতকে ব্যাখ্যা করে। একে উসুলে কুরআনের পরিভাষায় তাফসিরুল আয়াতি বিল আয়াহ বলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ পাক কাদের উপর নিয়ামত (করুনা) বর্ষণ করেছেন? আসুন দেখি এর ব্যাখ্যায় কুরআন শরিফেরই অন্য কোন আয়াত থেকে এ সম্পর্কে আমরা কিছু পাই কি না। সুরা নিসার ৬৯ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন যে,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

"আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। (নিয়ামত প্রাপ্ত যাঁরা) তাঁরা হলেন নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।

আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহ পাক চার শ্রেণীর মানুষের উপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন, আর তাঁরা হলেন, ১. নবীগণ ২. সিদ্দিকগণ (অতি বিশ্বাসীগণ, আর এর এক ব্যাখ্যায় এসেছে যে তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর নবীজির (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামগণ, কারণ তাঁরাই ছিলেন অতি বিশ্বাসী) ৩. শহীদগণ এবং ৪. সালেহীনগণ অর্থাৎ সৎকর্মশীলগণ।

কাজেই বুঝা গেল যে উপরোক্ত চার শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কারো মত বা পথ অনুসরণ করা যাবে না। কারণ কুরআন শরিফের পরিভাষায় তাদের উপরই আল্লাহ পাক রহমত ও নিয়ামত বর্ষণ করেছেন আর তাঁদের রাস্তাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম। আমরা

CamScanner

জানলাম যে, সূরা ফাতিহাতে দোআর আড়ালে আসলে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আদেশ করছেন, আমরা যেন সিরাতুল মুস্তাকিম ছাড়া অন্য কোন পথে না যাই।

আমরা আরো জেনেছি যে, সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল সঠিক পথ হচ্ছে তাঁদের পথ যাদের উপর আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। আর সুরা নিসার ৬৯ নং আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ পাক চার শ্রেণির মানুষের উপর নিয়ামত, রহমত বা করুনা বর্ষণ করেছেন, আর তাঁরা হলেন, ১. নবীগণ ২. সিদ্দিকগণ ৩. শহীদগণ এবং ৪. সালেহীনগণ অর্থাৎ সৎকর্মশীলগণ।

এখন প্রথম প্রকারের নিয়ামতপ্রাপ্ত মহামানবগণ আম্বিয়ায়ে কেরাম কারা আমরা তাঁদেরকে চিনি এবং তাঁদের পথ ও মত মানতে আমাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও নাই।

দ্বিতীয় প্রকারের নিয়ামতপ্রাপ্ত মহামানবগণ সিদ্দীকিনের দ্বারা আমরা যদি আল্লাহর নবীজির (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামগণকে বুঝি তবে তাঁদের পথ ও মত মানতেও আমাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই বললেই চলে। তৃতীয় প্রকারের নিয়ামতপ্রাপ্ত মহামানবগণ দ্বারা "শোহাদায়ে কেরাম" গণকে বুঝানো হয়েছে, তাঁদেরকেও আমরা চিনি জানি ও মানি। তাঁদের পথ ও মত মানতেও আমাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই বললেই চলে।

এখন আসুন চতুর্থ প্রকারের নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্ত মহামানবগণের ব্যাপারে জানি তারা কারা। কারণ এখানে এসে আমাদের জ্ঞান কাজ করে না, বরং সব বুঝ উল্টে যায়। যা খুবই দু:খজনক। কুরআন শরিফের উপরোক্ত আয়াতে এসেছে যে, চতুর্থ প্রকারের নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্ত মহামানবগণ সালেহীন বা সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা কারা যাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে? (দেখুন তাফসিরে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, সূরা নিসা পৃষ্ঠা নং ৬৪৪-৬৪৫)

CamScanner

প্রথম কথা হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এখানে কিন্তু বলেন নাই যে, মুনিনগণের পথ বা মুসলিমগণের পথ। শুধু মুমিন - মুসলমান বললে আমভাবে সকল ঈমানদারের পথ বুঝাত। বরং আল্লাহ পাক একে খাস করেছেন যে, শুধু মুমিন মুসলমান হলেই হবে না বরং তাদেরকে "সালেহীন" বা "সৎকর্মশীল" হতে হবে। সাধারন মুমিন-মুসলমানগণ থেকে তাঁদের স্থান, তাদের মর্যাদা আরো উপরে। তাঁদেরকেই আমরা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলি, যারা সৎকর্মশীল এবং যাদেরকে আল্লাহপাক ভালোবাসেন, যারা আল্লাহ পাককে ভালোবাসেন। (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৫৪)

যাঁদের সম্পর্কে আল-কুরআনের সূরা ইউনুসের (১০নং সূরা) ৬২-৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে।

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয়না। এটাই হল মহা সফলতা।

আল্লাহর এরকম মহান বন্ধুগণের ব্যাপারে পবিত্র হাদিসে কুদসীতে এসেছে যে, "যারা আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করি।" (সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কোমল হওয়া, পরিচ্ছেদ নং ২৭২০: তাওয়াদু বা বিনয়, হাদিস নং-৬০৫৮)

কাজেই আমরা আরো বুঝতে পারলাম যে, সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল সঠিক পথ শুধুমাত্র যে রাসুল করীমের (ﷺ) রাস্তা তা নয়, বরং

CamScanner

সিরাতুল মুস্তাকীম হচ্ছে : রাসুল করীমের (ﷺ) রাস্তা, তাঁর প্রিয় খোলাফায়ে রাশিদীনগণের রাস্তা, তাঁর আহলে বায়ত বা পরিবার পরিজনের রাস্তা, তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামগণের রাস্তা, শহীদগণের রাস্তা এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের রাস্তা, যাঁরা সৎকর্মশীল খোদাভীরু, এবং যাদেরকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন, যারা আল্লাহ পাককে ভালোবাসেন অর্থাৎ তাঁরাই আল্লাহর আউলিয়াগণ।

কিন্তু সবার রাস্তা একই রাস্তা, সব মিলেমিশে এর নাম সিরাতুল মুস্তাকীম। কোন আল্লাহর ওলীই রাসুলুল্লাহর (ﷺ) তরীকার বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। যদি যান তবে তাঁরা কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারেন না। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, যারা বলেন, "আমরা শুধু নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাল্লাহ (ﷺ) কেই অনুসরণ করব আর কাউকেই না", তাদের এই দাবি আসলে হযরত আলীর (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম) ভাষায় كلمة حق أريد بها باطل সত্য কথার দ্বারা উদ্দেশ্য মিথ্যা। (?)

যখন খারেজিরা হযরত আলীর (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম) দল এবং আমির মুয়াবিয়ার রা. দল অর্থাৎ উভয় দলই ত্যাগ করে এবং তাঁদের মধ্যকার শালিশের ফায়সালা মেনে নেয় নাই, তারা নতুন দল গঠন করে বলেছিল যে, إن الحكم إلا لله আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম বা ফায়সালা নাই। (আল-কুরআন : সুরা আনআম, আয়াত নং ৫৭) অর্থাৎ তারা দাবি করেছিল যে, আমরা আলীকেও মানি না, মুয়াবিয়াকেও মানি না। আমরা শুধু আল্লাহর হুকুম বা ফায়সালা মানি।

তখন হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম) সেই খারেজীদের উদ্দশ্যে বলেছিলেন, كلمة حق أريد بها باطل সত্য কথার দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্যটা মিথ্যা। খারেজীগণ কুরআনের আয়াতের অপব্যবহার করে শুধুমাত্র নবীজির (ﷺ) চাচাত ভাই,

CamScanner

জামাতা, তাঁর খলিফা, তাঁর উত্তরসুরী, জ্ঞানের নগরী হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম) কে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। তারা শুধুমাত্র তাঁকে যেন মানতে না হয় সেজন্য কুরআনের আয়াতের মনগড়া অপব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিল। যেই কারণে মাওলা আলী রা. খারেজিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর আজকের মুসলমান সমাজের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলেও একই অবস্থা দেখতে পাই, কুরআন শরিফের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং অপব্যবহার হচ্ছে। অমুসলিমদের উপর যে আয়াত অবতীর্ন হয়েছে, তা মুসলমান ও ঈমানদারের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভুল অর্থ নেয়া হচ্ছে। আমরা জানি যে, কুরআন শরিফের আয়াতসমূহের অনেক ধরনের অর্থ হয়। এরমধ্যে মধ্যপন্থার ব্যাখ্যাগুলো রেখে উগ্রপন্থায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সমাজে ঘৃণা ও সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য। শান্তিপ্রিয় সেই সালিহিন সুফিগণ যারা ইসলাম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাঁদের অবদানকে হেয় ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্য মনগড়া উগ্রপন্থী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কুরআন -হাদিসের।

হাদিস শরিফের অপব্যবহার করা হচ্ছে। সহীহ হাদিসকে দয়ীফ বলা হচ্ছে। হাসান হাদিসকে দয়ীফ হলা হচ্ছে। উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটাই, যেন আল্লাহর আউলিয়াগণকে, তাঁর বন্ধুগণকে না মানতে হয়, ইসলাম ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে যারা দিনরাত কাজ করেছেন সেসব সুফিগণকে যেন না মানতে হয়। যেন সুফিগণের তরিকাসমূহ না মানতে হয়।

তাঁদের কাছে যেন সারেন্ডার না করতে হয়। অহম আর আমিত্ব ছেড়ে দিতে তারা নারাজ। কেউ কি দুনিয়াতে থেকে আল্লাহ পাকের দেখা পেয়েছে কখনো সারেন্ডার বা আত্মসমর্পন করার জন্য? যুগে যুগে তাঁর খলিফা বা তাঁর প্রতিনিধিগণের কাছেই আত্মসমর্পন করতে হয়েছে। কুরআন- হাদিস স্টাডি করে দেখুন, সাহাবায়ে কেরামগণ নবী করীমের (ﷺ) কাছে বায়আত হয়েছেন, পরবর্তীতে সাহাবায়ে

CamScanner

কেরামগণ এবং তাবেয়িনগণ খোলাফায়ে রাশেদীনগণের কাছে বায়আত হয়েছেন।

তখন শরীয়তের বায়আত এবং তরিকতের বায়আত সব এক জায়গায়ই ছিল, তিনি ছিলেন আমিরুল মুমিনিন বা খলিফাতুল মুসলিমিন।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন খোলাফায়ে রাশেদীনের সিস্টেম চলে গেল সাথে সাথে শরীয়তের খেলাফতের বায়আতের সিস্টেমও চলে গেল। তখন থেকে শুরু হলো শুধুমাত্র তরিকতের বায়আতের সিস্টেম। তখন নবীজির (ﷺ) আহলে বায়ত তথা তাঁর পরিবার বা পাকপাঞ্জাতনের বংশধরগণের কাছে মানুষ বায়আত হয়েছেন। তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনগণ ঈমান হাসান আল বাসরীর রাহ. মত জলিলুল কদর তাবেয়িনগণের কাছে বায়আত হয়েছেন, আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

পরবর্তীতে ইন শা আল্লাহ তাকওয়ার বায়াত বা তরিকতের বায়য়াতের অকাট্য দলিল নিয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করেছি।

আকিদাতে বিশ্বাসে কী শাখা-প্রশাখা (ফুরু) বলতে কিছু আছে? নাকি সবই মৌলিক বিষয় (উসুল)?

ইলমে ফিকহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্রে অর্থাৎ শরীয়তের আমলি হুকুম আহকামগুলোতে ফুরু বা শাখা-প্রশাখা আছে সেটা আমরা সবাই মানি। কিন্তু আমরা অনেকে মনে করি যে, আকিদা শাস্ত্রের সকল কিছুই মৌলিক বিশ্বাস বা উসুলি বিষয়। এখানে কোন শাখা-প্রশাখা নেই অর্থাৎ ফুরুয়াত বলতে কিছু নেই। তাই আকিদার সামান্য হেরফের হলেই আমরা একে অপরকে তাকফির করি অর্থাৎ এক মুসলমান আকিদার ক্ষেত্রে সামান্য ভুলত্রুটিপূর্ণ কিছু বললেই বা সামান্য মতপার্থক্য করলেই তাকে আমরা কাফির বলে দিই, ফাসিক বলে দিই। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক।

CamScanner

অথচ দেখুন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের স্বীকৃত দুটো হক শাখা বা মাযহাব এর একটির নাম হচ্ছে আশয়া'রি অপরটি হচ্ছে মাতুরিদি। এই দুই হক আকিদাগত মাযহাবের মধ্যেও শাখা প্রশাখাগত মতপার্থক্য রয়েছে। আশয়া'রি মতবাদ যা ইমাম আবুল হাসান আশয়া'রি রাহ. (জন্মঃ ২৬০ হিজরি) প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইমাম আবুল হাসান আশয়া'রির রাহ. পূর্বপুরুষ জলিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু মুসা আল আশয়া'রি রাহ., এই আশয়া'রি কওমের প্রশংসা করে কুরআন মাজিদে আয়াত নাজিল হয়েছে এবং প্রিয় নবীজি (ﷺ) ও তাঁদের মধ্যকার সৌহার্দ্য ও মায়া-মমতার, খাদ্য ভাগাভাগি করা ইত্যাদির প্রশংসা করেছেন। যিনি প্রথম জীবনে মু'তাজিলি আকিদাভূক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে মু'তাজিলাদের ভ্রান্ত আকিদা তার নিকট ধরা পড়ার পর তিনি অসংখ্য অগনিত কিতাব রচনা করার মাধ্যমে মু'তাজিলাসহ সকল বাতিল মতবাদকে খন্ডন করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সঠিক আকিদাকে পূনর্জাগরন করেন। তাঁকে সেই শতকের মুজাদ্দিদ বলা হয়। আরবের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ সাধারণত ইমাম আবুল হাসান আশয়া'রি রাহ. কে অনুসরণ করেন আকিদার বিষয়ে।

অপর মতবাদটি যা মাতুরিদি নামে পরিচিত তা ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদির রাহ. (জন্মঃ ২৩৩ হিজরি) সাথে সম্পর্কিত। তিনি আবুল হাসান আশয়া'রির রাহ. আগে থেকেই মু'তাজিলা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বংশধারা গিয়ে মিশেছে অপর সাহাবীয়ে জলিল হযরত আবু আইয়ুব আল আনসারির রা. সাথে। ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদিকেও তার শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলা হয়। সাধারণত অনারব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সদস্যগণ ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদির রাহ. প্রণীত আকিদার অনুসরণ করেন। তিনি মূলত ইমাম আবু হানিফার রাহ. আকিদা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু

CamScanner

ইমাম আবু হানিফার রাহ. সাথেও আকিদার কিছু কিছু শাখা প্রশাখাগত মাসয়ালাতে তিনি মতপার্থক্য করেছেন।

আপনাদের বুঝার সুবিধার জন্য আশয়া'রি ও মাতুরিদি নামের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের এই দুই হক শাখার অনেকগুলো মতপার্থক্যের মধ্যকার মাত্র কয়েকটি তুলে দিলাম উদাহরণস্বরুপঃ

১.মাতুরিদিগণ আল্লাহর জন্য সিফাতুজ জাত ও সিফাতুল ফে'ল এর মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। কিন্তু আশয়ারিগণ এ দুটোর মাঝে পার্থক্য করেন।

২. মাতুরিদিগণ বলেন, মানুষ যা করতে পারবে না, তা আল্লাহ চাপিয়ে দেন না। আশয়ারি অনেকেই এর বিপরীত আকিদা রাখেন, যদিও ইমাম গাজ্জালী ও ইসফারাইয়াইনি সহ অনেকেই মাতুরিদিদের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

৩. মাতুরিদিগণ বিশ্বাস করেন, আল্লাহ পাক শাস্তির যে ওয়াদা দিয়েছেন তাঁর সেই ওয়াদা তিনি খেলাফ করবেন না। কিন্তু আশয়ারিগণ তার বিপরীত আকিদা রাখেন।

এরকম আরো অসংখ্য জটিল ও সূক্ষ্ম্য বিষয় আছে যেখানে এই দুই শাখার মাঝে মতপার্থক্য আছে। কিন্তু এসবই আকিদা শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখাগত ফুরুই' পার্থক্য। এগুলো কাদিয়ানীবাদের মত উসুলী বা মৌলিক মতপার্থক্য নয়, মায়াজাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। যেমন কাদিয়ানিরা বিশ্বাস করে যে, প্রিয় নবীজি (ﷺ) র পরও নবী আসতে পারেন (নাউজুবিল্লাহ)! তারা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকেও নবী মানে। এজন্য তারা কাফির। কারণ প্রিয় নবীজির (ﷺ) খতমে নবুওয়াত দ্বীনের আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটা কোন শাখা-প্রশাখাগত বিষয় নয়। ঠিক একইভাবে শিয়াদের ছোট একটি অংশ মাওলা আলীকে আল্লাহর অংশ মনে করে, তারা নুসাইরি নামে পরিচিত। এরাও কাফির। শিয়াদেরই আরেকটা ছোট অংশ কুরআন মাজিদকে বিকৃত বা অসম্পূর্ণ মনে করে তারাও কাফির হবে। কারণ

আল্লাহর কোন শরিক ও অংশ নেই এটা আমাদের আকিদার মূল, কোন শাখা প্রশাখাগত বিষয় নয়। কুরআন মাজিদের সংরক্ষণের গ্যারান্টি আল্লাহ পাক দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার হেফাজত করব" (আল কুরআন)। তাই এর বিপরীত আকিদা রাখলে সে কাফির, কারণ কুরআনের আয়াত মুতাওয়াতির এবং অকাট্য।

কিন্তু আশয়ারি ও মাতুরিদিগণের মাঝে আকিদাগত পার্থক্যগুলো শাখা-প্রশাখাগত, দ্বীনের মৌলিক বা মা উলিমা মিনাদ দীনে বিদ দারোরাতে (দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ) নয়। তাই এসব মতপার্থক্যের কারণে কাউকে মন্দ বলা যাবে না। এগুলো অনেকটাই ফিলসফিকাল অভিমত।

যারাই কোন আলীমের আকিদা ও ঈমান নিয়ে কথা তুলছেন তাদেরকেই আমি কিছু অনুরোধ করব, কিছু বিষয় আরেকটু যাচাইবাছাই করে দেখার জন্য। ইমাম আবুল হাসান আশয়ারি রাহ. (২৬০ হিজরি) এবং ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদি রাহ. (২৩৩ হিজরি) আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার দুজন সর্বজন মান্যবর ইমাম, মুজতাহিদ ও শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন। কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হচ্ছে, তাঁদের দুজনের মাতুরিদি ও আশয়ারি মতের মধ্যে আকিদার ২৯ টি বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মত ছিল। তো তাঁদের কাকে আপনি কাফির বলবেন? নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। সেই ২৯ টি মাসয়ালাতে যেহেতু পরস্পর বিরোধী মত ছিল তাই কেউ সঠিক ইজতিহাদ করেছেন আর কেউ ভুল। এজন্য আপনি কাউকে দোষারোপ করতে পারবেন? নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। অবশ্যই না। বরং উভয়ই বরহক ছিলেন। কাউকেই কিছু বলতে পারবেন না। কারণ এগুলো আকিদা বিশ্বাসের ফুরু বা শাখা-প্রশাখাগত মতপার্থক্য। ভেতরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়।

আর আপনাদের জানার জন্য বলছি, সেই শাখা-প্রশাখাগত ২৯ টি বিষয়ের মাঝে কয়েকটি বিষয় ছিল ইলাহিয়াতের মাসয়ালা। আল্লাহ

CamScanner

পাক সম্পর্কিত। আল্লাহ পাক সম্পর্কিত বিষয়ে শাখা-প্রশাখাগত মাসয়ালাতে মতপার্থক্য থাকার পরও যদি দুই ইমামই বরহক হয়ে থাকেন, তাহলে ঈমান আকিদার বাকি বিষয়ে শাখা প্রশাখাগত কিছু বিষয়ে মতপার্থক্যের পরও কেন কোন আলীম হক থাকতে পারবেন না? আমি বার বার বলছি, এই আকিদাগত মতপার্থক্য সুস্পষ্ট, অকাট্য (কাতয়ি) এবং দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (মা উলিমা মিনাদ দিনি বিদ দারুরাহ) বা মৌলিক (উসুল) কোন বিষয়ে হতে পারবে না। এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম এক। কেউ ভিন্নমত রাখলেই কাফির। এই আকিদাগত মতপার্থক্য শাখা-প্রশাখাগত (ফুরুই) অস্পষ্ট এবং ধারণাগত (জন্নি) বিষয়ে হতে হবে। তাই কোন আলীমের যেসব বিষয় আপনার খটকা লাগছে, দয়া করে সেসব বিষয় উসুলে (দ্বীনের মৌলিক বিষয়) না ফুরু (শাখা প্রশাখাগত বিষয়) তে খুঁজে দেখুন গবেষণা করুন। ঢালাও ফতোয়া ও ঢালাও কাফির ফতোয়া কাম্য নয়।

কলামটির মূল শিক্ষা-

আকিদার সবই উসুল বা মৌলিক বিষয়, এটা ঠিক নয়। আকিদাতেও শাখা প্রশাখাগত ফুরুই' বিষয় রয়েছে, যেগুলোতে আমাদের বিশ্বাস হেরফের হলে বা ভিন্ন ভিন্ন হলে আমরা একে অপরকে কাফির বলে দিতে পারি না, ফাসিক বলে দিতে পারি না। যা এখন আমাদের সমাজে অহরহ হচ্ছে। সামান্য পান থেকে চুন খসলে আমরা একে অপরকে কাফির-গোমরাহ বলে দিচ্ছি। এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের নীতিমালার খেলাফ। এগুলো আমাদের সমাজকে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের একতাকে বিনষ্ট করছে। তাই এসব তাকফিরি চিন্তা-চেতনা পরিহার করা উচিত।

CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রিয় নবীজির ক্ষমতা ও মর্যাদা এবং সুমহান আখলাক

প্রিয় নবীজির (ﷺ) ক্ষমতা ও মর্যাদা আসলে আমরা কতটুকু বুঝি?

ভাই ও বোনেরা! দলিলই যদি হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজির (ﷺ) মর্যাদার নিরুপক (যদিও প্রিয় নবীজিকে (ﷺ) সর্বোচ্চ জানতে ও মানতে, প্রাণের চাইতে অধিক ভালোবাসতে আশিকের কোন দলিল লাগে না) তবে আজ দলিল নিয়েই আলোচনা করব।

কুরআন মাজিদের কোথাও শুধু আল্লাহর আনুগত্য কর এমনটা উল্লেখ নাই। প্রায় ২৭ জায়গায় ভিন্ন ভিন্নভাবে এসেছে আল্লাহ ও নবী-রাসুলগণের আনুগত্য করতে। কিন্তু শুধু আল্লাহর রাসুল (ﷺ) র আনুগত্য করতে ঠিকই বলা হয়েছে, আর সেখানে আল্লাহর আনুগত্যের কথা উল্লেখই করা হয় নি।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও"। (সূরা নুর, আয়াত নং-৫৬) আল্লাহর আনুগত্যের কথা উল্লেখ না করে শুধু রাসুলের আনুগত্যের কথা কেন উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা কী তা কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছি? এই প্রশ্নের জবাব কুরআন মাজিদেরই অন্য আয়াতে দেয়া হচ্ছেঃ

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

যে লোক রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা, আয়াত নং-৮০) প্রকৃতপক্ষে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ)

CamScanner

আনুগত্য করা আল্লাহরই আনুগত্য করা। এক প্রকারের লোক দাবি করেন আমরা প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসাতে বাড়াবাড়ি করি। সারাক্ষণ খালি নবীজির (ﷺ) ভালোবাসার কথা বলি, দরুদ ও সালামের কথা বেশি বেশি বলি।

প্রিয় পাঠক! মূলত প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা থেকে আলাদা কিছু নয়। যদি প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসাকে আলাদা কিছু মনে করেন কেউ তবেই কেবল সমস্যা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন,

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ

তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়যাতে তোমাদের রাজি করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে রাজি করা অধিক জরুরী। (আল কুরআন, ৯:৬২)

আরবি ব্যকরণ যারা জানেন তারা বুঝবেন, এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ﷺ) দুজনের জন্য একবচনের সর্বনাম ব্যবহার হয়েছে। يُرْضُوهُ, এসেছে يرضوهما এর জায়গায়। উনাদের দুজনকে রাজি করা অধিক জরুরী বুঝাতে উনাকে রাজী করা অধিক জরুরী বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, এটা বুঝানো যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের রাজি খুশি একই। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা অপর আয়াতে বলেছেন,

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। (আল কুরআন, ৪৮:৯)

CamScanner

সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখানেও দ্বিবচনের জায়গায় একবচন নেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন মাজিদের অপর জায়গায় বলছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (আল কুরআন, ৩৩:৫৭) দুনিয়ার কোন মানুষের ক্ষমতা নেই আল্লাহ পাককে কষ্ট দেবে, মূলত রাসুলে কারিম (ﷺ) কে যে কষ্ট দিল সেই আল্লাহকে কষ্ট দিল। রাসুলকে কষ্ট দেয়া মানে আল্লাহকে কষ্ট দেয়া।

অপর আয়াতে এসেছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

যারা আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্তরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (আল কুরআন, ৪৮:১০) রাসুলের (ﷺ) হাতে বায়াত গ্রহণকে আল্লাহর কুদরতি হাতে বায়াত গ্রহণ করার শামিল বলা হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন,

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং, যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। (আল কুরআন, ৮:১৭)

বদরের যুদ্ধে নবী কারিম (ﷺ) মক্কার কাফির কুরাইশদের উদ্দেশ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, আল্লাহ বলছেন এটা তো মাহবুব আপনি নন, বরং আমি আল্লাহ স্বয়ং নিক্ষেপ করেছি।

নবীজির (ﷺ) কোন কথা নিজের নয়, বরং সেই কথাও আল্লাহর কথা,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (আল কুরআন, ৫৩ঃ৩-৪)

আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুলের (ﷺ) জাত আলাদা, অস্তিত্ব আলাদা, কিন্তু বাকি সব এক। রাসুলের (ﷺ) আনুগত্য, আল্লাহর আনুগত্য, নবীজির (ﷺ) রাজি-খুশি আল্লাহর রাজি খুশি, নবীজির (ﷺ) হাত মোবারক আল্লাহর কুদরতি হাত, নবীজির (ﷺ) কংকর নিক্ষেপ মূলত আল্লাহর কংকর নিক্ষেপ, নবীজির (ﷺ) হাতে বাইয়াত মূলত আল্লাহর কুদরতি হাতে বায়াত, নবীজির (ﷺ) কথা মূলত আল্লাহর কথা, নবীজিকে (ﷺ) সাহায্য করা মূলত আল্লাহকে সাহায্য করা, নবীজিকে (ﷺ) সম্মান করা ও ভালোবাসামূলত আল্লাহকে তাজিম করা ও ভালোবাসা। তাহলে এখানে বাড়াবাড়ি কোথা থেকে আসে?

হুজুর নবী কারিম (ﷺ) হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন,

احبوا الله لما يغذوكم من نعمه واحبوني لحب الله واحبوا اهل بيتي لحبي

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস কারণ তিনি তোমাদেরকে বহু নিয়ামত দিয়েছেন, আর আমাকে ভালোবাস আল্লাহর ভালোবাসার ওয়াস্তে, আমার আহলে বায়তকে (আমার পরিবারকে) ভালোবাস আমার ভালোবাসার ওয়াস্তে। (তিরমিজি)

কাজেই আমরা হুজুর নবীয়ে পাক (ﷺ) কে ভালবাসি আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে, তাঁর রাজিখুশি পাওয়ার জন্যই।

যারা বলেন যে, নবীজির (ﷺ) অনুসরণই নবীজির ভালোবাসা, তারা অনেক বড় পরিক্ষার সম্মুখীন, ফিতনার সম্মুখীন। ভালোবাসা এক জিনিস আর অনুসরণ আরেক জিনিস। ভালোবাসার সংজ্ঞা তাই বলে। কারো দিকে আপনার রুহ ঝুকে যাওয়াকে ভালোবাসা বলে, আর অনুসরণ হচ্ছে ভালোবাসার লাওয়াযিমাতের (যা ভালোবাসার কারণে আবশ্যক হয়) অন্যতম।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(হে আমার হাবিব) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (আল কুরআন, ৩:৩১)

আগে ভালোবাসা আসে, তারপর বলা হচ্ছে অনুসরণ। তাই অনুসরণই ভালোবাসা বলাটা বিরাট বড় ভুল। তবে ভালোবাসার পর অনুসরণ করলেই কেবল আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়, তখনই মানুষ ওলি বা আল্লাহর বন্ধু হয়। যদি তাই না হত তবে নবীজি (ﷺ) শরাব পানের অপরাধে কয়েকবার শাস্তি পাওয়া সাহাবী আব্দুল্লাহ আল হিমারের রা. ব্যাপারে এই স্বাক্ষ্য দিতেন না যে, তোমরা আমার আব্দুল্লাহ আল হিমারকে লানত করবে না, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে (ﷺ) ভালোবাসেন। (সহিহ বুখারি, শাস্তির অধ্যায়, হাদিস নং ৬৩৯৮)

CamScanner

প্রাণের চাইতে অধিক ভালোবাসতে বলা হয়েছে, তাই এখানে বাড়াবাড়ির কোথা থেকে আসে? আমরা কেউ প্রাণ দিয়ে কোথায় ভালোবাসতে পারলাম রাসুল (ﷺ) কে? নবীজির (ﷺ) ভালোবাসার হকই আদায় করতে পারিনি আমরা, যতটুকু সম্মান করা দরকার তাই দিতে পারিনি আমরা, তো বাড়াবাড়ি কখন হবে?

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয়। (আল কুরআন, সূরা আহযাব, ৩৩:৬)

হযরত ওমর রা. স্বাক্ষ্য দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আমি আপনাকে আমার পিতা পুত্র ধন সম্পদ দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে অধিক ভালবাসি, কিন্তু আমার প্রাণের চাইতে অধিক ভালোবাসতে পারিনি।

হুজুর রাসুল (ﷺ) হযরত ওমর রা. কে বললেন, না হে ওমর! যতক্ষণ না প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাস ততক্ষণ তোমার ঈমান পরিপূর্ন হবে না।

ওমর রা. বললেন, যদি তাই হয় তবে ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি এখন থেকে আমার প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয়। হুজুর রাসুল (ﷺ) বললেন, এখন হে ওমর তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে। (সহিহ বোখারি, ঈমান অধ্যায়)

একদিন খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. দাওয়াত দিলেন হযরত ওমর রা. কে। খলিফাকে দাওয়াত দিয়েছেন, আমিরুল মুমিনিনকে। তাই অনেক আইটেম রান্না করা হলো, আমিরুল মুমিনিনের সামনে উপস্থাপন করা হলো। হযরত ওমর রা. কাঁদতে শুরু করলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. জিজ্ঞেস করলেন, ما يبكيك يا امير المؤمنين؟

হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি জবাব দিলেন, আমার দুইজন সাথী (প্রিয় নবীজি (ﷺ) ও আবু বকর রা.) চলে গেছেন, যারা একটির বেশি দুইটি আইটেম দিয়ে খান নাই কোনদিন, এক নাগাড়ে তিন দিন কোনসময় পেট পুড়ে খান নাই। এই বলে তিনি খাওয়া থেকে ওঠে গেলেন।

এটা ভালোবাসা ছিল যা উনার মনে ঐ সময় উদয় হয়েছে। যা উনার মনকে খেতে সায় দেয়াতে পারেনি। ভালোবাসা এমনই। ভাল খাওয়া জায়েজ, হারাম নয়। কয়েক পদ দিয়ে খাওয়াও জায়েজ, কিন্তু ভালোবাসা যখন প্রাণের চেয়ে অধিক কারো প্রতি হয়ে যায় তখন আশিকের অবস্থা এমনই হয়।

আর ভালোবাসা হবেই বা না কেন প্রাণের চাইতে অধিক?

ভালোবাসার সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা যদি প্রিয় নবীজির (ﷺ) দিকে তাকাই, তাহলে দেখব পৃথিবীর সব সৌন্দর্য তাঁর মাঝে ছিল। প্রিয় নবীজির (ﷺ) বাহ্যিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সব চাইতে সুন্দর যা বলা হয়েছে তা হলোঃ

"ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত মিশরের রমনীরা ছুরি দিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেললেন,

ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত সাহাবীগণ জিহাদের ময়দানে আপনার জন্য নিজেদের শির (মাথা) কাটিয়ে ফেললেন"।

আর নবীজির (ﷺ) আখলাকি কামাল বা সুমহান চারিত্রিক মাধুর্য্য সম্পর্কে কী বলব? যার সম্পর্কে আলাহ তায়ালা বলেন স্বয়ং বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আপনি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের অধিকারী। (আল কুরআন, ৬৮;৪)

আমাদের প্রতি ইহসান! ঈমান পেলাম উনার মাধ্যমে, ইসলাম পেলাম উনার মাধ্যমে, কুরআন পেলাম উনার মাধ্যমে, স্বয়ং

আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানলাম উনার মাধ্যমে। এর চেয়ে বড় ইহসান দুনিয়ার কোন মানুষ কারো উপরে করেছে বলে কেউ চিন্তা করতে পারে?

চলুন এখন কিছু হাদিস আমরা আলোচনা করব, আর প্রাণপ্রিয় নবীজির (ﷺ) মর্যাদাকে এই হাদিসগুলো কোন স্তরে নিয়ে যায় সেই ফায়সালা আজ আপনারা দিবেন।

হাদিস নং -১

বোখারি শরিফ, নামাজের অধ্যায়, কিবলামূখী হওয়ার পরিচ্ছেদ সমূহ, পরিচ্ছেদঃ নামাজ পরিপূর্ণ করতে মানুষের প্রতি ইমামের উপদেশ ও কিবলার স্মরণ, হাদিস নং-৪০৮

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কী মনে কর আমার কিবলা এখানেই? আল্লাহর কসম আমার কাছে তোমাদের খুশু লুকায়িত নয়, তোমাদের রুকুও লুকায়িত নয়, আমি তোমাদেরকে আমার পেছন দিক থেকেও দেখি।

সম্মানিত পাঠক! আল্লাহর রাসুল (ﷺ) যে পেছন দিক থেকে দেখতেন তা তো আমরা জানি, এটা মশহুর। কিন্তু তিনি সাহাবাগণের "খুশু" ও দেখতেন! এর মানে কী?

খুশু শব্দের শাব্দিক অর্থ বিনয়, নম্রতা, আজিজি-ইনকিসারি। আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা! বিনয়, নম্রতা, তাকওয়া, পহেজগারি আল্লাহর ভয়, এটা সম্পূর্ণ অন্তরের ভেতরের বিষয়। নামাজে কে কতটুকু বিনয়ী, কে কতটুকু নম্র, কে কতটুকু একনিষ্ঠ তা শুধু আল্লাহ পাকেরই জানার কথা। অথচ বোখারি শরিফের সহিহ হাদিসে আল্লাহর রাসুল (ﷺ) দাবী করেছেন যে, নামাজরত সাহাবাগণের

CamScanner

রুকু, সিজদা, তাদের সকল বাহ্যিক অবস্থা এমনকি তাদের অন্তরের অবস্থাও প্রিয় নবীজির (ﷺ) কাছে প্রকাশ্য ছিল।

হাদিস নং-২

সহিহ বোখারি, জ্ঞানের অধ্যায়, হাদিস নং- ৬৬

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

হযরত আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার মসজিদে বসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনজন লোক এলেন। তন্মধ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে এলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবূ ওয়াকিদ (রা) বলেন, তাঁর দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অন্যজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস শেষ করে (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে) বললেন: আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু? তাদের একজন আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল, তাই আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। অন্যজন (ভীড় ঠেলে অগ্রসর হতে অথবা ফিরে যেতে) লজ্জাবোধ করেছেন, আল্লাহও (তাকে আজাব দিতে)

CamScanner

লজ্জাবোধ করবেন, আর অপরজন (মজলিসে হাজির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠক, লক্ষ্য করুন! মজলিস ছিল হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) মজলিসে। অথচ আল্লাহর রাসুল (ﷺ) দাবী করছেন ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়েছেন, তাই আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

হাদিস নং -৩

روى مسلم (١٢١٨) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

সহিহ মুসলিম হাদিস নং- ১২১৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমি শুনতে পেলাম নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া নামাজের অর্ধেক (অর্ধেক কবুল হয় বা অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়) অতঃপর আমি নবীজির কাছে আসলাম এবং তাঁকে বসে নামাজ পড়া অবস্থায় পেলাম এবং আমি আমার হাত তাঁর মাথা মোবারকে রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী চাও হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর? আমি বললাম, আমাকে বলা হয়েছে আপনি বলেছেন, কোন ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া নামাজের অর্ধেক, কিন্তু ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি বসে নামাজ পড়ছেন? হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ ঠিক, তবে আমি তোমাদের কারো মত নই।

CamScanner

প্রিয় দ্বীনি ঈমানী মুসলমান ভাই ও বোনেরা! আসলে আমরা মনে করি যে আমরা প্রিয় নবীজির (ﷺ) শান ও মান বুঝি। কিন্তু কুরআন সুন্নাহর গবেষণা গভীরভাবে করতে থাকলে (ভাসা ভাসা অনুবাদ পড়া নয়, বরং অন্তর দিয়ে অনুভব করা) প্রতিনিয়ত আপনার সামনে এমন কিছু বিষয় ওঠে আসবে যে, আপনি আল্লাহর রাসুলের (ﷺ) ক্ষমতা ও মান মর্যাদাকে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাকের ইলাহিয়াতে কেউ শরিক নেই, উনার সমকক্ষ কেউ হতেই পারে না। কিন্তু আল্লাহর ইলাহিয়াতের মাকামের পর

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার জন্য আপনার জিকিরকে (সম্মান) সুউচ্চ করেছি। (আল কুরআন: ৯৪ : ৪) প্রিয় নবীজির (ﷺ) রিসালাতের মাকাম!

আল্লাহর প্রিয় হাবিবের (ﷺ) শান-মান ও ক্ষমতা কত তা এক অপার রহস্য। আল্লাহর প্রিয় হাবিব (ﷺ) র শান-মান ও ক্ষমতা কত তা নিরুপন করা আমরা উম্মতের জন্য অসাধ্য ও দুঃসাধ্য। আর সেই শানেই যখন কেউ বেয়াদবি করে, আর কেউ যখন উনাকে খাটো করে দেখতে ও দেখাতে সচেষ্ট হয়, তখন তা আল্লাহ পাক বরদাশত করেন না। আল্লাহর গুনাহগার বান্দা হিসেবে আমাদেরও বরদাশত করতে কষ্ট হয়। মুখ খোলতে বাধ্য হই তখন। কথা বলতে ও প্রতিবাদ করতে বাধ্য হই। দোষ যদি বলেন, দোষই গণ। আর এই দেহে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন আমার প্রাণপ্রিয় আল্লাহর হাবিবের (ﷺ) শান ও মানে আঘাত আসলে কথা বলে যাবই ইন শা আল্লাহ। এর জন্য যদি কেউ আমার শত্রু হন হবেন, বন্ধু হন হবেন। সকল নিন্দা ও যাতনা মুখ বুজে সহ্য করব। এই কলম ও এই জবান বন্ধ হবে না ইন শা আল্লাহ!

CamScanner

প্রিয় নবীজি (ﷺ) দেখতে কেমন ছিলেন?

একদম সংক্ষেপে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সৌন্দর্য সবচাইতে সুন্দর বর্ণনা করেছেন প্রিয় নবীজিরই কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রা.-

وأجمل منك لم تر قطُ عينٌ- وأكمل منك لم تلد النساء

خُلقتَ مبرءاً من كل عيبٍ كأنك قد خُلقتَ كما تشاء

"আপনার চেয়ে সুন্দর, কোন নয়ন দেখেনি কভু,

আপনার চেয়ে পরিপূর্ণ কাউকে, কোন নারী করেনি গর্ভে ধারণ,

আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত করে,

যেন মনে হয় আপনাকে গড়া হয়েছে আপনার যেমন ইচ্ছে তেমন করে!"

সায়্যিদুনা হিন্দ ইবনু আবি হালা রা., ইমাম আলী রা., উম্মু মা'বাদ রা. সহ আরো বহু সাহাবাগণ হুজুর নবী করীমের (ﷺ) বর্ণনা দিয়েছেন তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। তারা বলেন, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একেবারে বেশি লম্বা ছিলেন না, আবার বেটেও ছিলেন না। বরং মাঝারি উচ্চতার ছিলেন। শরীর মোবারকের গড়নও ছিল মাঝারি (মোটা ছিলেন না, আবার একেবারে হালকাও ছিলেন না)!

পবিত্র মুখ মোবারক ছিল আলোকোজ্জল। একেবারে তীক্ষ্ণ নয়, অনেক তাবিয়িন সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করেছেন যে

هل كان وجه رسول الله صلى الله علية وسلم كالسيف؟

প্রিয় নবীজির (ﷺ) মুখমন্ডল কী তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ ছিল?

বরং সাহাবায়ে কিরাম রা. জবাব দিয়েছেন,

CamScanner

لا، بل كان وجهه كالقمر

না, বরং উনার মুখমন্ডল মোবারক ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মত।

عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة اضحيان و عليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه و الي القمر فلهو عندي احسن من القمر

এই প্রসংগে হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রা. বলেন, পূর্নিমার রাতে আমি হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখলাম আর উনার গায়ে ছিল লাল বর্ণের হুল্লাহ, তখন আমি একবার চাঁদের দিকে তাকাতে লাগলাম একবার হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখতে লাগলাম। তিনি নিশ্চয়ই আমার নিকটে চাঁদের চেয়েও সুন্দর ছিলেন।

হুজুর পাকের (ﷺ) চোখ মোবারক ছিল টানাটানা। চোখ মোবারকের কালো অংশ ছিল খুবই কালো আর সাদা অংশ ছিল একদম উজ্জ্বল সাদা। ভ্রু মোবারক ছিল ঘণ কালো, খুবই সুন্দর, প্রাকৃতিকভাবেই সুরমা দেয়া মনে হত। ভ্রু মোবারকদ্বয়ের মাঝখানে অনেকেই বলেন ফাঁকা ছিলনা, আবার অনেকেই বলেন ফাঁকা ছিল। এখানে মতপার্থক্যের কারণ হলো অনেকেই বলেছেন দুই ভ্রু মোবারকের মাঝখানে নুর ছিল। যখন খুব বেশি রাগান্বিত হতেন তখন ভ্রু মোবারকদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে এক ফোটা ঘাম মোবারক গড়িয়ে পড়ত।

চোখের পাতি মোবারক ঘন ও লম্বা ছিল। গাল মোবারকের রঙ একদম লাল ও নয় আবার একদম তামাটেও নয়, বরং এর মাঝামাঝি ছিল।

দাঁড়ি মোবারক ছিল ঘন ও কুচকুচে কালো। বলা হয় চুল মুবারক কানের লতি পাড় হয়নি, আবার এমনও বলা হয়েছে যে চুল মুবারক কাধ পর্যন্ত আসতো পরে কেটে নিতেন। হজ্জ বা ওমরার সময় পুরো মাথা মোবারক কামিয়ে ফেলতেন। ৬৩ বছর বয়সে যখন জাহেরি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান তখন ২০ খানার বেশি চুল ও দাড়ি মোবারক

পাকেনি। বলা হয় ২৭ খানা, আবার আরেক রিওয়ায়াতে এসেছে ১৪ খানা অথবা ১২ খানা, যার বেশিরভাগণ ছিল দুই জুলফি মোবারকে এবং থুতনি মোবারকের উপরের চুলে।

দাঁত মোবারক ছিল ধবধবে সাদা, সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন যেন মুক্তার মত উজ্জ্বল ছিল প্রিয় নবীজির (ﷺ) দাঁত মোবারক। সামনের উপরের পাটির মাঝখানের দুইখানা দাঁত মোবারকের মাঝে ফাঁকা ছিল সামান্য। যখন হাসি দিতেন মনে হত যেন চেহারা মোবারক আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। যখন কথা বলতেন মুখ মুবারক প্রশস্ত হয়ে যেত। মনে হত যেন মুখ মোবারক থেকে মুক্তা ঝড়ছে। স্পষ্ট করে কথা বলতেন, এক কথা কয়েকবার বলতেন যদি তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হত। পেশিবহুল দুইকাধ মুবারক ছিল প্রশস্ত। উজ্জ্বল বর্ণের, যেই কারণে বলা হয়েছে বেদুইন একজন যখন মাল চেয়ে পেছন থেকে উনার চাদর মোবারক ধরে টান দিল তখন লাল দাগ হয়ে গিয়েছিল কাধের ওপর। পিঠ মোবারকের মাঝখানে খতমে নবুয়াতের সিল ছিল যার উপরে কিছু লোম ছিল।

খুব দ্রুত হাটতেন। যখন মানুষের মাঝে হাটতেন মনে হত যেন উপর থেকে নিচে নেমে আসছেন। কোন ধরনের কোন টালমাটাল অবস্থা কখনো হতনা। হাটা দেখে মনে হত যেন সেনা নায়ক যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

যখন কারো দিকে অগ্রসর হতেন আর যদি সে আসল পরিচয় না জানত ও মানত তবে তার মনে ভয়ের উদ্রেক হত। আর যে উনাকে জানত ও মানত তার মনে ভালোবাসার উদ্রেক হত। যখন কারো দিকে ফিরতেন কোন কথা শুনার জন্য তখন পুরো শরীর মোবারক তার দিকে ঘুরিয়ে নিতেন, যেন সে বুঝতে পারে যে তার কথার গুরুত্ব তিনি দিয়েছেন। যখন কথা শুনতেন তখন একদম নিরব হয়ে তার কথা শুনতেন মাঝখানে কথা কাটতেন না কারো। সাহাবাগণ যখন উনার কথা শুনতেন তখন তাদের ঘাড় মোবারক এত নত

CamScanner

থাকত যেন তাদের ঘাড়ের উপরে পাখি বসে আছে, ঘাড় তুললেই উড়ে যাবে।

দুই কাধ মোবারকে কিছু লোম ছিল। বুকে বেশি লোম ছিল না, বরং একখানা লোমের রেখা ছিল বুক মুবারক বরাবর।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে সপ্নযোগে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) র দিদার নসীব করেন। আমিন।

উৎস্য: শায়খ হাবিব আলী জিফরি (মা জি আ) শামায়েলে তিরমিজি, শামায়েলে বাগবি, শামায়েলে মুনাওয়ি, শামায়েলে ইমাম নাবহানি রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।

মানুষকে ধোকা দেয়ার সর্ববৃহৎ অস্ত্র এখন একটিমাত্র বাক্য- "আমার পরিচয় আমি শুধু মুসলিম"

নিরপেক্ষতার আবরণে থেকেই আমাদেরকে এখন সবচাইতে বড় ধোকাটা দিচ্ছে তারা। এটা সবচাইতে মারাত্মক অস্ত্র এখন। বাহ্যিক ইসলামের লেবাস। আমার পরিচয় আমি শুধু মুসলিম। আমি শুধুমাত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের অনুসারী। আমি কোন দল মত মানি না। এই লেবেল একবার গায়ে লাগাতে পারলে এবং ভালভাবে তা মার্কেটিং করতে পারলে, আপনি পরবর্তীতে যা বলবেন তাই মেনে নিবে বেশিরভাগ মানুষ। আর কাজটা এভাবেই হচ্ছে। মিশন তারা এভাবেই ফুলফিল করছে।

কিন্তু এই বাহ্যিক চোখে দেখা আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর ও সুমহান লেবাসের নিচেই লুকিয়ে থাকে সালাফি, আহলে হাদিস এবং লা-মাযহাবি নামক দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা মতবাদ। দয়া করে কুরআন মাজিদের প্রথম সূরা সূরা ফাতিহার ৬ ও ৭ নং আয়াতের তাফসির একটু পড়ুন। যেই আয়াতগুলো প্রতিদিন অসংখ্যবার নামাজে আমরা পড়ছি। জিজ্ঞেস করুন তাফসিরে ইবনে কাসিরসহ বিখ্যাত তাফসির

গ্রন্থগুলোকে এই সিরাতুল মুস্তাকিম কী? কাদের পথ এই সিরাতুল মুস্তাকিম? এবং তাঁরা কারা যাদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং যাদের সেই সরল সোজা পথকে আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

"اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

সে সমস্ত লোকের পথ, যাদের ওপর তুমি নেয়ামত বর্ষণ করেছ। (সূরা ফাতিহা, ১:৬-৭)

কুরআন মাজিদেরই অন্য আয়াতে, ৪নং সূরা, সূরা নিসার ৬৯ নং আয়াত আমাদেরকে বলছে, তাঁরা কারা যাদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং যাদের দেখানো সেই সহজ সরল পথকে আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

"আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে তাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক (তাফসিরে এসেছে সিদ্দিক বলতে সাহাবাগণ), শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৪:৬৯)

প্রিয় নবীকে (ﷺ) অনুসরণ নিয়ে কারো কোন সমস্যা নেই, নেই দ্বিধা-দ্বন্দ। কিন্তু সিদ্দিকিন বা সাহাবাগণের ওপরও আজ এই তথাকথিত শুধু কুরআন ও সহিহ হাদিস মানা লোকগুলো বিদয়াতের অপবাদ দিতে দ্বিধা করে না (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের রা. ওপর তারা ভীষণ ক্ষ্যাপা। হুজুর নবীজি

(ﷺ) তারাবিহ পড়েছেন ৮-১০ রাকায়াত, আপনি ২০ রাকাআত শুরু করলেন কেন? হে হযরত ওমরপুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.! নবীজি (ﷺ) বলেছেন দাঁড়ি ছেড়ে দিতে (তাদের মতে), যতদূর লম্বা হয় হউক, কিন্তু আপনি দাঁড়ি একমুষ্টি রেখে বাকিটা কেটে ফেলতেন কেন?

মদিনা শরিফ থেকে মক্কা শরিফ যাওয়ার পথে প্রিয় নবীজি (ﷺ) যত জায়গায় নামাজ পড়তেন, আপনিও সেই জায়গাগুলো খুঁজে খুঁজে বরকত হাসিলের জন্য নামাজ পড়েন কেন? এমনকি তাদের গুরু ইবনে তাইমিয়া সাহেব আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.র ওপর বিদয়াতের অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে যেভাবে তাজিম করতেন, শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন, আমি শতভাগ নিশ্চিত, এই লোকগুলো সে অবস্থা দেখলে সাহাবায়ে কেরামের ওপর বিদয়াত ও শিরকের অপবাদ দিত।

সাহাবায়ে কেরাম নবীজির (ﷺ) ওজু করার পর বরকত লাভের জন্য সেই অবশিষ্ট পানি পান করতেন। সেই পানির জন্য মনে হত সাহাবাগণের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পানি না পেলে সাহাবাগণ অপর সাহাবী ভাই যিনি পেয়েছেন, তাঁর সাথে মুসাফাহা করে মুখে ও শরীরে মাখিয়ে নিতেন। প্রিয় নবীজির (ﷺ) থুথু মুবারক মাটিতে পড়তে দিতেন না, কোন না কোন সাহাবী তা নিয়ে মুখে ও গায়ে মাখতেন। যখন কাউকে কোন কাজের আদেশ দিতেন তখন কে কত তাড়াতাড়ি তা পালন করবেন তা নিয়ে প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যেত সাহাবাগণের মাঝে। সাহাবাগণ প্রিয় নবীজির (ﷺ) সামনে এমনভাবে মাথা নত করে বসে থাকতেন যে, মনে হত যেন তাদের ঘাড়ের ওপর পাখি বসে আছে এবং তাইতো ওরওয়া ইবনে মাসউদ রা. ইসলাম গ্রহণের আগে যখন মক্কার কাফির কুরায়িশ নেতৃবৃন্দ

তাকে দূতরুপী গুপ্তচর হিসেবে হুদাইবীয়ার ময়দানে প্রেরণ করল অবস্থা দেখে আসার জন্য এবং তিনি যখন এই দৃশ্য দেখে আসলেন, ফিরে এসে মক্কার নেতৃবৃন্দকে বললেন, কসম খোদার আমি রোমের বাদশাহ সিজারের দরবারে গিয়েছি, পারস্যের বাদশাহ খসরুর দরবারে গিয়েছি, মিশরের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের দরবারে গিয়েছি কিন্তু -

"ওয়া লাম ইউয়াজ্জিম আহাদুন আহাদা,

কামা ইউয়াজ্জিমু আসহাবু মুহাম্মাদিন মুহাম্মাদা"।

"কেউ কাউকে করেনি কভূ এমন সম্মান,

মুহাম্মাদের সাথীরা মুহাম্মাদকে (ﷺ) করে যেই সম্মান।"

হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আমি মুহাম্মাদের এমন অনুগত একদল সাথী দেখে এসেছি তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করার কথা চিন্তাও কর না। (বুখারি, শর্তাবলির অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ জিহাদের শর্তাবলী, হাদিস নং-২৬০৮)

ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً

কাউকে ভালোবাসতে দেখিনি কভূ এমন, মুহাম্মাদের সাহাবীরা মুহাম্মাদকে (ﷺ) ভালবেসেছে যেমন।

আবু সুফিয়ান রা. ইসলাম গ্রহণের আগে সাহাবাগণের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের বাহার দেখে এই মন্তব্য করেছিলেন।

ওমরা ও হজ্জের সময়ে নবীজির (ﷺ) চুল মোবারক কামানোর পর তা নিজে সাহাবাগণের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন, সাহাবাগণ তা পরম যত্নে নিজেদের কাছে বরকত স্বরুপ রেখে দিতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১৬৯, মুসলিম ১৩০৫, তিরমিজি, ৯১২) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের রা. মত কেউ কেউ যুদ্ধের শিরস্ত্রাণের সাথে

CamScanner

বেঁধে রাখতেন, নিজের হেফাজত হবে বিশ্বাস করে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে শিরস্ত্রাণ মাটিতে পড়ে গেলে তিনি যুদ্ধ রেখে শিরস্ত্রান খুজতে লেগে গেলেন। পরে বললেন, এই শিরস্ত্রাণের মাঝে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) চুল মুবারাক বাধা আছে যেজন্য আমি বিজয় লাভ করি। (তাবরানি ফিল কাবির, হাদিস নং ৩৮০৪, হাকিম হাদিস নং ৫২৯৯, মুসনাদ আবি ইয়ালা, হাদিস নং-৭১৮৩) আনাস বিন মালিক রা. ওসিয়ত করে গেছেন সেই মুবারক চুল উনার সাথে কবরে দিয়ে দিতে, শাফায়াতের আশায়। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. প্রিয় নবীজির (ﷺ) শিংগার রক্ত মোবারক গিলে ফেলেছেন, যার জন্য দোজখ হারামের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! এসবই হুজুর নবী কারিম (ﷺ) র সামনে হয়েছে, কাউকে বাধা দেন নাই। বরং উৎসাহিত করেছেন। উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা উম্মে সালামাহ রা.র কাছে প্রিয় নবীজির (ﷺ) চুল মোবারক সংরক্ষিত ছিল, যা পানিতে ভিজিয়ে রোগীকে পান করালে রোগী ভাল হয়ে যেত। (বুখারি, হাদিস নং-৫৫৮১) উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা রা. র কাছে প্রিয় নবীজির (ﷺ) জুব্বা মুবারক ছিল, যা ভিজিয়ে পানি পান করালে রোগী ভাল হয়ে যেত। লোকজন (সাহাবা ও তাবিইন) অসুখে ও বিপদে আপদে দূর দূরান্ত থেকে সেই বরকত হাসিলের জন্য আসতেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৫২৪৮)।

হযরত ওমরের রা. জমানায় অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের সময় সাহাবী বিলাল বিন হারিস আল মুজনি রা. প্রিয় নবীজির (ﷺ) রওজা মুবারকে গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া চেয়ে ইস্তেগাসা বা সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। (১. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, ৬/৩৫৬, হাদিস নং-৩২০০২, ২. ইমাম বুখারী সংক্ষেপে তার তারিখুল কাবিরে এনেছেন, ৭/৩০৪, ৩. ইমাম বাইহাকি, দালায়েলুন নুবুয়্যাহ, ৭/৪৭) অন্ধ সাহাবী আল্লাহর কাছে প্রিয় নবীজির (ﷺ) উসিলায় দোয়া করেছেন আরোগ্যের জন্য,

CamScanner

পরে আবার প্রিয় নবীজির (ﷺ) কাছে ইস্তেগাসা বা সাহায্য প্রার্থনা করেছেন অন্ধত্ব দূর হওয়ার জন্য।

(১. তিরমিজি, হাদিস নং, ৩৫৭৮, ২. ইবনু মাজাহ, হাদিস নং-১৩৮৫. ৩. মুসনাদ আহমদ ৪/১৩৮) কিন্তু আমি নিশ্চিত, শিরক বিদয়াতের জপ করা এই লোকগুলো সেই সাহাবায়ে কেরামের জমানায় হলে শিরক ও বিদআতের ফতোয়া দিত আল্লাহর নবীর (ﷺ) সাহাবাগণের ওপরেই (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

তাদের অভিযোগ! তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান ইবনে আফফান রা.! প্রিয় নবীজি (ﷺ) দেয়াতেন জুমুয়ার দিনে দুই আজান (এক আজান ও এক ইকামাত) আপনি তিন আজান (দুই আজান ও এক ইকামাত) চালু করলেন কেন? নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। সুন্নাত কী ও বিদয়াত কী তারা এখন সাহাবা থেকেও বেশি বুঝেন।

সালিহিন বা সৎকর্মশীল অর্থাৎ আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণ যেভাবে কুরআন সুন্নাহ বুঝেছেন এবং যেই ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন আমাদেরকেও কুরআন মাজিদ সেই পথেই চলতে বলছে। আর তারা সালিহিন বা সৎকর্মশীল অর্থাৎ আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের পথ মত অনুযায়ী কুরআন সুন্নাহের ব্যাখ্যা মানবে দূরে থাক, তারা বলে, সালিহিন বা সৎকর্মশীল (যাদের দরজা মুমিন মুসলমান থেকে উর্ধ্বে) অর্থাৎ আল্লাহর মাহবুব বান্দা কারা তা আমরা জানিই না, জানতে পারবও না।

প্রিয় নবীজির (ﷺ) প্রিয় উম্মত! সাবধান, আর বেশি কিছু বলার নাই, সংক্ষেপে এতটুকুই বলতে চাই। নিরপেক্ষতার আবরণে থাকা সহিহ সহিহ জিকির করা এই গুপ্তঘাতকদের থেকে সাবধান। এদের মাঝে কারো প্রতি আদব, তাজিম বলতে কিছুই নাই। যেমনটা ছিল না তাদের প্রথম ব্যক্তি জুল খুয়াসরা আত তামিমির মাঝে, বাহ্যিক সুন্নাতে পাবন্ধ সেই ব্যক্তি যে কী না নবীজিকে (ﷺ) ন্যায়বিচার করার উপদেশ দিয়েছিল (নাউজুবিল্লাহ)। এটাই খারেজি সম্প্রদায়ের মূল

চিহ্ন। খারেজিরা গুস্তাখে রাসুল ছিল এবং গুস্তাখে সাহাবা (মাওলা আলীর রা. বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী এবং সাহাবাগণকে কাফির বলা সেই গুষ্টি) ছিল। যুগের নেককার পরহেজগারদের বিরুদ্ধেই তারা অস্ত্র ধরেছিল।

ইসলামের প্রথম দল তারাই বানিয়েছিল, আজ একতার কথা জপও তারাই বেশি করে।

আল্লাহ পাক এই ফিতনা থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন। আমিন।

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে কীভাবে দেখা যায়? হযরত বায়েজিদ বুস্তামির রাহ. আম্মাজানের চমৎকার কিছু উপদেশ

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي

"যে স্বপ্নে আমাকে দেখল সে আমাকেই দেখল, কারণ শয়তান আমার রুপ ধারণ করতে পারে না"। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২২৬৬, তিরমিজি, হাদিস নং-২২৮০, সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৩৯০১)

من راني فقد راي الحق

"যে আমাকে দেখল সে "সত্য" দেখল"।

(সহিহ বুখারি, জ্ঞান অধ্যায়, হাদিস নং-১১০, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২২৬৭, সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৩৯০০)

من راني في المنام فسيراني في اليقظة

"যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখবে"। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২২৬৬)

CamScanner

لا تمس النار مسلما من رآني أو رأي من رآني

"যে মুসলিম আমাকে দেখল তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, আমাকে যে দেখল, তাকে যে দেখল তাকেও না। (তিরমিজি, হাদিস নং-৩৮৫৮)

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন, "আমার জন্য শক্ত ভালোবাসায় সিক্ত একদল উম্মত হবে যারা তাদের মাল ও পরিবারের বিনিময়েও আমাকে দেখতে চাইবে"। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৮৩২, হাকিম, হাদিস নং-৬৯৯১)

তাই মুহাক্কিক উলামাগণ এ সম্পর্কে বলেন, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখতে পারাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যেকোন উম্মতের জন্য এটা অনেক বড় একটি বিষয়। এটা প্রমাণ করে যে আপনার ঈমান সঠিক তরিকার ওপরে আছে। আপনি আল্লাহর মাকবুল বান্দা। অথবা আপনাকে আল্লাহর কাছে মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্যই হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আপনার স্বপ্নে এসেছেন। আপনি যদি হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে হাসি খুশি অবস্থায় দেখেন, তবে তা আপনার জন্য সুসংবাদ। আপনি ঈমানের ওপর আছেন, আপনার আমল-আখলাক ঠিক আছে। আর যদি মলিন চেহারায় দেখেন অথবা রাগান্বিত অবস্থায় দেখেন তবে ধরে নিবেন যে, আপনার ঈমান আমল আখলাক সঠিক রাস্তায় নেই। আপনি নিজেকে ইসলাহ করে নিন। তওবা করে সঠিক রাস্তায় আসুন।

হযরত বায়েজিদ বুস্তামি রাহ. যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তিনি তাঁর আম্মাজানকে বললেন, আম্মাজান আমি মনে হয় বড় হয়ে গেছি। তাঁর আম্মাজান বুঝতে পারলেন যে, বায়েজিদ তাকে বিয়ে করানোর জন্য ইশারা দিচ্ছেন। তিনি বললেন, বাবা তুমি বড় হয়ত হয়েছ, কিন্তু এখনো পরিপূর্ণ মানুষ তুমি হওনি। অর্থাৎ ইনসানে কামিল তুমি হওনি। রাস্তা বহু দূর বাবা।

CamScanner

হযরত বায়েজিদ বুস্তামি রাহ. জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান আমি কীভাবে ইনসানে কামিল হতে পারি?

আম্মাজান জবাব দিলেন, যেদিন তুমি হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখবে সেদিন।

বায়েজিদ বুস্তামি রাহ. জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান কী করলে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পারি?

আম্মাজান জবাব দিলেন, চারটি কাজ করলে তুমি হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখার আশা করতে পার।

১. বেশি বেশি করে নবীজির (ﷺ) ওপরে দরুদ পড়বে। এটা তোমাকে নবীজির (ﷺ) নিকটে নিয়ে যাবে দুনিয়া ও আখিরাতে।

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا؛ رواه مسلم.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে আমার ওপরে একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার ওপর দশবার দরুদ পড়বেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৪০৮)

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيامَةِ أَكْثَرُهُم عَلَيَّ صَلَاةً

"সে আমার সবচাইতে নিকটে থাকবে কাল কেয়ামতের দিনে, তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশি দরুদ পড়ে আমার ওপর"। (তিরমিজি-হাদিস নং-৪৮৪)

إِنَّ مِن أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عليَّ مِنَ الصلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ

"তোমাদের জন্য সবচাইতে উত্তম দিন হলো শুক্রবার, তাই এই দিনে তোমরা আমার ওপরে বেশি বেশি করে দরুদ পড়। তোমাদের

দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়"। (সুনান আবি দাউদ, হাদিস নং- ১৫৩১)

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام

"কেহ যখন আমার ওপর সালাম দেয়, আল্লাহ পাক আমাকে রুহ ফিরিয়ে দেন (ক্ষমতা দেন) আমি তার সালামের জবাব দিই"। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২০৪১)

দরুদের ফজিলত সংক্রান্ত হাদিস অসংখ্য অগণিত। নবীজি (ﷺ) বলেছেন, "যে আমার ওপরে একবার দরুদ পড়ে, আল্লাহ তাকে দশটি সওয়াব দেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার মর্যাদা দশগুন বাড়িয়ে দেন"।

কাজেই নবী কারিমের (ﷺ) সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বেশি বেশি করে দরুদ পড়া। দরুদে সওয়াব পাওয়া যায়, গুনাহ মাফ হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সালামের জবাব আসে। আর আশিকের জন্য এর চাইতে বড় আর কী হতে পারে? আশিক সবসময় তার মাশুকের দরবার থেকে জওয়াব প্রত্যাশী। তাই আমাদেরকে বেশি বেশি পরিমাণে দরুদ ও সালাতু সালাম পাঠ করতে হবে। এক বুজুর্গকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বেশি বেশি দরুদ পড়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ কী? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কমপক্ষে দিনে ৩০০ বার।

সহিহ হাদিসে এসেছে,

إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام

অর্থাৎ কিছু ফেরেশতা আছেন নিয়োজিত যারা সারাদিন শুধু সালাম ও দরুদ যারা পাঠ করছেন তাদের নাম পরিচয়সহ প্রিয় নবীজির (ﷺ) কাছে পেশ করেন যে, অমুকের ছেলে অমুক আপনার ওপরে দরুদ পড়েছে, সালাম দিয়েছে। এভাবে আমাদের নাম-পরিচয় দিনে যতবার প্রিয় নবীজির (ﷺ) কাছে পেশ করা হয় তত তিনি

CamScanner

আমাদেরকে বেশি করে চিনেন এবং কাছে টেনে নেন। (তথ্যসূত্রঃ সুনান নাসাই, হাদিস নং-১২৮২, আবু দাউদ, হাদিস নং-২০৪২)

২. প্রিয় নবীজির (ﷺ) সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা। এটাই ভালোবাসা। অনেকেই বাহ্যিক সুন্নাতের অনুসরণ করাকে নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা বানিয়ে দিতে চান। না, ভালোবাসা এটা নয়, বরং ভালোবাসা হচ্ছে কারো প্রতি অন্তর ঝুঁকে যাওয়ার নাম। আর অনুসরণ হচ্ছে ভালোবাসার শাখা প্রশাখা। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। ভালোবাসা কী জিনিস তা আমরা একখানা হাদিস থেকেই বুঝতে পারি, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমার জন্য শক্ত ভালোবাসায় সিক্ত একদল উম্মত হবে যারা তাদের মাল ও পরিবারের বিনিময়েও আমাকে দেখতে চাইবে"। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম, অধ্যায় নং ৫৩, বেহেশত ও তার অধিবাসী এবং বেহেশতের নিয়ামতের বর্ণনা, হাদিস নং - ৬৯৩৯)

নিজের সকল কিছুর বিনিময়ে মাহবুবকে পেতে চেষ্টা করা, অন্তরের টান পয়দা করা, অন্তরে মাহবুবের স্মরণ থাকা। মাহবুবের নাম শুনলেই অন্তরের হাল পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। সবসময় মাহবুবকে পাওয়ার একটা আকাংখা অন্তরে থাকা, এর নাম মুহাব্বাত এর নাম ভালোবাসা।

৩. হুজুর নবীজির (ﷺ) বাহ্যিক সুন্নাহ অনুসরণ করা, নবীজির (ﷺ) আখলাক অনুসরণ করা, শরীয়তের তাবেদারি করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে

তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩:৩১)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (৩৩:২১)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক"। (সূরা হাশর, আয়াত নং -৭)

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন,

"যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে যায় সে আমাদের দলভূক্ত নয়"।

"তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আকড়ে ধরলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবেনা। আল্লাহর কিতাব কুরআন ও তার রাসুলের সুন্নাত"।

"তোমাদের জন্য আমার সুন্নাহ ও আমার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহ মানা আবশ্যক"।

কাজেই হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারব না। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সুন্নাহ, আমল ও আখলাক আমাদেরকে অনুসরণ করতেই হবে।

৪. সর্বেশেষ, Last but not least, প্রিয় নবীজির (ﷺ) উম্মতের তথা আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকা। সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা মায়া-দয়া এবং করুণা করা নবীজির (ﷺ) অন্যতম

প্রধান গুন ছিল। প্রিয় নবীজি (ﷺ) সেই উম্মতকে ভালোবাসেন, যে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায়। আল্লাহর সৃষ্টি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানব, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, তরুলতা গাছপালা সকল কিছুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে।

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলতেন, দুনিয়াতে যারা আছে তাদের ওপরে দয়া কর, আকাশের অধিপতি তোমাদের ওপর দয়া করবেন।

বনি ইসরাইলের এক পতিতা কীভাবে জান্নাতের গ্যারান্টি পেয়েছিল তা আমরা সবাই জানি কমবেশি। বুখারি শরিফের সহিহ হাদিস, একটা তৃষ্ণার্ত মৃত্য পথযাত্রী কুকুরকে জুতাতে ফিতা বেঁধে কূয়া থেকে পানি তুলে পান করানোর কারণে আল্লাহ পাক ঐ দুশ্চরিত্রা পতিতাকে কাল হাশরের দিনে ক্ষমা করে দেবেন। আর একটা বিড়ালকে বেঁধে রেখে পানি ও খাবার না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার কারণে আল্লাহপাক এক নেককার মানুষকে জাহান্নামে দেবেন।

কীটপতংগের বাসায় প্রস্রাব পায়খানা করতে শক্ত মানা আছে হাদিস শরিফে।

মানষের ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে সেবা করতে হবে, তাদের বিপদে আপদে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

"আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না"। (সূরা তওবা সূরা নং-৯: আয়াত নং-৬) সূরা তওবা সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত। এমনটা মনে করার কারণ নেই

CamScanner

যে, এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এই আয়াতের হুকুম কাল কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা মুমতাহিনা, সূরা নং ৬০ আয়াত নং-৮)

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নির্যাতনকারীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامً

"যে ব্যক্তি কোন মুয়াহিদ অর্থাৎ মুসলিম দেশে বৈধভাবে অবস্থান/বসবাসকারী অমুসলিমকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।" (বুখারী শরিফ,খ. ৪, পৃ.৯৯, হা.নং-৩১৬৬)

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি কোন মুয়াহিদ অর্থাৎ মুসলিম দেশে বৈধভাবে অবস্থান/বসবাসকারী অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।" (আবু দাউদ শরিফ, খ.৩, পৃ.৮৩, হা.নং-২৭২৬)

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"সাবধান! যদি কোন ব্যক্তি কোন মুয়াহিদ অর্থাৎ মুসলিম দেশে বৈধভাবে অবস্থান/বসবাসকারী অমুসলিমকে নির্যাতন করবে বা তার অধিকার খর্ব করবে বা সাধ্যের বাইরে তাকে কোন কিছু চাপিয়ে দিবে অথবা তার সম্মতি ছাড়া তার থেকে কোন কিছু (অন্যায়ভাবে) হস্তগত করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।" [আবু দাউদ শরিফ, খ.৩, পৃ. ১৭০, হা.নং- ৩০৫২)

কাজেই আমাদেরকে সকলের সাথেই ভাল ব্যবহার করতে হবে।

এই চারটি কাজ আমরা ভালভাবে ইখলাস একনিষ্ঠার সাথে করতে পারলে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) দিদার পাব বলে আশা রাখতে পারি।

হে উম্মত! আপনার প্রিয় নবীকে (ﷺ) জানুন

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, আমরা অঙ্গীকার করেছি। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৮১)

CamScanner

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকল নবীর নিকট হতে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে যদি তোমাদের কারো জমানাতে আমার শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) চলে আসেন তবে তোমরা তোমাদের দ্বীন রেখে আমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের আনুগত্য করবে। তাই তো হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সেই স্বত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, যদি মুসা আলাইহিস সালামও জীবিত থাকতেন তাকেও আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) র পবিত্র নাম "মুহাম্মাদ" মোট চারবার এসেছে কুরআন মাজিদে ও "আহমদ" এসেছে একবার এবং কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে নাম ধরে "ইয়া মুহাম্মদ বা ইয়া আহমদ" বলে ডাকেন নাই। বরং ইয়া আইয়্যুহান নাবি, ইয়া আইয়্যুহার রাসুল, ইয়া আইয়্যুহাল মুজ্জাম্মিল, ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাসসির বলে ডেকেছেন। ওহ আমার নবী, ওহ আমার রাসুল, ওহ আমার কম্বলাবৃত নবী, ওহ আমার চাদরাবৃত নবী বলে ডেকেছেন।

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমার পাঁচখানা নাম আছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহি যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর মিটিয়ে দিয়েছেন, আমি হাশির আমার পদতলে মানুষকে জমা করা হবে, আমি আকিব সর্বশেষ নবী আমার পর কেউ নেই"। (সহিহ মুসলিম-হাদিস নং-২৩৫৪)

সূরা তওবা ৯ নং সূরার ১২৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক নবীজিকে (ﷺ) রাউফুর রাহীম বলেছেন যা আল্লাহর ৯৯ খানা সিফাতি নামের দুই খানা নাম।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেন, "আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি আমার আগে। আমাকে রুব (ভয়) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে আমি এক মাসের রাস্তা হেটে গিয়ে কাজ করলে যা হত তা ঘরে বসে হয়ে যায়, আমার জন্য সারা

দুনিয়ার জমিনকে পাক ও সিজদার স্থান বানানো হয়েছে। আমার উম্মতের যে কারো নামাজের সময় হলেই নামাজ পড়ে নেয়া উচিত। আমার জন্য গনিমতের মালকে হালাল করা হয়েছে যা এর আগে আর কারো জন্য করা হয়নি। আমাকে শাফায়াত দান করা হয়েছে। আগের যুগের নবীগণ তাদের নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত হতেন আমি সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য আমভাবে প্রেরিত হয়েছি"। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৩৩৫)

হযরত মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম) বলেন, আমি একবার হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সাথে মক্কা শরিফে পথ চলছিলাম। আমরা মক্কা শরিফের এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং যেই পাহাড় ও বৃক্ষই হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সামনে আসতো সেই বলত, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"। (সুনান তিরমিজি: হাদিস নং-৩৬২৬)

এক বর্ণনায় এসেছে যে, যেদিন হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) পবিত্র আগমন হলো এ ধরাধামে সেদিন অথবা অপর বর্ণনায় এসেছে, যেদিন তাঁর পবিত্র নুর মুবারক তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহর পৃষ্ঠ থেকে মা আমিনার রেহেমে স্থানান্তর হলো সেদিন মা আমিনা দেখলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটি আলো বের হয়েছে যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকেও আলোকিত করে দিয়েছে।

প্রিয় নবীর (ﷺ) নুর মুবারক এতই উজ্জল ছিল যে তা মা আমিনার জন্য রাতের অন্ধকারে মক্কায় বসেও দুই দেশ দূরবর্তী সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে দিয়েছে। এখন চিন্তা করুন, খোদ নুরনবী হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) দৃষ্টিশক্তি কতবেশি সনদূরপ্রসারী ছিল।

চিন্তা করুন, যদি আপনি হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আপনার অন্তরে ধারন করতে পারেন তবে কি হতে পারে! তিনি আপনার হৃদয়কে

CamScanner

আলোকোজ্জল করে দেবেন এবং আপনার জীবন থেকে সকল অন্ধকার দুর হয়ে যাবে।

(তথ্যসূত্রঃ মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং- ১৬৭০০, সিরাতু ইবনে ইসহাক ১/১৬৬, সিরাতু ইবনে হিশাম, মুস্তাদরাকুল হাকিম ২/৬০০, তাফসিরে তাবারী ১/৫৬৬, আলবানী সিলসিলাতু আহাদিসে সাহিহা, হাদিস নং ১৫৪৫, সহিহুল জামি-হাদিস নং- ২২৪)

এই দুনিয়াতে এসে প্রথম যেই কাজটি আপনার আমার প্রিয় নবী (ﷺ) করেছিলেন তা ছিল সিজদা"। এর মাধ্যমে একটা ম্যাসেজই যেন তিনি দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে দিতে চেয়েছিলেন "হে আমার উম্মত! আমি আল্লাহর ইবাদাতকে পরিপূর্ন করতে দুনিয়াতে এসেছি! নামাজকে পরিপূর্ন করতে দুনিয়াতে এসেছি।

শেষ যে কথাটি তিনি বলেছিলেন জাহেরি দুনিয়া থেকে পর্দা করার আগে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার দিন উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) র কোলে মাথা রেখে তাও ছিল আস সালাতু! আস সালাহ! ওয়া মা মালাকাত আঈমানুকুম!"

"হে আমার উম্মত! নামাজ! নামাজ! (নামাজ সম্পর্কে তোমরা সচেতন হও) আর তোমাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে সাবধান! (কারো উপর জুলম করো না)চ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) র ইমামতিতে উনার সাহাবাগণ যেরকম সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে জামাআতবদ্ধ অবস্থায় নামাজ পড়ছিলেন তা হুজরা থেকে জানালার পর্দা সড়িয়ে দেখে প্রিয় নবীজি (ﷺ) মুচকি মুচকি হাসছিলেন খুশিতে!

CamScanner

পবিত্র শরীরে পবিত্র স্থানে সকল সময় দরুদে মশগুল থাকা যায়

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন,

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُم عَلَيَّ صَلَاةً

"সে আমার সবচাইতে নিকটে থাকবে কাল কেয়ামতের দিনে, তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশি দরুদ পড়ে আমার ওপর"। (তিরমিজি-হাদিস নং-৪৮৪)

ইমাম আবুল হাসান আশ শাজুলি রাহ. হুজুর নবী করিম (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! কোন বান্দা একবার আপনার উপর দরুদ শরিফ পড়লে যে আল্লাহ পাক সেই বান্দার উপরে ১০ বার দরুদ পড়েন (যা সহিহ হাদিসে এসেছে), তা কি বান্দার উদাসীন মন নিয়ে পড়লে নাকি হুজুরে কুলবি অর্থাৎ সচেতনভাবে পড়লে?"

হুজুর নবী করিম (ﷺ) জবাব দিলেন, "কোন বান্দা যদি উদাসীন বা গাফিল হয়েও আমার উপরে দরুদ পড়ে তবে আল্লাহ তার উপর ১০ বার দরুদ পড়েন, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা চায়। আর যদি সে হুজুরে কুলবি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সচেতনতার সাথে (নিজের মনকে বিগলিত করে) আমার উপরে দরুদ পড়ে তবে এর সওয়াব কি পরিমাণ তা আল্লাহ পাক ছাড়া কেহই জানে না।

ফরজ ওয়াজিব সুন্নাহ মুয়াক্কাদা নামাজগুলো আদায় করার সময় ব্যাতীত বাকি পুরো সময় যখন খুশি যেখানে খুশি পবিত্র শরীরে পবিত্র স্থানে সকল সময় দরুদে মশগুল থাকা যায়।

হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)

كم اجعل لك من صلاتي

আমি আমার ইবাদাতের (ফরজ ইবাদাত আদায় করে বাকি সময়ের) কতটুকু আপনার উপর দরুদ পড়ব? প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যেরকম চাও। তিনি বললেন, তিন ভাগের একভাগ। প্রিয় নবী (ﷺ) বললেন,

وان زدت كان خيرا لك

যদি আরো বেশি করতে ভাল হত।

তিনি বললেন, অর্ধেক?

وان زدت كان خيرا لك

যদি আরো বেশি করতে ভাল হত।

তিনি বললেন,

يا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها

প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তাহলে তোমার দুঃখ দূর্দশা সব দূর হয়ে যাবে, তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তিরমিজি- ২৪৫৭, মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল ২০৭৩৬, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, ৮৭০৬, বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, ১৫৭৯)

তাই এখানে বাড়াবাড়ি কোথা থেকে আসে?

দরুদ শরিফ পাঠের মহান ফজিলত- ঘটনা-১

আমাদের বর্তমান সময়ে সকল কিছুতে বরকত কমে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে (যদিও বাহ্যিক নামাজীর সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু) হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) উপর দরুদ পড়ার পরিমাণ ব্যপকভাবে কমে গেছে। অথচ হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠই ছিল বরকত ও সম্পদ বৃদ্ধির কারণ। মরক্কোতে একবার খুব খড়া ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানকার এক গ্রামে এক কুয়ার পাশে এক মহিলা

পথচারী এসে বসলেন। খড়ার কারণে ঐ কুয়ার পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। ঐ মহিলা কুয়ার কাছে বসে আল্লাহর কাছে দোআ করতে শুরু করলেন। আল্লাহর অশেষ কুদরতে কুয়ার পানি উপচে পড়তে লাগল। এই ঘটনার কথা শুনে ইমাম জাযুলী রাহ. ছুটে আসলেন এবং এসে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা আপনি কি বলে আল্লাহর কাছে দোআ করেছেন যার কারণে শুষ্ক কুয়ার পানি উপচে পড়ছে?"

ঐ মহিলা জবাব দিলেন, কিছুই না বাবা। শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) উপরে দরুদ শরিফ পাঠ করে আমি আল্লাহর কাছে দোআ করেছি। সুবহানাল্লাহ! শুধুমাত্র দরুদ শরিফ পাঠ করার কারণে আল্লাহ পাক ঐ মহিলার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিলেন, ঐ মহিলার বৃষ্টির জন্য দোআ কবুল করলেন, এমনকি ঐ গ্রাম খড়া থেকেও বেঁচে গেল।

এই ঘটনাই ছিল ইমাম জাযুলির রাহ. দালায়েলুল খায়রাত কিতাব রচনার পেছনের মূল প্রেরণা। এই দালায়েলুল খায়রাত এমন কিতাব যা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই কিতাবে খুবই মনজুড়ানো মনোজ্ঞ ভাষায় হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) উপর দরুদ শরিফ পাঠ করার বিভিন্ন উপায় বলা আছে। আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে তাঁদের অন্তরকে আলোকিত করেছেন। সকল কঠিন কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। আর তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল পরকাল পাওয়া, বিশেষ করে আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সুহবত পাওয়া। যেমনটা অবস্থা ছিল হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের রা. যখন তিনি সিফফিনের যুদ্ধের আগে আগে বলছিলেন, اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه।

"আজ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) র প্রিয়জন ও দলের সাথে মিলিত হব। (সহিহ ইবনে হিব্বান এবং মুসতাদরাকুল হাকিম)

-শায়খ ড. আলী জুমআ - মিশরের সাবেক প্রধান মুফতি

CamScanner

দরুদ শরিফ পাঠের মহান ফজিলত- ঘটনা-২

মূল: শায়খুল ইসলাম আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদেরি (মা জি আ) র লেকচার

ইমাম আবু নুয়াইম রাহ: তাঁর দালায়েলুন নুবুয়্যাহ কিতাবে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদীস ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহ: থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহ: বর্ণনা বলেন, আমি একবার হজ্জে গেলাম। গিয়ে এক যুবককে দেখতে পেলাম সে অনবরত প্রিয় নবীজির (ﷺ) উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করছে। কোন জায়গাতেই সে অন্য কোন জিকির-আজকার পাঠ করছে না। আমি সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, হে বৎস্য! পুরো হজ্জে সকল জায়গায় অনবরত তুমি প্রিয় নবীজির (ﷺ) উপর দরুদ ও সালাম পড়ছ! তুমি অন্য কোন জিকির আজকারণ করছ না! এর পেছনে কি কোন দলিল আছে নাকি তুমি তোমার মনগড়া এই কাজ করছ?"

ঐ যুবক আমাকে জিজ্ঞেস করল, "হে শায়খ আপনি কে?" আমি জবাব দিলাম, সুফিয়ান সওরি। ঐ যুবক বলল, আপনি কি ইরাকের কুফার সেই বিখ্যাত ইমাম সুফিয়ান সওরি? ইমাম সুফিয়ান সওরি জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমি ইরাকের কুফার সুফিয়ান সওরি!

ঐ যুবক বললেন, হ্যাঁ! আপনাকে আমি এর কারণ বলতে পারি।

ঐ যুবক বললেন, আমি হজ্জে আসলাম আমার আম্মাসহ। আমরা মাত্রই হেরেম শরিফের ভেতরে পা রাখলাম আর আমার আম্মা অসুস্থ্য হয়ে গেলেন তাঁর চেহারা কুচকুতে কালো বর্ণের হয়ে গেল, চেহারা বিগড়ে গেছে। আমি বিমর্ষ হয়ে গেলাম। শোকাতুর হয়ে বসে গেলাম আমি আমার আম্মার পাশে। দুই হাত তুলে দোআ করতে লাগলাম আল্লাহর কাছে, يا رب هاكذا تفعل بمن دخل بيتك হে আমার প্রভূ! আপনার ঘরে যে আসে আপনি তার সাথে এরকম করেন? আমি এরকম শোকে মূহ্যমান অবস্থার মধ্যেই দেখলাম এক সনদর্শন চেহারার মহামানব হেরেম শরিফে প্রবেশ করলেন এবং আমার মায়ের চেহারায় হাত বুলিয়ে

দিলেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার মায়ের চেহারা আবারো দিনের আলোর ন্যায় উজ্জল হয়ে গেল, তিনি সুস্থ্য হয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে মহামানব! من انت الذي فرجت عني؟ আপনি কে যিনি আমার কষ্ট দূর করে দিয়েছেন?" আগন্তুক জবাব দিলেন, انا نبيك محمد! আমি তোমার নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমাকে নসিহত দিন। তিনি বললেন, لا ترفع قدما ولا تضع اخري الا انت تصلي علي محمد و علي ال محمد তুমি প্রতি কদমে কদমে এই দরুদ পড়বে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলী মুহাম্মাদ!"

ঐ যুবক বলল, হে ইমাম সুফিয়ান সওরি! এখন আপনিই বলুন হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) এই ফরমানের পর আমার দরুদ ও সালাম পাঠ ছাড়া আর কি আমল থাকতে পারে!

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আজওয়াজি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আসহাবি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম সালামান তাসলিমান কাসিরা।

মূলঃ শায়খুল ইসলাম আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদেরি (মা জি আ) র লেকচার

দরুদ শরিফ পাঠের ফজিলত-০৩

ইমাম আবু হাফস ওমর বিন আল হাসান সমরকন্দী রাহ. বর্ণনা করেন, আমার ওস্তাদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজ্জে গেলাম। হজ্জের কর্মকান্ডের সময় এক লোককে পেলাম যে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে দরুদ শরিফ ও সালাম পাঠ করছিল। না সে অন্য কোন তাসবিহ তাহলিল করছিল, না অন্য কোন জিকির আজকার করছিল,

না সে আল-কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করছিল, না সে ইস্তেগফার করছিল, না সে কোন দোআ করছিল। তাওয়াফ, সায়ী, আরাফাত, মিনা মুজদালিফার সব জায়গায় পুরো সময় সে মশগুল ছিল প্রিয় নবীজির (ﷺ) রুদ ও সালাম পাঠে। আমি তাকে এক পর্যায়ে পাকড়াও করলাম। বললাম, "হে বৎস্য! প্রত্যেকটি জায়গার আলাদা আলাদা দোআ ও জিকির আছে। তোমার সমস্যা কি? তুমি পুরো হজ্জে না অন্য কোন জিকির-আজকার করছ, না কোন তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করছ, না কোন আয়াত বা সূরা তিলাওয়াত করছ, না ইস্তেগফার করছ। দরুদ ও সালাম পাঠ ছাড়া তোমার কি অন্য কোন আমল জানা নেই?"

ঐ ব্যক্তি বললেন, ইয়া শায়খ! আমি খোরাসান থেকে আমার বাবাকে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম। কুফায় এসে আমার বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন এবং ইন্তিকাল করলেন। ইন্তিকালের পর আমি দেখলাম আমার বাবার চেহারা গাধার চেহারার সদৃশ হয়ে গেছে। আমি একেতো শোকাতুর ছিলাম কিন্তু এই দৃশ্য দেখে লজ্জায় মরে যেতে লাগলাম। এখন আমি আমার বাবার লাশ কীভাবে কাউকে দেখাব? কীভাবে তার জানাজা পড়াব! গোনাহের কারণে আমার বাবার চেহারা গাধার চেহারার সদৃশ হয়ে গেছে তা আমি কীভাবে কাউকে দেখাই। আমি গভীর শোকে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। কান্না করতে করতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমের মধ্যে দেখলাম এক নুরানী চেহারার মহামানব আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার বাবার লাশের মুখের উপরের কাপড় সড়িয়ে দেখলেন। অতঃপর আবার কাপড় দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, "হে বৎস্য! তুমি এরকম শোকে মূহ্যমান কেন? তোমার কি হয়েছে?" আমি বললাম, এর চেয়ে বড় শোকের কারণ আর কি হতে পারে যে আমার বাবার লাশের চেহারা গাধা সাদৃশ হয়ে গেছে?" তিনি বললেন, ওঠ এখন গিয়ে তুমি তোমার বাবার চেহারা দেখ। আমি দেখলাম আমার বাবার চেহারা আবারো আগের অবস্থায় ফিরে আসল, বরং আমার

CamScanner

বাবার চেহারা যেন পূর্নিমার চাঁদের মত ঝলমল করছিল। ঐ মহামানব চলে যেতে উদ্যত হলে আমি তাঁর সামনে গিয়ে আরজ করলাম, "হে মহামানব আপনি কে? আপনার আগমন তো আমাদের জন্য বরকতময় হয়ে গেল। তিনি জবাব দিলেন, আমি নবী মোস্তফা (ﷺ)!"

ঐ ব্যক্তি বলেন, একথা শোনে আমি উনার পবিত্র চাদর মোবারকের কোনা ধরে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমার বাবার সাথে এরকম কেন হল? আমার বাবার চেহারা গাধার চেহারার সদৃশ কেন হয়ে গিয়েছিল? আবার কেনই বা তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন আপনি?"

হুজুর নবী করিম (ﷺ) জবাব দিলেন, "তোমার বাবা জীবনে অনেক বড় একটি কবিরা গুনাহ করেছিল, যে কারণে তার চেহারা গাধার সদৃশ হয়ে যায় মৃত্যুর পর। কিন্তু তোমার বাবার একটি গুন ছিল। সে জীবনে কোন দিন কোন রাত বিছানায় যাওয়ার আগে আমার উপরে ১০০ বার দরুদ না পড়ে ঘুমাত না। তাই যখন সে মারা গেল তখন দরুদের হিসাবরক্ষক ফেরেশতারা এসে আমার কাছে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার এক উম্মত যে জীবনে কোন দিন কোন রাত বিছানায় যাওয়ার আগে আপনার উপরে ১০০ বার দরুদ না পড়ে ঘুমাত না, তার একটি মারাত্মক কবিরা গোনাহের কারণে তার চেহারা মৃত্যুর পর গাধার সদৃশ হয়ে গেছে। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেন, সাথে সাথে আমি আল্লাহর কাছে আরজ করলাম! ইয়া বারি তাআলা আমার এই উম্মতকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আল্লাহ পাক তা কবুল করে নিলেন। তুমি এখন ওঠ এবং তোমার বাবার জানাজার ব্যবস্থা কর।

ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি ঘুম থেকে জেগে দেখলাম আমার বাবার চেহারা সত্যি সত্যি আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। বরং আমার বাবার চেহারা যেন পূর্নিমার চাঁদের মত ঝলমল করছিল। হে শায়খ! এখন আপনিই বলুন, আমি এখন আমার প্রিয় নবীজির (ﷺ) উপর

CamScanner

দরুদ ও সালাম পাঠ না করে আর কি করব! আমার জন্য এর চেয়ে বড় আর কি ওয়াজিফা থাকতে পারে!"

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আজওয়াজি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আসহাবী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম সালামান তাসলিমান কাসিরা।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবির (ﷺ) অলৌকিক ক্ষমতা

২০০৪ সালের রামাদ্বান মাসে ইন্তেকাল করা মক্কা শরিফের বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং আলীমে দ্বীন আওলাদে রাসূল (ﷺ) হযরত সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাবি আল মালেকি রাহ. বলেন, আমার দাদা হযরত সায়্যিদ আব্বাছ আলাবি আল মালেকী রাহঃ একবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবির (ﷺ) মাহফিলে অংশগ্রহনের জন্য হেবরনে গেলেন এবং সেখানে ৮০ বছর বয়সী এক খুবই বৃদ্ধ ও দুর্বল লোককে দেখতে পেলেন যিনি আশ্চর্য্যজনকভাবে পুরো মওলিদ মাহফিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন। আমার দাদা হযরত সেই বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞেস করলেন এর কারণ কি? বৃদ্ধ লোক বললেন, যারা ঈদে মিলাদুন্নবি (ﷺ) উদযাপন করতেন্ একসময় আমি সেসব লোকের প্রচন্ড সমালোচনা করতাম, বিশেষ করে যারা প্রিয় নবীজির (ﷺ) সম্মানে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসা করত তাদেরকে আমি কটু কথা বলতাম।

একদিন আমি গেলাম এবং ঐ মিলাদুন্নবি (ﷺ) উদযাপনকারীদেরকে ব্যাঙ্গ করলাম, তাদেরকে বিদআতী ও শয়তানের দলের লোক ডাকলাম। আমি বাড়িতে এসে সে রাতে ঘুমিয়ে গেলাম এবং হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। তিনি মিলাদুন্নবি (ﷺ) উদযাপনের একটি জুলুসে প্রবেশ করলেন। সবাই তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তিনি আমার কাছে আসলেন এবং যখন আমি

দাঁড়িয়ে গেলাম তিনি বললেন, তুমি বস। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন দেখতে পেলাম যে, আমি সম্পূর্ণ প্যারালাইসড/পক্ষাঘাতগ্রস্থ।

আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বহু ডাক্তারের কাছে গেলাম কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হলো না। অতঃপর যখন ফিলিস্তিনের বিখ্যাত ওলি হযরত শায়খ খলিল আল খালেদীর রাহ. সান্নিধ্যে গেলাম তখন তিনি বললেন, তুমি হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে রাগান্বিত করেছ..."। তখন আমি শপথ করলাম যে, আমি আর কোনদিন মওলিদে অংশগ্রহণকারীদেরকে কটু কথা বলব না, তাদের সমালোচনা করব না। এবং দ্বিতীয়তঃ আমি নিজে মওলিদ উদযাপনের পুরো সময়টা দাঁড়িয়ে থাকব।

ঐ বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, যেই রাতে আমি সেই ওয়াদা করলাম সে রাতেই আমি আবারও হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। তিনি এবারও মিলাদুন্নবি (ﷺ) উদযাপনের একটি জুলুসে প্রবেশ করলেন। সবাই তাঁর সম্মানে আবারও দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তিনি আবারও আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি আমার সম্মানে দাঁড়াতে পার। আল্লাহর কসম যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন দেখতে পেলাম যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্য এবং আমি দাঁড়াতে পারি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ আসলাম

উম্মতে মুহাম্মদির (ﷺ) শেষ ভরসা

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

"আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা আদ দোহা, আয়াত নং-৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

CamScanner

হুজুর নবী কারিম (ﷺ) ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহর কালামখানা তিলাওয়াত করেন,

"হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ইবরাহিম, আয়াত নং-৩৬)

আর হযরত ইসা (আলাইহিস সালাম) বলেন, যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (সূরা মায়েদা, আয়াত নং-১১৮)

অতঃপর (হুজুর নবী কারিম (ﷺ)) হাত ওঠালেন এবং দোআ করলেন, "হে আল্লাহ আমার উম্মতের উপর দয়া কর! হে আল্লাহ আমার উম্মতের উপর দয়া কর! একপর্যায়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

অতঃপর আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বললেন, "হে জিবরিল তুমি যাও এবং মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস কর, আর তোমার রব নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সে কেন কাঁদছে?"

অতঃপর জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও জবাব দিলেন, আর আল্লাহ সম্যক অবগত।

অতঃপর আল্লাহ পাক আজ্জা ওয়া জাল্লা বললেন, "হে জিবরিল তুমি যাও এবং মুহাম্মাদকে বল, অচিরেই আমরা আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব এবং আপনাকে কষ্ট দেব না, অসন্তুষ্ট করব না।

তথ্যসূত্র: সহিহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, হাদিস নং-৪০৬।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয় নবীজির (ﷺ) সুমহান চরিত্র

শেষ নবীর (ﷺ) ধৈর্য্যের পরীক্ষা: এক ইহুদী পন্ডিতের ইসলাম গ্রহণ

এক ইহুদী হুজুর নবী করিমের (ﷺ) দরবারে প্রবেশ করল যখন তিনি সাহাবাগণকে চারপাশে নিয়ে বসেছিলেন। সে সাহাবাগণের সারি ভেদ করে প্রিয় নবীর (ﷺ) সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গিয়ে প্রিয়নবীর (ﷺ) জামা ধরে জোরে টান দিল। জামা ধরে টান দিয়ে খুব রূক্ষ ভাষায় বলল, "হে মুহাম্মদ! আমার যে পাওনা তোমার কাছে আছে তা পরিশোধ কর। তোমরা বনু হাশিম ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে খুব সময় নাও।

নবীজি (ﷺ) এই ইয়াহুদীর কাছ থেকে কয়েক আওসাক খেজুর ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও সেই খেজুর ফিরিয়ে দেয়ার সময় আসেনি। নির্ধারিত সময়ের আগে সে উপস্থিত হয়ে গেছে ঋণ ফিরে পেতে। তার এই বেয়াদবিমূলক আচরন দেখে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. তলোয়ার বের করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই বেয়াদবের গর্দান উড়িয়ে দিই!"

নবীজি (ﷺ) বললেন, "হে ওমর! তুমি ওকে উত্তম পন্থায় ঋণ আদায়ের নসিহত দাও, আর আমাকে উত্তমভাবে ঋণ আদায় করার নসিহত দাও। হে ওমর! তুমি যাও বায়তুল মালের আমার অংশ থেকে এই ইহুদীকে তার পাওনা খেজুর আদায় করে দাও। আর তুমি তাকে কিছু বেশি দেবে। কারণ তুমি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছ।

তখন বায়তুল মালের দায়িত্বে ছিলেন মূলত: হযরত বিলাল রা:, কিন্তু নবীজি (ﷺ) ওমর রা: কেই নির্দেশ দিলেন, যাও তুমি নিজ

CamScanner

হাতে বায়তুল মালের আমার অংশ থেকে ঋণ আদায় কর। কারণ তুমি এই ইহুদী পাওনাদারের সাথে দুর্ব্যবহার করেছ।

ওমর রা: ঐ ইহুদীকে নিয়ে বায়তুল মালে প্রবেশ করলেন নবীজির (ﷺ) ঋণ পরিশোধের জন্য। ঋণ পরিশোধের পর কিছু অতিরিক্ত খেজুরও তাকে দিলেন।

ঐ ইহুদী বললেন, এই অতিরিক্ত খেজুর কেন?"

ওমর রা: জবাব দিলেন, আমি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি সেজন্য।

ঐ ইহুদী বললেন, "হে ওমর আপনি আমাকে চিনেছেন?"

ওমর রা: বললেন, না।

ঐ ইহুদী বললেন, আমি জায়েদ ইবনু সা'নাহ।

ওমর রা: বললেন, আপনি কি সেই বিখ্যাত ইহুদী পন্ডিত?"

ঐ ইহুদী বললেন, হ্যাঁ আমিই সেই ইহুদী পন্ডিত। আমি তাওরাত কিতাবে শেষ নবীজির (ﷺ) যত গুণ আছে সব মিলিয়ে দেখেছি, আর সেসব গুণই মুহাম্মদের (ﷺ) মধ্যে বিদ্যমান। শুধুমাত্র একটি বিষয় পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি। আজ তাও পেয়ে গেলাম। আমি তাওরাতে পেয়েছিলাম, "শেষ নবীজির (ﷺ) ধৈর্য্য ক্রোধের উপরে জয়লাভ করবে। আমি সময়ের আসেন ঋণ নিতে এসেছি, আবার মুহাম্মদের (ﷺ) সাথে খারাপ ব্যবহারও করেছি। কিন্তু তিনি এতটুকুও রাগ করেননি। বরং আরো বদান্যতা দেখিয়েছেন বেশি দিয়ে। হে ওমর! আমি পাওনা খেজুর নিতে আসিনি। বরং শেষ নবীজির (ﷺ) ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিতে এসেছিলাম। ঐ পাওনা খেজুর আমি আল্লাহর রাস্তায় গরীব সাহাবীদের জন্য সদকাহ করে দিলাম। চলুন আমাকে নবীজির (ﷺ) কাছে নিয়ে চলুন। এই বলে তিনি প্রিয়নবীর (ﷺ) কাছে এসে কালিমা শাহাদাৎ পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

পরবর্তীতে তিনি একজন উত্তম সাহাবী হিসেবে জীবন কাটান এবং তাবুকের যুদ্ধে শহীদ হন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, ১/৫২১, ইমাম তাবরানি ফি মুজামিল কাবির ৫/২২২, মুসতাদরাকুল হাকিম, ৩/৬০৪)

এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহনের অনেক কিছু আছে।

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত: আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং-১৩৪)

সর্বশ্রেষ্ঠ সফল রাষ্ট্রনায়ক

-শায়খ হামজা ইউসুফের লেকচার অনুসরনে

"অরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্য গবেষকদের (ইউরোপ- আমেরিকার যারা ইসলাম নিয়ে গবেষনা করেন) একটা বড় সমস্যা হলো তারা যখন রাসুলুল্লাহর (ﷺ) জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করে তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন দুজন নবীকে দেখায়। একজন মক্কী মুহাম্মাদ (ﷺ) আর অপরজন মাদানী মুহাম্মাদ (ﷺ)। তারা মক্কী মুহাম্মাদের (ﷺ) জীবন দর্শনের সাথে সম্পূর্ণ একমত। যেই মক্কী মুহাম্মাদ (ﷺ) কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করছেন, সেই কাফিরদের জন্যই উল্টো হেদায়াতের দোআ করছেন, হাত ওঠাচ্ছেন না কারো উপর, যুদ্ধ করছেন না, জিহাদের ডাক দিচ্ছেন না, ভালোবাসার কথা বলছেন, শান্তির কথা বলছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারা মাদানী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে পছন্দ করে না। যেই মাদানী মুহাম্মাদ (ﷺ) অন্যায়কারীকে শাস্তি দিচ্ছেন, আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করছেন, অস্ত্র ধরছেন, সমাজ থেকে অন্যায় দূর করতে কঠোর হচ্ছেন।

মূলতঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন নবীই। তিনি কখনোই পরিবর্তন হননি। বরং মক্কা জীবন থেকে মদীনা জীবনে এসে তাঁর চারদিকের পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেছে। মক্কাতে তিনি ছিলেন শাসিত, আর মদীনাতে এসে তিনি হয়ে গেলেন শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান।

আল্লাহ পাক আমাদের কিছু কিছু মুফাসসিরিন ও উলামাগণকেও যেন ক্ষমা করে দেন যারা বিশ্বাস করতেন (যেমনটা তাদের তাফসির পড়ে মনে হয়) যে মক্কায় অবতীর্ন নিম্নের এই ক্ষমা, উদারতা ও ধৈর্য্যধারনের শিক্ষাদানকারী আয়াতসমূহের হুকুম মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে, نسخت هذه الآيات آية السيف তরবারির আয়াত এই আয়াতসমূহের হুকুম মানসুখ করে দিয়েছে":

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (৭৩:১০)

কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (৭৩:১১)

বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়েদিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (৪১:৩৪)

সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (৮৮:২২)

আপনি তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন,

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ (৫০:৪৫)

আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন।

অথচ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহঃ তাঁর মাফাতিহুল গাইব তাফসিরের কিতাবে বলছেন, এই আয়াত সমূহে বর্ণিত এই ক্ষমা, উদারতা ও ধৈর্য্যধারনের শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের সুমহান আখলাক। এগুলো কোন অবস্থাতেই রহিত হতে পারে না। আপনাকে যা বুঝতে হবে তা হচ্ছে এগুলো শাসন ক্ষমতায় যারা আছে তাদের জন্য রহিত।

একজন শাসক বা বিচারকের কাজ এটা নয় যে তিনি বিচারের মঞ্চে বসে দয়া দেখাতে গিয়ে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিবেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে যে যাবে তাকে কোন সময়ই বিচারক বলতে পারেন না যে, থাক বাদ দাও, সে তোমার সাথে অন্যায় করেছে তাকে ক্ষমা করে দাও। নাহ, বরং দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রের সকল বিষয় সমাধান করাই তার সফলতা। প্রয়োজনে কাউকে শাস্তি দিতে হলে দিতে হবে, কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হলে ধরতে হবে, কাউকে ভালবেসে কাছে ডাকতে হলে তাও করতে হবে।

এখানেই হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) হযরত ইসা আলাইহিস সালাম থেকে ভিন্ন। আসলে ইউরোপ আমেরিকার খ্রীষ্টানদের সমস্যা হলো তারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কোন নবীকে দেখেনি (অর্থাৎ অন্য কোন নবীজির (ﷺ) জীবনী ভাল করে রিসার্চ করে দেখেনি জীবন চালানোর নমুনা হিসেবে)। তারা হযরত ইসা আঃ কে দেখেছে রোমান পৌত্তলিক সাম্রাজ্যের হাতে অত্যাচারিত এক নবী, যিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আত্মগোপনে যাচ্ছেন, ইহুদীদের অত্যাচারে জর্জরিত এক মহান নবী, ভালোবাসার কথা বলছেন, শান্তির কথা বলছেন, মানুষকে ক্ষমার শিক্ষা দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসা কোন নবীকে কোনদিন দেখেনি, তারা যুদ্ধের কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে কোন নবীকে দেখেনি। তাই তারা যখন হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) মাদানী জীবন নিয়ে আলোচনা করে তখন তারা খারাপ মন্তব্য করে। আসলে এটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ভুল, আর কিছুই নয়। এই ক্ষেত্রে মাইকেল হার্ট নামক

ইহুদী ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর সর্বকালের সফল ১০০ জন মনিষীর তালিকা তৈরি করেছেন এবং তাতে হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) কে রেখেছেন ১ নম্বরে, তিনিই আসলে নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করে ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির কাজটি করেছেনে। কারণ দয়া দেখানো ও শাসনকার্য এর কোন ক্ষেত্রেই হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে সফল কেউ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি।

--শায়খ হামজা ইউসুফ ধর্মান্তরিত এক আমেরিকান মুসলিম যিনি মালিকি মাযহাবের অনুসারী এবং একজন অসাধারন সুফি সুন্নী স্কলার ও দায়ী ইলাল্লাহ।

হুজুর পাক নবী করীমের (ﷺ) অনুপম আদর্শ

একদা একজন গরীব সাহাবী হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জন্য কিছু আঙুর নিয়ে আসলেন হাদিয়া হিসেবে। ঐ গরীব সাহাবী হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জন্য হাদিয়াস্বরুপ কিছু আনতে পেরে খুব খুশি ছিলেন।

তিনি ঐ আঙুরগুলো হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সামনে রেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! এই সামান্য উপহারটুকু আমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করুন।

তিনি একজন গরীব মানুষ ছিলেন যার এর বেশি সামর্থ্য ছিল না। হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জন্য এই সামান্য উপহারটুকু হাদিয়াস্বরুপ হাজির করতে পেরে তাঁর মুখমন্ডল উজ্জল হয়ে গেল খুশিতে। এটা বুঝাই যাচ্ছিল যে, তিনি হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে প্রচন্ড ভালোবাসতেন।

CamScanner

নবী করিম (ﷺ) তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন কৃতজ্ঞতার সাথে। যেহেতু লোকটি তাঁর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন, সেহেতু নবী করিম (ﷺ) একটা আঙুর খেলেন। অতঃপর আরেকটা আঙুর খেলেন।

আস্তে আস্তে নবী করিম (ﷺ) সবগুলো আঙুর একা একাই শেষ করে ফেললেন। তিনি তাঁর সামনে উপস্থিত কাউকেই আঙুর সাধলেন না।

গরীব মানুষটি যিনি আঙুর উপহার হিসেবে এনেছিলেন তিনি খুশি মনে চলে গেলেন। কিন্তু নবী করিমের (ﷺ) সামনে উপস্থিত সাহাবীগণ খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন।

কারণ সাধারনত নবী করিমের (ﷺ) দরবারে হাদিয়া হিসেবে খাদ্যদ্রব্য যাই আসতো তিনি তা উপস্থিত সবার সাথে ভাগ করে খেতেন।

সাধারনত তিনিই প্রথমে খাওয়া শুরু করতেন, উপহার দানকারীকে খুশি করার জন্য, অতঃপর অন্য সবাইকে খেতে দিতেন।

কিন্তু এবার তিনি কাউকেই না দিয়ে একা একা সবগুলো আঙুর শেষ করে ফেললেন!

একজন সাহাবী শ্রদ্ধার সাথে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর নবী (ﷺ)! আপনি কেমন করে সবগুলো আঙুর একাই শেষ করে ফেললেন এবং আমাদের কাউকেই খাওয়ার জন্য সাধলেন না?"

নবী করিম (ﷺ) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমি সবগুলো আঙুর খেয়ে ফেলেছি কারণ আঙুরগুলো খুব টক ছিল। আমি তোমাদেরকে যদি এই আঙুরগুলো খেতে দিতাম, তবে তোমাদের কেউ যদি এমন মুখভঙ্গি করত যাতে এটা প্রকাশ পেয়ে যায় যে আঙুরগুলো খুবই টক, তবে এই গরীব মানুষটার মনে খুব কষ্ট যেত।

তাই আমি চিন্তা করলাম যে, সবগুলো আঙুর হাসিমুখে আমিই খেয়ে ফেলি এবং এই গরীব মানুষটাকে খুশি করে দেই। আমি এই গরীব মানুষটার মনে আঘাত দিতে চাই নাই।

CamScanner

নৈতিক শিক্ষা:

১. অন্যের অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

২. মানুষের উপহার গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

এরকম মহান ছিল আমাদের প্রিয় নবী করিমের (ﷺ) চরিত্র ও আদাব।

মানুষের সাথে দয়ার নবীজির (ﷺ) আচার-ব্যবহার

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ আসলাম

প্রিয় মসজিদের ইমাম, খতিব ও শায়খগণ,

এক যুবক আসল এবং হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কাছে জিনা করার অনুমতি চাইল! আপনি ভাবতে পারেন, জুমুআর দিনে কেউ চীৎকার করে মসজিদে এই অনুমতি চাইছে? মায়ার নবী (ﷺ) তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং তাঁর বুকের ওপরে নিজের পবিত্র হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন। লোকটির জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল।

একজন মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে প্রস্রাব করে দিল, যখন লোকজন তাকে ধমকাতে লাগল তখন রহমতের নবী (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও আর এক পাত্র পানি ছিটিয়ে দাও এর ওপর।

একজন লোক মদ পান করার অপরাধে বার বার শাস্তি পাচ্ছিল। যখন লোকজন তাকে অভিশাপ দিতে লাগল, তখন করুনার আধার নবী (ﷺ) বললেন, তাকে অভিশাপ দিও না! সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (ﷺ) ভালবাসে।

একজন মানুষ নামাজের মধ্যে কথা বলতেন। যখন মানুষ তার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে, সে রাগান্বিত হয়ে গেল। দুজাহানের

শিক্ষক রাসূল (ﷺ) তাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন এবং স্নেহের সাথে তাকে নামাজ শিক্ষা দিতে লাগলেন।

একটি ছোট মেয়ে শিশু দয়ার নবীজির (ﷺ) সাথে খেলতে লাগল এবং যখন তার মা-বাবা প্রিয় নবীজির (ﷺ) সাথে খেলতে নিষেধ করলেন, তখন নবী করিম (ﷺ) খুশিচিত্তে তাকে তার খেলা চালিয়ে যেতে বললেন, তাকে উপহারও দিলেন।

একজন বেদুঈন তাঁর ইয়মেনী মোটা পাড়ের চাদরের কোণা ধরে পেছন থেকে এত জোরে টান দিল যে প্রিয় নবীজির (ﷺ) কাঁধ মোবারকে দাগ হয়ে গেল এবং সেই বেদুঈন দুনিয়ার সম্পদ চাইল। হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন এবং তাঁকে দিতে লাগলেন ও ততক্ষণ পর্যন্ত দিলেন যতক্ষণ না সে খুশি হয়।

যখন বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফির কুরাইশ তাঁর শত্রুরা বন্দী হলো এবং তারা ক্ষুধায় কষ্ট পেতে লাগল তখন প্রিয় নবী (ﷺ) তাদেরকে সাহাবাগণ থেকে উত্তম খাদ্য ও পানীয় দিলেন।

এভাবেই হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার করতেন, হোক সেসব লোক অনেকের দৃষ্টিতে গুনাহগার, অজ্ঞান অথবা অমুসলিম এবং এজন্যই পুরো পৃথিবী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মানুষ মসজিদের প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে।

প্রিয় নবীর (ﷺ) প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কোন দ্বিধা সংকোচ করবেন না

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ আসলাম

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) র ভালোবাসা প্রকাশে কখনো লজ্জাবোধ করবেন না, কখনো কারো হুমকি ধমকিকে তোয়াক্কা করবেন না।

CamScanner

এটাই আমাদের সালফে সালিহিন ও পূর্বপুরুষের তরিকা। কারো শিরকের মিথ্যা অপবাদ যেন হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে সম্মান করা থেকে আপনাকে বিরত না রাখে।

সাহাবাগণ উনার থুথু মোবারক থেকে বরকত হাসিল করেছেন এবং এই থুথু মোবারকের কারণে উনাদের যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ভাল হয়ে গেছে। তাঁরা উনার চুল মুবারক পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি রোগমুক্তির নিয়তে খেতেন। তাঁরা উনার চুল মুবারক যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে গেছেন এবং এর বরকতে যুদ্ধে জয় পেয়েছেন। তাঁরা অনুরোধ করে যেতেন যে, আমাদেরকে কবর দেয়ার সময় প্রিয় নবীজির (ﷺ) এই নখ মুবারক আমাদের সাথে দিয়ে দিও। তাঁরা উনার বরকতময় কাপড় মুবারক কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তাঁরা উনার হাত মুবারক ও পা মুবারকে চুমু দিয়েছেন, তাঁর মিম্বরে চুমু দিয়েছেন এবং উনার কাপড় মুবারক রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করেছেন। তাঁরা উনার ঘাম মুবারক আতর হিসেবে ব্যাবহার করেছেন এবং তাঁর ওজুর অতিরিক্ত পানি তাঁদের সারা শরীরে মেখেছেন।

তাঁরা উনার হাত মুবারক তাঁদের মুখে বুলিয়ে নিয়েছেন এবং তাঁরা উনার শরীর মুবারক ছুঁয়ে যাওয়া পানির ফোটার জন্য প্রতিযোগিতা করেছেন।

তাঁরা তাঁদের বুককে বর্ম বানিয়েছেন এবং তীরের মুখে নিজেদের ঘাড়কে পেতে দিয়েছেন উনাকে রক্ষার জন্য। হযরত ওমর রা. উনার পা মুবারকের কাছে সমাহিত হয়েছেন, হযরত বিলাল রা. মদীনা শরিফ ত্যাগ করে সিরিয়াতে গিয়ে বসতি গেড়েছেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বাহ্যিকভাবে মদীনা শরিফে নাই, এটা সহ্য করতে না পেরে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. রাতের বেলা চিৎকার করে কেঁদেছেন মৃত্যুর জন্য শুধুমাত্র উনার সাথে মিলিত হতে।

গুনাহগার উম্মতের জন্য হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) অসাধারন দোআ ও মায়া!

হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা দোআ করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আয়েশার (رضي الله عنها) অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন, তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন"।

এই দোআ শোনে হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন। তখন হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "হে আয়েশাহ! তুমি এই দোআতে এত খুশি হয়ে গেছ?"

হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই দোআতে আমি কীভাবে খুশি না হই?"

তখন হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি প্রতি ওয়াক্ত নামাজে আমার উম্মতের জন্য এই দোআ করি।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার।

তথ্যসূত্রঃ সহিহ ইবনে হিব্বান হাদিস নং-৭১১১, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ হাদিস নং-৩২২৮৫, তাবরানি, দোআ-হাদিস নং-১৪৫৮, মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন হাদিস নং-৬৭৩৮

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলীহি ওয়া আসহাবীহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

সীরাতের পুলের কাছে প্রিয় নবীজির (ﷺ) কান্না

মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ আসলাম

হাশরের দিনে প্রত্যকটি মানুষকে সিরাতের পুল পাড় হতে হবে। এটা চুলের চেয়েও সরু হবে, তলোয়ারের চেয়েও ধারালো হবে,

নিচে থাকবে আগুন, আর অপর দিকে থাকবে জান্নাত। সূর্য মাথার ঠিক উপরেই থাকবে, যার ফলে মানুষ নিজের ঘামে সাতার কাটবে। সকল মানুষ ভয়ে কম্পমান থাকবে, কবিরা গুনাহকারীরা পা পিছলে পড়ে যাবে নিচের আগুনে।

একজন মাও তার সন্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না সেই দিনে, কিন্তু আমাদের নবী (ﷺ) কী করবেন সেই দিনে জানেন কী? আমাদের নবী (ﷺ) সেদিন সিরাতের পুল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং আমাদের পাড়াপাড় দেখবেন। চোখে অশ্রু নিয়ে দোয়া করতে থাকবেন, ওহ আল্লাহ! আমার উম্মতকে নিরাপত্তা দাও।

হে রাসূলাল্লাহ (ﷺ) কীভাবে আমরা আপনাকে ভাল না বাসি?

হযরত আবু হুরায়রা রা. এবং হযরত আবু সায়িদ খুদরি রা. হতে সুনান ইবনে মাজাহ, ইবন হিব্বান, হাকিম ফিল মুস্তাদরাক, শায়খ আলবানিও সহিহ বলেছেন তার সহিহুল জামি তে, হাদিস নং: ৮১৮৯।

আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত, আর আমরা?

একবার কোথাও বলেছিলাম, সবাইকে প্রিয়নবী (ﷺ) র ভালোবাসার সাথে যুক্ত করাই যথেষ্ট, তাহলে আর কষ্ট করে এত এত বিষয় দলিল দিয়ে প্রমান করতে হবে না। এক ভাই জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে আমরা মানুষকে প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসার সাথে যুক্ত করব?

আমার জবাব ছিল অনেকটা এরকম, প্রিয় নবীজির (ﷺ) র ভালোবাসার আলোচনা করে, উনার সুমহান আখলাক আলোচনা করে, উনার শামাইল ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে। সবচাইতে

বড় কথা, নিজেদের মধ্যে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) র সুমহান আখলাক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করার মাধ্যমে।

আমাদের নবীজি (ﷺ) সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরিত হয়েছিলেন। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭) শত্রু-মিত্র, মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ, শিশু- বৃদ্ধ, সাদা-কালো, লম্বা-বেটে, ধনী-গরীব, শক্তিশালী- দুর্বল, জালিম- মাজলুম, ধর্ম-বর্ণ নির্বীশেষে সকল মানুষের জন্য রহমত ছিলেন। মানুষ না শুধু বরং সকল জীবের জন্যও তিনি রহমত ছিলেন। যেই উটকে তার মালিক বেশি বেশি বুঝা চাপিয়ে দিয়ে কষ্ট দিত সেই উট এসে প্রিয় নবীর (ﷺ) কাছে অভিযোগ করল এবং নবীজি (ﷺ) বললেন তার ওপর তোমরা এভাবে অত্যাচার করো না। সেই যুগে নারীদের ওপর অত্যাচার করা হত, নবীজি (ﷺ) ঘোষণা দিলেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের জন্য উত্তম। দাসদাসীকে তখন মানুষই মনে করা হতো না, এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, আমার খাদিমকে আমি কতবার ক্ষমা করব? নবীজি (ﷺ) বললেন, প্রতিদিন ৭০ বার। আনাস রা. ১০ বছর প্রিয় নবীজির (ﷺ) খেদমত করেছেন, তিনি বলেন, এই দশ বছরে আমাকে প্রিয়নবী (ﷺ) কোনদিন কোন বিষয়ে ধমক দেন নাই, বলেন নাই হে আনাস! তুমি এটা কেন করলে না? বলেন নাই হে আনাস তুমি এটা কেন করেছ?

মক্কার কাফির কুরাইশ, যাদের অত্যাচারে বাধ্য হয়েছিলেন মদীনায় হিযরত করতে, সেই কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা দিলেন, আন্তুমুত তুলাকা! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। কাফিরদের মিথ্যা প্রপাগান্ডায় যেই বৃদ্ধ মহিলা মদিনা শরিফ ছেড়ে পলায়ন করছিল সেই মহিলারই পুটলা মাথায় করে মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে দিলেন। যেই মহিলা পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত তারই অসুস্থতায় সেবা সুশ্রুষা করে সুস্থ করে তুললেন।

CamScanner

কাল কেয়ামত পর্যন্ত একটা সার্বজনীন মানদন্ড দিয়ে গেলেন সুমহান আখলাকের, ঘোষণা করে দিলেন, احسن الى من اساء اليك "যে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। আরো ঘোষণা করে দিলেন, صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর, যে তোমার ওপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।

ঘোষণা করে দিলেন, বনী ইসরাইলের এক চরিত্রহীনা নারী শুধুমাত্র একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে সারাজীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা পেয়ে গেল। আরো ঘোষণা করে দিলেন, শুধুমাত্র একটা বিড়ালছানাকে কষ্ট দেয়ার কারণে অপর আরেক নেককার মহিলার সকল আমল বরবাদ করে দেয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! কোথায় আমাদের প্রিয় নবীজির (ﷺ) আখলাক আর কোথায় আমাদের আখলাক! আমাদের আখলাক দেখে অমুসলিমরা মুসলমান হবে দূরে থাক, বরং ইসলামের প্রতি তাদের ঘৃণা আরো বাড়ে।

প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে উনার আখলাক আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

প্রিয় নবীজির (ﷺ) আখলাকের প্রতিমূর্তি যদি আমরা হতে পারি তবে মানুষ নবীজি (ﷺ) ভালোবাসার এই মিশনে অবশ্যই যোগ দিবে।

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)'র সুমহান চরিত্রই ছিল তাঁর বড় মু'জিযা

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরশে হেটেছেন এটা বড় মুজিযা নয়, বরং তিনি আরশ রেখে ফারশে (জমিনে) হেটেছেন এটাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আরশের আলোচনা আমরা ঠিকই করি, কিন্তু এই ফারশে

(জমিনে) তিনি কীভাবে পদচারণা করেছেন সেই আলোচনা আমরা প্রায় বাদই দিয়ে দিয়েছি। হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এই দুনিয়াতে কীভাবে পদচারণা করেছেন সেসব ঘটনা একেকটি বড় মু'জিযা। প্রিয় নবীজি (ﷺ) র সুমহান চরিত্র এক মহান মু'জিযা। আজকের জমামায় এসব মু'জিযার আলোচনা বেশি বেশি প্রয়োজন।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পরিবারের গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত থাকতেন। আর যখন আজান হত তখন ওজু করে মাসজিদে চলে যেতেন। এর চেয়ে বড় মু'জিযা আর কী চান? সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি তাঁর পরিবারের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন, উম্মাহাতুল মুমিনিনগণকে গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করতেন। ছাগলের দুধ দোহাতেন, নিজের জামাকাপড় নিজে সেলাই করতেন, নিজের জুতো নিজে সেলাই করতেন।

কোন সময় খাদিম বা ঘরের সেবা দেন এমন কাউকে ধমক দেননি, কটু কথা বলেন নি। কোন সময় কোন মহিলা ও খাদিমের গায়ে হাত তুলেন নি। হাসিমুখে সবার সাথে কথা বলতেন। বলতেন, "তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসিটিও তোমার জন্য সাদাকাহ (হিসেবে আমলনামাতে যোগ হবে)।

হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সবচাইতে বড় মু'জিযা কুরআন মাজিদ যা এখনো আমাদের সামনে বিদ্যমান। সেই কুরআন মাজিদকে আমরা কতটা আঁকড়ে ধরতে পেরেছি? উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) র আখলাক কেমন ছিল?" তিনি জবাবে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমরা কী কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত কর না?" তাবিইনগণ বলেন, হ্যাঁ আমরা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করি। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, কানা খুলুকুহু আল কুরআন। কুরআন মাজিদই ছিল তাঁর সুমহান চরিত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

আহলে বায়ত বা নবী পরিবার

প্রিয় নবী (ﷺ) পরিবারকে আঁকড়ে ধরার হাদিস মুতাওয়াতির বা অকাট্য সনদে কেন আসল?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

যখন قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (হে নবী আপনি) বলুন, আমি (আমার দাওয়াতের জন্যে) তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, কেবল আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি সৌহার্দ্য চাই। (সূরা শুরা, সূরা নং-৪২, আয়াত নং-২৩) আয়াতখানা নাজিল হল, তখন (সাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার সেই নিকটাত্মীয়গণ তারা কারা যাদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের উপর ফরজ হয়ে গেছে?"

তখন হুজুর নবীয়ে পাক (ﷺ) বললেন, আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের দুপুত্র। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। (মুজামুল কাবির লিল ইমাম তাবরানি, হাদিস নং-১২১০০, মুসতাদরাকুল হাকীম)

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت : خرج النَّبِيُّ ﷺ غداةً وعليه مِرْطٌ مُرَحَّل مِن شَعر أسود ، فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثمَّ جاء الحُسين فدخل معه ، ثمَّ جاءت فاطمةُ فأدخلَها ، ثمَّ جاء عليٌّ فأدخله ، ثمَّ قال : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

(رواه مسلم (٢٤٢٤

ভোর বেলা হুজুর রাসুলুল্লাহ বের হলেন ঘর থেকে। উম্মুল মুমিনিন আম্মাজান সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলছেন, প্রিয় নবীজির (ﷺ)

শরীর মুবারকে ছিল কালো পশমের তৈরী একখানা চাদর। এমন সময় বড় নাতি সায়্যিদুনা হাসান রা. দৌড়ে আসলেন, নবীজি (ﷺ) ইমাম হাসানকে তাঁর চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। বড় ভাইয়ের পেছনে পেছনে ছোটভাই ইমাম হোসাইন রা. ও আসলেন, তাঁকেও চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। দুই সন্তানের খুঁজে মা ফাতেমা রা. এবং বাবা মাওলা আলীও রা. ছুটে আসলেন। তাঁদের দুজনকেও চাদরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। চাদরের মধ্যে তখন প্রিয় নবীজিকে (ﷺ) নিয়ে মোট পাঁচজন। তখন হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সূরা আহজাবের ৩৩ নং আয়াতের শেষ অংশটুকু তিলাওয়াত করলেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরুপে পূত-পবিত্র রাখতে। (সূরা আহজাব, ৩৩:৩৩) (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৪২৪)

তিরমিজি শরিফের অপর বর্ণনায় এসেছে আম্মাজান উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা উম্মে সালামা রা. থেকে, চারজনকে (মাওলা আলী, মা ফাতেমা, হাসান হোসাইন আলাইহিমুস সালাম) চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك وأنت على خير

"হে আল্লাহ! এঁরাই আমার আহলে বাইত বা পরিবারের সদস্যবর্গ, তাদের থেকে সকল অপবিত্রতাকে দূরে রাখুন এবং তাদেরকে পবিত্রের মত পবিত্র করুন।

উম্মে সালামা রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আমি কী তাদের সাথী নই? হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি তোমার

জায়গায় আছ এবং তুমিও কল্যাণের ওপরেই আছ"। (সুনান তিরমিজি, হাদিস নং- ৩২০৫)

সম্মানিত পাঠক এই পাঁচজনই হলেন আহলে বায়তে খাস, আহলে কিসা, আহলে আবা। যাদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের ওপর আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে কুরআন মাজিদে আয়াত নাজিল করার মাধ্যমে।

أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قال لعليّ رضي الله عنه :

والذي نفسي بيدِه لَقرابةُ رسول الله ﷺ أحبُّ إليَّ أنْ أصِلَ من قرابَتِي

ইমাম বুখারি ও মুসলিম উভয়েই উনাদের সহিহ হাদিসের কিতাবে এনেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলছেন, "কসম সেই স্বত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, আমার নিজের আত্মীয় স্বজনের চাইতে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) আত্মীয় স্বজন আমার কাছে অধিক ভালোবাসার"। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৩৫০৮, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৭৫৯)

عن أبي بكر رضي الله عنه أيضاً قوله :" ارقُبُوا محمَّداً ﷺ في أهل بيتِه.

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. আরো বলছেন, "তোমরা হুজুর মুহাম্মদের (ﷺ) সন্তুষ্টি তালাশ কর তাঁর আহলে বায়তের মাধ্যমে"। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৩৫০৯)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল-এসো,

আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (৩:৬১)

ষষ্ঠ হিজরি সনে নাজরান থেকে একদল খ্রীষ্টান আসলেন তাদের দলনেতা আকিবের নেতৃত্বে। হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে পবিত্র মসজিদে নববীতে থাকতে দিলেন। তাদের প্রার্থনার সময় হলে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে মসজিদে নববীর ভেতরেই প্রার্থনা করার অনুমতি দিলেন। তিনদিন পর্যন্ত তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সাথে তর্ক বিতর্ক করল। ইসলাম সত্য না কি খ্রীষ্টান ধর্ম সত্য, ইসলাম আসার পর কী খ্রীস্টান ধর্মসহ পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে কী না! ইসা আলাইহিস সালাম কী আল্লাহর পুত্র নাকি শুধু নবী ও রাসুল এসব বিভিন্ন বিষয়ে। অতঃপর আল্লাহ পাক সূরা আলে ইমরানের ৬১ নাম্বার এই আয়াত নাজিল করে দিলেন। বললেন, ওহ আমার হাবিব (ﷺ)! অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এখন সময় মুবাহিলার। অর্থাৎ উভয় পক্ষ তাদের পরিবার পরিজনসহ খোলা আকাশের নিচে এসে একথা বলবে যে, আমি যদি আমার দাবির ওপর মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তবে আমার ওপর আল্লাহর গজব পড়ুক। আমার ওপর আল্লাহর লানত হোক।

আল্লাহ পাক হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেন, তুমি তাদেরকে অর্থাৎ নাজরানের সেই খ্রীষ্টান দলকে বল, যদি তোমরা তোমাদের দাবির ওপরে সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তোমাদের স্ত্রী সন্তান এবং তোমাদের নিজেদের প্রাণ নিয়ে হাজির হয়ে যাও আর আমিও আমার মহিলাগণ সন্তান ও আমাদের প্রাণসমূহ নিয়ে হাজির হয়ে যাই অতঃপর এই দোয়া করি আমি যদি আমার দাবির ওপর মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তবে আমার ওপর আল্লাহর গজব পড়ুক। আমার ওপর আল্লাহর লানত হোক।

CamScanner

আকিব প্রথমে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু যখন হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে মাওলা আলী, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান হোসাইন রা. কে সাথে নিয়ে মুবাহিলার জন্য মাঠের দিকে আসতে দেখল তখন সে ভয় পেয়ে গেল এবং মুবাহিলা থেকে পিছিয়ে গেল। নাজরানের সেই খ্রীস্টানদল জিজিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে গেল। (সিরাতে ইবনে ইসহাক, তাফসিরে ইবনে কাসিরের সূরা আলে ইমরানের ৬১ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য)

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আমার হাবিব আপনি বলুন, আমরা আমাদের নারীদেরকে নিয়ে উপস্থিত হই, সেখানে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিলেন হযরত ফাতিমা (ﷺ) কে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে আসি, এই জায়গায় নিয়ে আসলেন হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন রা. কে এবং আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণ নিয়ে হাজির হই। তাহলে এখানে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে হাজির হয়েছেন ঠিক আছে, কিন্তু মাওলা আলী এখানে কোন ক্যাটাগরিতে পড়েন? তাঁকে কেন নিয়ে আসলেন?

প্রিয় পাঠক! হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মাওলা আলীকে নিজের প্রাণের অংশই মনে করতেন সেই শুরু থেকে। তাই আহলে বায়তের পুরো পরিবার সহই তিনি মুবাহিলার জন্য মাঠে আসেন যা দেখে ভয় পেয়ে নাজরানের খ্রিস্টান নেতা আকিব পলায়ন করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কেউ যদি রুকন (খানায়ে কাবা) ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে নামাজরত অবস্থায় থাকে ও সে রোজাদার হয় এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কিন্তু অন্তরে আহলে বাইতদের (নবী পরিবারের) প্রতি বিন্দু পরিমাণ হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণকারী হয় তবে সে জাহান্নামী। (আল মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন (মুস্তাদরাকে হাকীম) : আল্লামা ইমাম হাকীম নিশাপুরী (রহঃ), ৪র্থ খন্ড, হাদিস নং- ৪৭১২।) হাদিসখানা

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম জাহাবিও অনুরুপ বলেছেন।

হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমাম হাসান ও হোসাইনের (আলাইহিমুস সালাম) হাত ধরে বললেন, যারা আমাকে ভালবাসে এবং এই দুজনকে ভালবাসে ও এই দুজনের মাতা-পিতাকে ভালবাসে সে আমার সাথে একই স্তরে কাল কেয়ামতের দিন থাকবে। সুনান তিরমিজিতে এসেছে, "সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। তথ্য সূত্র: সুনান তিরমিজি, হাদিস নং-৩৭৩৩ এবং ৩৬৯৫, মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং-৫৭৭, ৫৬৩

হাবিবে খোদা (ﷺ) হজ্জ শেষে মদীনা শরিফে ফিরছেন। মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী গদিরে খুম নামক পানির উৎসের নিকটে আসলেন। সিরিয়া (দামেশক), ইরাক (কুফা) ও মদিনার মানুষ শুধু সাথে, আর সবাই হজ্জ শেষে চলে গেছেন। আদেশ করলেন, আমার জন্য মিম্বর তৈরি কর। মিম্বর তৈরি হলো। দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। আল্লাহর প্রশংসা করলেন প্রথমে। ইশারা দিলেন হয়ত এই বছরের পর আর তোমরা আমাকে দেখবে না। কিন্তু আমি আমার পর দু'টো ভারী বস্তু তোমাদের নিকট রেখে যাচ্ছি। এই দুটো বস্তু আঁকড়ে ধরলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি অপরটি থেকে মহান। একটি বস্তু হচ্ছে আল্লাহর কিতাব বা কুরআন মাজিদ। এতে হেদায়াত আছে, আছে নুর। একে তোমরা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর। আকাশ থেকে অবতীর্ণ একটা রশি এই আল কুরআন। অপর বস্তু হচ্ছে আমার আহলে বায়ত, আমার পরিবার। আল কুরআন ও আমার আহলে বায়ত একে অপরকে ত্যাগ করবে না। কাল হাশরের দিনে হাউজে কাউসারে আমার সাথে একত্রে তাঁরা মিলিত হবে। আমি আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছি, আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি দেখব আমার পর তোমরা আমার আহলে বায়তের সাথে কিরুপ ব্যবহার কর। এখানেই মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম) র হাত উঁচিয়ে ধরে

বললেন, আমি যার মাওলা (অভিভাবক) এই আলী তার মাওলা (অভিভাবক)।

এই হাদিসখানা সহিহ মুসলিম (হাদিস নং-২৪০৮) ও তিরমিজি (হাদিস নং ৩৭৮৮) সহ অসংখ্য অগণিত হাদিসের কিতাবে অসংখ্য সনদে এসেছে। এই হাদিস মুতাওয়াতির বা অকাট্য।

প্রশ্ন হলো এই হাদিসখানা বিদায় হজ্জের ভাষণে বললেন না কেন? কারণ আরো হাজারো থাকতে পারে। কিন্তু একটা বড় কারণ হচ্ছে, এই হাদিসখানা সিরিয়া, ইরাক ও মদীনার সাহাবাগণের শুনা বেশি প্রয়োজন ছিল। কারণ হাবিবে খোদার (ﷺ) কাছে খবর ছিল, সিরিয়া ও ইরাকের মানুষের পক্ষ থেকে আহলে বায়তে আতহারের ওপর অত্যাচার নেমে আসবে। আর মদীনাবাসীর জানা প্রয়োজন ছিল, তোমাদের ওপর জুলুম হবে। সেই সময় তোমরা আমার আহলে বায়তকে আঁকড়ে ধর।

মূল প্রসঙ্গে আসি এবার। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে প্রিয় হাবিবে খোদা (ﷺ) বলেছেন। তবে তা মুতাওয়াতির বা অকাট্য সনদে আসেনি। ইমাম মালিক রাহ. মুরসাল সনদে তাঁর মুওয়াত্তাতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম নিশাপুরী তার মুস্তদ্রাকে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন সনদই অকাট্য নয়। কুরআন মাজিদ ও আহলে বায়তকে আঁকড়ে ধরার হাদিস অকাট্য সনদে আসল, কিন্তু সুন্নাহকে আঁকড়ে না ধরলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে সেই হাদিস অকাট্য সনদে আসে নাই। কারণ কী?

কারণ কুরআন মাজিদের মাঝেই সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার আয়াত আছে অনেক অনেক। মা আতাকুমুর রাসুলু ফাখুজুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু। "আমার রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তোমরা তা আঁকড়ে ধর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে দূরে থাক" (সুরা হাশর, আয়াত নং -৭)। আল কুরআন মুতাওয়াতির অকাট্য।

আর আরেকটা বড় কারণ যে, হাবিবে খোদার (ﷺ) কাছে খবর ছিল, আমার উম্মত আমার পর আমার জাহিরি সুন্নাহকে হয়ত আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু আমার আহলে বায়তকে পরিত্যাগ করবে, তাদের ওপর অত্যাচার অবিচার করবে। হয়েছেও তাই, ইমাম আলী রা. নামধারী খারেজি মুসলমানের হাতে নামাজরত অবস্থায় শহীদ হলেন কুফার মসজিদের মেহরাবে। ইমাম হাসান রা. কে বিষ প্রয়োগে শহীদ করেছে নামধারী মুসলমান। কারবালার জমিনে ইমাম হোসাইন রা. দুধের শিশুপুত্রসহ নির্মমভাবে শহীদ হন ভক্ত অনুরক্ত ও পরিবার পরিজনসহ। রাক্ষসেরা ক্ষমতা দখল করে, ইমাম হোসাইন রা. কে শহীদ করে তাতেও সন্তুষ্ট হলো না। ইমাম জয়নুল আবেদিন ইবনুল হোসাইনকে রা. নির্মমভাবে শহীদ করে, তদীয় পুত্র ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির, তদীয় পুত্র ইমাম জাফর আস সাদিক (আলাইহিমুস সালাম) সকলকে শহীদ করল। অতঃপর ইমাম জায়েদ বিন আলী, ইমাম হাসান আল মুসান্নাসহ আহলে বায়তের বহু ইমামকে ওমাইয়া ও আব্বাসীয় রাক্ষসেরা শহিদ করল।

ভয় একটাই, কখন মানুষের মনে আবার আহলে বায়তের প্রেম জেগে ওঠবে। কখন তাদের জুলুমের মসনদ ছুড়ে ফেলে দিবে। কখন জানি বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। কেন মানুষ আহলে বায়তের সদস্যদেরকে এত ভালবাসে? কেন হজ্জের মৌসুমে আমি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান নামধারী ওমাইয়া খলিফার জন্য কা'বার রাস্তা ছেড়ে দেয় না মানুষ! কেন ইমাম জয়নুল আবেদিন আসলে মানুষ আপনা থেকে রাস্তা খালি করে দেয় কাবা তাওয়াফ করার জন্য?

হিংসা বিদ্বেষ এবং ক্ষমতা যাওয়ার ভয় থেকে ওমাইয়া ও আব্বাসীরা সবসময় আহলে বায়তের ইমামগণকে শহীদ করেছে অথবা তাঁদেরকে মানুষের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য খুতবাতে গালি দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। মিথ্যা প্রপাগান্ডা করিয়েছে আহলে বায়তে আতহারের বিরুদ্ধে। ভয় একটাই খেলাফাতে রাশিদাকে হেয় করা,

CamScanner

আর তাদের রাজতন্ত্রকে জায়েজ করা ও বড় করে তুলে ধরা। একমাত্র ওমাইয়া ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহ. আহলে বায়তে আতহারের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন। জাযাহুল্লাহু খাইরাল জাযা।

উম্মতে মুহাম্মাদী (ﷺ)! প্রস্তুত হও। হাশরের ভয়াবহ কঠিন সময়ে যখন সূর্য মাথার ওপরে আসবে। কলিজা ফেটে যেতে চাইবে তৃষ্ণায়। ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হবে। সেই কঠিন সময়ে হাউজে কাওসারের পানি ছাড়া আর কোন পানি থাকবে না তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। হাবিবে খোদার (ﷺ) কাছে যেতে হবে। কোন মুখ নিয়ে আমরা দাঁড়াব তার সামনে? এই উম্মত কী আচরনটাই না করল আহলে বায়তে আতহারের সাথে!

আলী কুরআনের সাথে আর কুরআন আলীর সাথে

আল্লাহর নবীর (ﷺ) একজন জলিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। নাম ছিল তাঁর হযরত আবু জার গিফফারি রা.। তাঁর এক কৃতদাস ছিলেন যার নাম ছিল আবু সাবিত রাহ.। তিনি একবার মদিনা শরিফে প্রিয় নবীজির স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাহ উম্মে সালামাহর রা. ঘরে আসলেন। এসে বললেন, আমি হজরতে আবু জর গিফফারীর রা. দাস ছিলাম। আম্মাজান হজরতে উম্মে সালামা রা. বললেন, বস, তোমার জন্য কিছু খাওয়া নিয়ে আসি।

আবু সাবিত রাহ. বললেন, আম্মাজান আমি খাওয়া ও পানীয়ের জন্য আসি নাই, আমি মদিনা শরিফে এসেছিলাম তাই মনে করলাম আম্মাজানের জিয়ারত করে যাই। আমি জংগে জামাল থেকে ফিরছি।

জামালের যুদ্ধই সেই যুদ্ধ যেখানে একপক্ষে মাওলা আলী আলাইহিস সালাম এবং অপর পক্ষে আম্মাজান হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা রা.,

হযরত তালহা রা. এবং হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ছিলেন।

আম্মাজান উম্মে সালামা রা. বললেন, আচ্ছা আবু সাবিত তুমি আমাকে বল। তুমি কার পক্ষে ছিলে?

অর্থাৎ মাওলা আলীর পক্ষে না তোমার আম্মাজান আয়েশার পক্ষে?

আবু সাবিত রাহ. বলেন, আমি তো সকালবেলা মাওলা আলীর পক্ষেই ছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রা. বিরোধী দলে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন আমি দ্বিধা দ্বন্দে পড়ে গেলাম।

কিন্তু জোহরের নামাজের পর আমার অন্তর মজবুত হয়ে গেল এবং আমি মাওলা আলী আলাইহিস সালামের পক্ষেই দাঁড়ালাম এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করলাম ও আমরা জয়ী হলাম।

আম্মাজান উম্মে সালামা রা. বললেন, তুমি সঠিক কাজটিই করেছ। কারণ আমি আমার নিজ কানে শুনেছি হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

"আলী কুরআনের সাথে এবং কুরআন আলীর সাথে। তারা দুজন আলাদা হবে না, যতক্ষণ না এভাবে হাউজে কাউসারে এসে আমার সাথে মিলিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন লিল হাকিম, হাদিস নং- ৪৬২৮, ৪৬৮৫! ইমাম জাহাবিও এই হাদিসখানাকে সহিহ বলেছেন।

CamScanner

মুসলিম জাতির উপর আজাব আসার কারণ!

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এক গাজওয়া থেকে ফিরছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, আমি হাবিবে খোদার (ﷺ) পাশেই বসা ছিলাম। মাওলা আলী আসলেন। মাওলা আলীকে প্রিয় নবীজি (ﷺ) পাশেই বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন, ওহ আমার আলী! তুমি কী জান প্রথম যুগের সবচাইতে বদনসিব ব্যক্তি কে?"

মাওলা আলী রা. স্বভাবসুলভ জবাব দিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (ﷺ) সর্বাধিক অবগত।

হাবিবে খোদা বললেন, সেই ব্যক্তি যে সালিহ আলাইহিস সালামের উটনিকে জবাই করেছিল। ঐ ঘটনার পরই সেই সামুদ জাতির ওপর আজাব নেমে আসে।

হে আলী তুমি কী জান? শেষ জমানার সবচাইতে বদনসিব ব্যক্তি কে?

মাওলা আলী আবারো স্বভাবসুলভ জবাব দিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (ﷺ) সর্বাধিক অবগত।

হাবিবে খোদা হাত মোবারক দিয়ে মাওলা আলীর দাঁড়ির দিকে ইশারা করলেন। বললেন, এই উম্মতের সবচাইতে বদনসিব ব্যক্তি সে, যে এই দাঁড়িকে রক্তে লাল করবে। অর্থাৎ তুমি আলীকে যে শহিদ করবে। অতঃপর আমার উম্মতের ওপরও আজাব নেমে আসবে।

প্রিয় পাঠক! ওহ আমার নবীজির (ﷺ) উম্মত! মাওলা আলীর শাহাদাতের পরই আমাদের ওপর আজাব নেমে এসেছিল। আর তা ছিল খেলাফাতে রাশিদার বিলুপ্তি। যা আজ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ১৪০০ বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ এই খেলাফাতে রাশিদা নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছে। এর চেয়ে বড় আজাব আর কী হতে পারে আমাদের জন্য?

CamScanner

মুসলিম বিশ্বকে মাওলা আলীর পর থেকে অদ্যাবধি জালিম শাসকদের (হাতে গোনা দু চারজন শাসক ব্যতীত) নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন আল্লাহ। এর চাইতে বড় আজাব আর কী হতে পারে?

উম্মত যখন উলুল আমর ন্যায়পরায়ণ শাসক খলিফায়ে রাশিদকে শহিদ করে তখন এই অবস্থাই হয়।

মানুষ তো মাওলা আলীর জীবন ও আহলে বায়তে আতহারের জীবনীও ভুলে যাচ্ছিল। সত্যের সাথে মিথ্যা মেশানো হয়েছে। তবে এখন পরিস্থিতি আলহামদুলিল্লাহ পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ আবারো আহলে বায়তের ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছে, জানতে চেষ্টা করছে। ইতহাসে কী হয়েছিল এখন সবাই জানার চেষ্টা করছে।

এর কারণ কী জানেন?

কারণ ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের আগমনের সময় চলে আসছে। তিনি আহলে বায়তের রক্তধারা থেকেই আসবেন। এখন মানুষ যদি আহলে বায়তের ইমামগণের ব্যাপারে না জানে তখন ইমাম মাহদিকেও শিয়া রাফেজি বলে অস্বীকার করে দিতে পারে। তাই আল্লাহ পাক মানুষকে এই অনুভূতি দিয়েছেন, তারা আহলে বায়ত সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। আহলে বায়ত যে জালিম পাপাচারী শিয়া রাফেজিদের সম্পদ না, বরং মূলধারার মুসলমানদের প্রাণের সম্পদ হবেন তা বুঝতে পারছে মানুষ।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আহলে বায়তের প্রেমে ফানা হওয়ার তওফিক দিন। আমিন।

এই হাদিসখানার অনেক রেওয়ায়াত এসেছে, সনদও অনেক, বেশ কজন সাহাবা থেকে বর্ণিত। একখানা বর্ণনা আরবিতে আরবি-বাংলা কিছু রেফারেন্সসহ দিলাম।

তথ্যসূত্রঃ ১. নাসাই, সুনানুল কুবরা, হাদিস নং- ৮৫৩৮, ২. মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং-১৭৮৫৭, ৩. মুসতাদরাক লিল হাকিম, হাদিস নং- ৪৫৯০, ৪৬৭৯।

CamScanner

"গদির ডিক্লেয়ারেশন" মাওলা আলীর অভিষেক দিবস

১১ হিজরি গণের ১৮ই জিলহজ্জ, গদির ডিক্লেয়ারেশন দিবস"। মাওলা আলীর বেলায়াতের অভিষেক দিবস। বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে শত শত সাহাবায়ে কেরামের সামনে "গদিরে খুম" নামক পানির উৎসের কাছে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) মাওলা আলীর রা. হাত উপরে তুলে ধরে ঘোষণা করেন,

"من كنت مولاه فعلي مولا"

"মান কুনতু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহ।

"আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। -তিরমিজি, হাদিস নং-৩৭১৩, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১২১

অপর রেওয়ায়াতে এসেছে, আলীয়্যুন মাওলা কুল্লি মুমিনিন মিন বাদি। - আলী আমার পর সকল মুমিনের ওলি।

এই হাদিসখানা অসংখ্য অগণিত সনদ ও রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসও বলেছেন।

সেজন্য আলবানি সাহেবের মত কট্টরপন্থী লোকও এই হাদিসখানা সহিহ বলতে বাধ্য হয়েছে, তার সিলসিলাতু আহাদিসি সাহিহাতে। হাদিস নং ১৭৫০ দেখুন।

হযরত জায়েদ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে সহিহ মুসলিম শরিফে এসেছে, এই "গাদিরে খুম" নামক জায়গায়ই প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে বায়ত (ইমাম আলী, হাসান হোসাইন ও মা ফাতেমাতুজ যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করেছেন, আহলে বায়তকে অনুসরণ করতে তাকিদ দিয়েছেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৪০৮, তিরমিজি, হাদিস নং- ৩৭৮৮)

CamScanner

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মূলধারার সুন্নী উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে বেশিরভাগ নিরব। আহলে বায়তে আতহারের আলোচনাকে নিচে ফেলার জন্য এখন বেশিরভাগ উলামা গদিরে খুম ও আহলে বায়ত পাক পাঞ্জাতনের আলোচনা করেন না। আর তাদের ভয় এই যে, এটা নিয়ে আলোচনা করলে খেলাফাতের বিষয়ে ঝামেলা চলে আসবে। আসলে সুন্নী অনেক আলীম নিজেরাই ক্লিয়ার না বিষয়টিতে। মাওলা আলীর মাওলাইয়াত, ইমামাত ও বেলায়াতকে খেলাফাতের সাথে মেশানোর কোন সুযোগ নেই। খেলাফাত ভিন্ন বিষয়, এটা প্রিয় নবীজি (ﷺ) সাহাবাগণের ওপরে ছেড়েছেন। ওয়া শাবিরহুম ফিল আমর", ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম। (আল কুরআন) সেই পরামর্শ বা শুরার ভিত্তিতেই পরবর্তী চার খলিফা পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন। মাওলা আলীর মাওলাইয়াত, ইমামাত ও বেলায়াত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয় যা উনার সন্তান ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে কেয়ামতের আগে। যুগের ইমাম উনার বংশ থেকেই হবেন। আর খেলাফাত মুসলমান মেজরিটির মতামতের ভিত্তিতে।

আজ নাসিবি নাজদি সৌদি টাকা খরচ করে মোল্লাদের মাথা নষ্ট করেছে যে, আহলে বায়তের আলোচনা করা যাবে না। কারণ তাদের মনের হিংসা। আহলে বায়তের আলোচনা হলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। আরো বহু রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণও আছে।

এজন্য আমাদের অজ্ঞানতাও দায়ী। অপরদিকে শিয়াদের কুসংস্কার, বিদয়াতি মনগড়া কথা ও কাজ, বাড়াবাড়ি ও উগ্রতাও বহুলাংশে দায়ী। প্রথম তিন খলিফা ও উম্মাহাতুল মুমিনিনগণকে শিয়ারা যা ইচ্ছা তা বলে। এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেক সুন্নি মৌলানারাও আহলে বায়ত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন।

আমাদেরকে কৌশলে বুঝানো হয়েছে যে, আহলে বায়ত পাক পাঞ্জাতন হচ্ছে শিয়াদের আলোচনার বিষয়।

পরিশেষে মজার বিষয়, গদিরে খুমের এই ডিক্লেয়ারেশনের পর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. প্রথম সাহাবী যিনি হযরত আলী রা. কে অভিনন্দন জানান এই বলে, হে আলী! তুমি সকল মুমিন মুমিনের মাওলা হয়ে গেলে। - মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং ১৮৫০২।

শেষ একটা কথা বলি, আমাদের সালফে সালিহিনের মাঝে আহলে বায়তের কত প্রেম ছিল তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

১. ইমাম নাসাইকে মাওলা আলীর শানে ফাযায়েলে আলী কিতাব লেখার কারণে দামেশকের মসজিদে পাথর মেরে মেরে শহিদ করে নাসিবি আহলে বায়ত বিদ্বেষীরা।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. এজিদকে কাফির ফতোয়া দেন।

৩. ইমাম আজম আবু হানিফা রাহ. উমাইয়া খবিসদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ১০,০০০ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন আব্বাসিয়দের কাছে।

ইমাম শাফিই রাহ. বলেছিলেন, নবীজির (ﷺ) আহলে বায়তকে ভালোবাসলে যদি রাফিজি হয়, তবে মানব ও জীন জাতি জেনে রাখুক আমি রাফিজি।

অনেকেই ইমাম শাফিই রাহ. এর এই শেরের রেফারেন্স চেয়েছেন তাদের জন্যঃ

إن كان "رَفْضاً" حُبُّ آلِ محمدٍ
فلْيَشْهَدِ الثقلانِ انّي رافضي

مناقب الشافعي للبيهقي ٢ / ٧١] و [طبقات الشافعية للسبكي ١ / ٢٩٩] و [معجم الأدباء لياقوت الحموي ١٧ / ٣٢٠

তথ্যসূত্র : মানাকিবুশ শাফিই, লেখক: ইমাম বাইহাকি ২/৭১, তবকাতুশ শাফিইয়াহ, লেখক: ইমাম সুবকি ১/২৯৯, মুজামুল উদাবা ১৭/৩২০

মাওলা আলী রা. গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক

মাওলা আলী আলাইহিস সালাম কোন সময়ই খেলাফাত দাবি করেন নি। অনেক সাহাবা ছিলেন যারা তাঁকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। তাঁরা প্রথম খলিফা নির্বাচনের সময় থেকেই মাওলা আলীকে খলিফা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তবে সেই সংখ্যা অনেক কম ছিল। তন্মধ্যে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু জর গিফফারি, আবু মুসা আল আশয়ারি, সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহুম জামিয়ান প্রমূখ অন্যতম। কিন্তু ছাকিফা বানি সায়ি'দাতে সাহাবায়ে কেরামের মেজরিটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা মনোনীত করেন। সেখানে খলিফা হিসেবে আরেক আনসার সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে উবাদার রা. নামও প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য বজায় রেখে কুরআন প্রণীত সিদ্ধান্ত শুরার মাধ্যমে, অধিকাংশ সাহাবাগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যোগ্য হিসেবে প্রথম খলিফায়ে রাসূল (ﷺ) নির্বাচিত হন। সবাই তাঁর হাতে বায়য়াত নেন।

মাওলা আলী আলাইহিস সালাম হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) র দাফন কাফনজনিত ব্যস্ততা এবং খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমাতুজ জাহরা আলাইহাস সালামের অসুস্থতার কারণে সাথে সাথে বায়য়াত না নিতে পারলেও পরবর্তীতে যথা সময়ে বায়য়াত নেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। তৎপরবর্তীকালে হযরত ওমর এবং ওসমান রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমার হাতেও মাওলা আলী আলাইহিস সালাম বায়য়াত নেন। ২৫ বছর পর্যন্ত খেলাফাত ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে সাধ্যানুযায়ী প্রথম তিন খলিফাকে সাহায্য করেন এবং মসজিদে নববীতে তাঁদের পেছনে নিয়মিত নামাজ আদায় করেন।

হযরত ওমর রা. তো এজন্য বলেই গেছেন, লাওলা আলীয়ুন লাহালাকা ওমার। আলী না থাকলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।

হযরত সিদ্দিকে আকবর রা., ফারুকে আযম ওমর রা. ও উসমান গণী রা. তিনজনেই বয়সে অনেক প্রবীণ ছিলেন মাওলা আলীর চাইতে। যদি তরুণ মাওলা আলী রা. প্রথম খলিফা নির্বাচিত হতেন, তবে এই মহান তিন খলিফার খিলাফাত থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম, তাই প্রথম তিনজন আগে আসা উম্মাহ্'র জন্য পরম রহমত হয়েছে।

সিদ্দিকে আকবরের রা. বায়াতের পরপরই মাওলা আলীর রা. কাছে কয়েকজন সাহাবা এসে বায়াত গ্রহণ করতে চাইলে, মাওলা আলী রা. তাদেরকে বললেন, "ফল পাকার আগে গাছ থেকে পেড়ে ফেলো না" অর্থাৎ, ইসলাম পরিণত হবে সব খলিফার হাত ধরে। প্রথম খিলাফাত শুরুর আগে পক্ষপাতিত্ব করে ফেলো না। আল্লাহ্ যথা সময়ে আলীর রা. খিলাফাতও প্রদান করবেন। মাওলা আলী রা. তিন খলিফার রা. কোন ধরনের অসম্মান বা সমালোচনা কিছুতেই বরদাশত করতেন না, এমনকি বেত্রাঘাতের শাস্তিও দিতেন। এবং প্রথম তিন খলিফার বিষয়ে কেউ বাজে কিছু বললেই তিনি প্রবলভাবে প্রতিবাদ করতেন।

এখানে রাফিজি শিয়ারা অনেক মনগড়া কিচ্ছা কাহিনী বানিয়ে বিশাল এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে। মাওলা আলী আলাইহিস সালামের সাথে প্রথম তিন খলিফার মনোমালিন্যের এক মনগড়া ইতিহাস রচনা করে ইসলামকে তারা দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু মাওলা আলী আলাইহিস সালাম এগুলো থেকে মুক্ত ছিলেন। এমনকি মাওলা আলী আলাইহিস সালামের শাহাদাতের পর হযরত ইমাম হাসানের রা. হাতে মুসলিম জাহানের মেজরিটি জনগণ (সিরিয়ার লোকজন ব্যাতীত) ইচ্ছাকৃতভাবে বায়াত নিয়েছে। মাওলা আলী আলাইহিস সালাম কাউকে খলিফা মনোনীত করে যান নাই।

البداية والنهاية/الجزء السابع/ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

كما قال البيهقي: عن الحاكم، عن الأصم، عن محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا أبو الحراب الأحوص بن جواب، ثنا عمار بن

زريق، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد قال:..... فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟

فقال: لا ولكن أترككم كما تركككم رسول الله (ﷺ. (

قالوا: فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا هملا؟.

أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني وتركتك فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم.

ইমাম বাইহাকি বলেন, সা'লাবা ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, (ইমাম আলীর ওপরে আঘাতের পর তাঁর আহত অবস্থায়) লোকজন বলল, "হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কী আপনার স্থলাভিষিক্ত কাউকে নিয়োগ করে যাবেন না?"

মাওলা আলী রা. বললেন, না। বরং আমি তোমাদেরকে সেরকম অবস্থায় রেখে যাব যেরকম অবস্থায় তোমাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখে গিয়েছিলেন।

মানুষজন বলল, আপনার প্রভূর সাথে যখন দেখা হবে তখন কি বলবেন, আমাদেরকে এরকম অবহেলিত রেখে যাচ্ছেন?"

মাওলা আলী রা. বললেন, আমি বলব, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের ওপরে খলিফা বানিয়েছিলেন আপনার মর্জি অনুযায়ী। অতঃপর আমার জান কবচ করেছেন, আমি আপনাকে তাদের জন্য রেখে আসলাম। আপনি যদি চান তাদের অবস্থার উন্নতি দান করবেন, আর যদি চান তাদের অবস্থার অবনতি করবেন। (তথ্যসূত্রঃ বেদায়া নেহায়া, ইমাম ইবনে কাসির, ৭ম খন্ড, পরিচ্ছেদঃ আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব রা.র শাহাদাত, বাইহাকি, মুসনাদ আহমদ, বাজ্জার, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং-৩৮২৫৩)

এমনকি আমির মুওয়াবিয়ার রা. সাথে ইমাম হাসানের রা. যে সন্ধি হয়েছিল সেই সন্ধির পাঁচটি শর্তের একটি শর্ত ছিল, আমির

মুয়াবিয়ার রা. শাসনামলের পর খেলাফাতের বিষয়টি শুরার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ এটাই ইসলামের সিস্টেম, কুরআনের সিস্টেম। ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম। ওয়া শাবিরহুম ফিল আমর। ইমাম হাসান রা. শর্ত দেননি যে, আপনার পর আমি হব খলিফা কিংবা ইমাম হোসাইন আমার ছোটভাই হবেন খলিফা। না, বরং শুরা কমিটির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জনগণ সিদ্ধান্ত নিবে। জনগণের হাতে খলিফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত তুলে দিতে চেয়েছেন। আর ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম ইয়াজিদের হাতে বায়য়াত নেন নাই এই কারণেই। কারণ ইয়াজিদের ক্ষমতায় আরোহণ সেই চুক্তির লংঘন ছিল। ইমাম হোসাইন রা. ও দাবি করেছেন, খলিফা নির্বাচন শুরার ভিত্তিতে হোক। সেই দাবির ওপরেই শহিদ হয়েছেন।

এখন এই যুগে এসে ইয়াজিদের নিয়োগকে বৈধতা দিতে গিয়ে কেউ যদি, ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চান যে, হযরত মাওলা আলী আলাইহিস সালাম বা উনার পাক আওলাদগণ কেউ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তবে সে আসলে আহলে বায়তের মর্যাদা ও স্তর সম্পর্কে অবগত নয়। এর চাইতে বড় বেয়াদবি খুব কম হতে পারে। যত বড় মৌলানাই হন আপনি আর যাই হন আপনি ভ্রান্তির মাঝে আছেন এবং নাসিবিয়াত আপনাকে পেয়ে বসেছে।

ইমাম হাসান ইবনে আলী (আলাইহিমাস সালাম) পঞ্চম খলিফায়ে রাশিদ: একটি অজানা সত্য

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) সহিহ হাদিসে ইরশাদ করেন,

الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون بعد ذلك ملكا

(আমার পর) খেলাফত (রাশিদাহ) ত্রিশ বছর থাকবে, অতঃপর বাদশাহী শুরু হবে

তথ্যসূত্রঃ

১. আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৬৪০, ৪৬৪৭

২. তিরমিজি, ২/৩৫

৩. সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং-১৫৩৫, ১৫৩৪

৪. মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং- ৫/২২০, ৫/২২১

৫. আলবানী, সিলসিলা সহিহা, ১/৭৪২

অর্থাৎ হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) র পর খেলাফাতে রাশিদা ৩০ বছর থাকবে অতঃপর বাদশাহী শুরু হবে। এখন আমরা যদি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ১১-১৩ হিজরি ২ বছর, ওমর ফারুক রা. এর ১৩-২৩ হিজরি ১০ বছর (৩ মাস বেশি), ওসমান গনি রা. এর ২৩-৩৫ হিজরি ১২ বছর (৯মাস বেশি) এবং মাওলা আলী রা. এর ৩৫- ৪০ হিজরি (৬ মাস কম) ৪ বছর ৬ মাস যোগ করি তাহলে খেলাফাতে রাশিদার সময়কাল পাই মোট ২বছর + ১০বছর ৩ মাস + ১২ বছর ৯ মাস + ৪ বছর ৬মাস = ২৯ বছর ৬ মাস। অর্থাৎ প্রথম চার খলিফার খেলাফাতের মেয়াদকাল কোনভাবেই ৩০ বছর পূর্ণ হয় না। ৬ মাস কম থেকে যায়।

আমরা আগের একটা আলোচনায় দলিল আদিল্লার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছি যে, প্রজাগণের বার বার অনুরোধ স্বত্তেও মাওলা আলী আলাইহিস সালাম প্রচন্ড আহত অবস্থায়ও তার খলিফা কাউকে মনোনয়ন করে যান নাই। বরং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাওলা আলীর শাহাদাতের পর ইমাম হাসান ইবনে আলী আলাইহিস সালামের হাতে বায়য়াত গ্রহণ করে।

[তথ্যসূত্রঃ বেদায়া নেহায়া, ইমাম ইবনে কাসির, ৭ম খন্ড, পরিচ্ছেদঃ আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব রা.র শাহাদাত, মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, বাইহাকি, বাজ্জার, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং- ৩৮২৫৩]

CamScanner

হযরত আমির মুওয়াবিয়া রা. এর সাথে সন্ধির মাধ্যমে খেলাফাতের দায়িত্ব ছাড়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম মুসলিম বিশ্ব শাসন করেন। এই ৬ মাস খেলাফাতে রাশিদার সময়কালে যোগ না করলে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সেই ৩০ বছর খেলাফাতে রাশেদার সময়কাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী কোনভাবেই পরিপূর্ণ হয় না। আর হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ভবিষ্যদ্বানী করেছেন আর তা পূর্ণ হবে না, তা হতেই পারে না।

তাই ইমাম হাসান রা. ইসলামি জগতের পঞ্চম খলিফায়ে রাশিদ। অতঃপর হযরত আমির মুওয়াবিয়া রা. থেকে মুলুকিয়াত বা বাদশাহীর শুরু।

ইমাম হোসাইন রা. কারবালার জমিনে কেন গিয়েছিলেন?

অনেকেই এই যুগে এসে কথা তুলেন, ইমাম হোসাইন রা. নাকি রাজত্বের জন্য কারবালাতে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি কুফার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ইয়াজিদের হাত থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিতে। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। কেন ইনি কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছিলেন এবং কুফায় যাওয়ার পথেই কারবালা প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হন সে বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝতে হলে, এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানতে ইমাম হাসান ইবনে আলী রা. এবং আমির মুয়াবিয়ার রা. মধ্যকার যে আপোষনামা হয়েছিল তা জানতে হবে।

ذكر أهل العلم أن الحسن بن علي اشترط على معاوية أن لا يعهد لأحد من بعده بالخلافة ، إنما يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.

"আহলে ইলমগণ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম হাসান ইবনে আলী রা. আমির মুয়াবিয়া রা. কে শর্ত দিলেন যে, আপনি কাউকে আপনার

পর ওয়ালিউল আহদ বা ক্রাউন প্রিন্স (হবু খলিফা) বানিয়ে যেতে পারবেন না। বরং তা হবে মুসলমানদের মধ্যকার শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদের মাধ্যমেঃ

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:

"ولما تصالحا كتب به الحسن كتابا لمعاوية صورته:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذا ما صالح عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان:

صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين ، على أن يعمل فيهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ، وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين

ইবনে হাজার হাইতামী রাহ. উল্লেখ করেন, যখন দুজনের মাঝে সুলহ বা আপোষ হলো, ইমাম হাসান রা. মুয়াবিয়া রা. কে একটা চিঠি লিখলেন, যা নিম্নরুপঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটা ইমাম হাসান ইবনে আলী ও মুয়াবিয়ার রা. মধ্যকার সুলেহনামা বা আপোষনামা। (শর্তগুলো নিম্নরুপঃ)

১. ইমাম হাসান রা. আমির মুয়াবিয়া রা. কে রাজত্ব হস্তান্তর করে দেবেন। কিন্তু আমির মুয়াবিয়া রা. রাজত্ব পরিচালনা করবেন কুরআন মাজিদ ও প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাতের মাধ্যমে এবং খুলাফায়ে রাশিদিন মাহদিয়্যিনের আদর্শ অনুযায়ী চলবে।

وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين

২. মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. কোনভাবেই উনার পর কাউকে ওয়ালিউল আহদ" বা ক্রাউন প্রিন্স (হবু খলিফা) বানিয়ে

যেতে পারবেন না। বরং তা হবে মুসলমানদের মধ্যকার শুরা বা পরামর্শ পরিষদের মাধ্যমে।

وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعالى ، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا

৩. মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যমে বসবাস করবে তারা আল্লাহর দুনিয়ায় যে যেখানেই থাকুক। সিরিয়াতে থাকুক, ইরাকে থাকুক, হেজাজে থাকুক, ইয়েমেনে থাকুক।

৪. বিশেষ করে মাওলা আলীর সাথী ও শিয়ারা শান্তি ও নিরাপদে থাকবে, তাদের জান, মাল এবং স্ত্রী সন্তান নিরাপদে থাকবে যেখানেই থাকুক তারা।

(বি: দ্রঃ- এখানে বিশেষ লক্ষ্যনীয় শব্দ, মাওলা আলীর শিয়া হক ও স্বীকৃত, কিন্তু কুফার বিশ্বাসঘাতক আজাদারি শিয়া যারা কারবালাতে ইমাম হোসাইন রা. কে চোখের সামনে পরিবার পরিজনসহ শহীদ হতে দিয়েছে, পরে অনুশোচনা থেকে নিজেদেরকে প্রতিবছর মুহাররম মাস আসলেই ক্ষতবিক্ষত করে তারা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার শিয়া বাতিল)।

وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه ، وأن لا يبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة سرا ولا جهرا ، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق.

৫. এসব বিষয়ে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. আল্লাহর কসম নিলেন এবং অংগীকার করলেন যে, তিনি ইমাম হাসান এবং তাঁর ভাই হোসাইন রা. অথবা আহলে বায়তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন না। এবং তিনি তাঁদের কাউকে কোথাও ভয় দেখাবেন না।

أشهد عليه فلان ، وفلان بن فلان ، وكفى بالله شهيدا

এর ওপর স্বাক্ষ্য থাকলেন অমুক অমুক অমুক। আর আল্লাহ পাকই উত্তম স্বাক্ষী।

انتهى من"الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة" (٢ /٣٩٩.)

وانظر كتاب :"الحسن بن علي رضي الله عنه" للدكتور الصلابي (ص٢٥٣).

তথ্যসূত্রঃ

১. আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ইমাম ইবনে হাজার হাইতামি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৯৯.

২. ইমাম হাসান ইবনে আলী রা., ড. আস সাল্লাবি, পৃষ্ঠা নং-২৫৩।

এখানে এই সন্ধির ২ নং পয়েন্টটি লক্ষ্য করুন সেখানেই সকল প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে। এটাই ইসলামের সিস্টেম, কুরআনের সিস্টেম। ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম। ওয়া শাবিরহুম ফিল আমর।

ইমাম হাসান রা. শর্ত দেননি যে, আপনার পর আমি হব খলিফা কিংবা ইমাম হোসাইন আমার ছোটভাই হবেন খলিফা। না, বরং শুরা কমিটির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জনগণ সিদ্ধান্ত নিবে। জনগণের হাতে খলিফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত তুলে দিতে চেয়েছেন।

আর ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম ইয়াজিদের হাতে বায়য়াত নেন নাই এই কারণেই। কারণ ইয়াজিদের ক্ষমতায় আরোহণ সেই চুক্তির সুস্পষ্ট লংঘন ছিল। ইমাম হোসাইন রা. দাবি করেছেন, খলিফা নির্বাচন শুরার ভিত্তিতে হোক। সেই দাবির ওপরেই শহিদ হয়েছেন।

CamScanner

কারবালার জমিনে ইমাম হোসাইনের জীবনের শেষ জ্বালাময়ী ভাষণ

ইমাম হোসাইন রা. তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে কী বলেছিলেন? ৬১ হিজরির ১০ই মুহাররম শুক্রবার ফোরাতের তীরে কারবালার ময়দানে সিনা টান করে সেদিন ওমর ইবনে সাদ, শিমার, ইবনে জিয়াদসহ সকল ইয়াজিদ সৈনিকের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন বলেছিলেন,

"হে (২০,০০০) ইয়াজিদি সৈনিকেরা! তোমাদের মধ্যে কী একজনও মুসলমান নেই?"

তোমরা কী জান না যে আমি এবং আমার ভাই হাসান জান্নাতের যুবকদের সর্দার? তোমরা কী জাননা যে আমরা দুই ভাই আমাদের নানাজানের কলিজার টুকরা ছিলাম? তোমরা কী জাননা যে আমাদের নানাজান বলে গেছেন, আমার হাসান হোসাইন জান্নাতের দুটো ফুল। তবে কেন তোমরা আমাদেরকে শহীদ করার জন্য ওঠে পড়ে লেগেছ? তোমরা কী জাননা যে, আমরা দুই ভাই কাল হাশরের দিনে হাউজে কাউসারের কাছে আমার নানাজীর দুই পাশে বসা থাকব। আমরা দুই ভাই উম্মতকে কাওসারের পানি পান করাব। নবীজির (ﷺ) নাতিকে শহীদ করে তোমরা কাল হাউজে কাওসারের পানি পাবে তা কীভাবে আশা কর?

প্রিয় পাঠকেরা! দ্বীন দরদী ভাই ও বোন আমার! ইমাম হোসাইন রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন সেদিন, তোমাদের মধ্যে কী একজনও মুসলমান নেই?

তারা তো বেশভূষায় মুসলমানই ছিল প্রিয় পাঠক! তাদের সুন্নতী দাড়িও ছিল, পাগড়িও ছিল, টুপিও পড়ত, লেবাসও ছিল সুন্নতি, কারবালার ময়দানে তারাও নামাজ পড়েছে আজান-ইকামাতের মাধ্যমে। তারাও আল্লাহু আকবার তাকবির দিয়েছে। বাহ্যিক ইসলামের সবই ছিল তাদের মাঝে। তবুও ইমাম হোসাইন তাদের

উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কী একজনও মুসলমান নেই?"

কারণ কী? কোন একটা জিনিস ছিল না তাদের মাঝে?

তারা এমন মুসলমান ছিল, তারা এমন নামাজী আর এমন ইবাদাতকারী ছিল, আহত বিধ্বস্ত পড়ে থাকা ইমাম হোসাইনের রা. শরীর মুবারকের দিকে ইশারা করে যারা একজন আরেকজনকে বলছিল, জলদি জলদি ইমাম হোসাইনের মাথা শরীর থেকে আলাদা করে নিয়ে চল। আসরের নামাজের সময় যায় যায়! নামাজ কাজা হয়ে যাচ্ছে!

হায়রে নামাজী! হায়রে মুত্তাকি!

নবীজির (ﷺ) প্রেম ছাড়া কোন ইবাদাত নেই, নবীজির (ﷺ) আহলে বায়তের প্রেম ছাড়া কোন ইবাদাত নেই।

পাক পাঞ্জাতনের ভালোবাসা অন্তরে না নিয়ে কাল কেয়ামত পর্যন্ত সেজদা দিয়ে পড়ে থাকলেও মুক্তি তোদের নসিবে জুটবে না রে নরাধম পাপাত্মা এজিদের দল!

হোসাইনিয়াত ও ইয়াজিদিয়াত: কেয়ামত পর্যন্ত বহমান দুটো বিপরীত ধারার চেতনার নাম

ইমাম হোসাইন রা. একটা চেতনার নাম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন,

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

"ভাল ও মন্দ এক সমান নয়।" (সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং- ৪১)

হোসাইনিয়াত হচ্ছে উত্তমতার নাম, আর ইয়াজিদিয়াত হচ্ছে অধমতার নাম, নিকৃষ্টতার নাম। এই দুটো কোন সময় এক হৃদয়ে বাসা বাঁধতে পারে না। আমাদের মধ্যে হয়ত হোসাইনিয়াত থাকবে আর না হয় ইয়াজিদিয়াত থাকবে।

Husainiyat is a philosophy, husainiyat is a consciousness. Its a feelings which we have to implement in our personal life, family life and social life.

অন্যায়ের সাথে আপোষ না করার নাম হোসাইনিয়াত।

অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের কাছে নতি স্বীকার না করার নাম হোসাইনিয়াত। জুলুমের বিরুদ্ধে সিনা টান করে দাঁড়ানোর নাম হোসাইনিয়াত। নিজের ভেতর থেকে ইয়াজিদিয়াতকে বের করে দেয়ার নাম হোসাইনীয়াত। ইয়াজিদ যদি ভেতর থেকে বের হয়ে যায় তবেই সে অন্তরে হোসাইনের জায়গা হয়।

ইয়াজিদীয়ত কী? ইয়াজিদিয়াত হচ্ছে দুনিয়া লোভের এক মূর্ত প্রতীক। Yazidiyat is the synonym of illegal way of earning money and power. Yazidiyat is the synonym of arrogance, envy and greed. হালাল পথে সম্পদ অর্জন কোন গোনাহের কাজ নয়, কিন্তু টাকা পয়সার অবৈধ লোভ, ক্ষমতার লোভ, যে কোন কিছু করেই হোক আমাকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এর নামই ইয়জিদিয়াত। যদি দ্বীনের নবীজির (ﷺ) কলিজার টুকরো নাতিকেও জবাই করতে হয় করব, কিন্তু দুনিয়ার ক্ষমতা আর সৌর্য-বীর্য আমার লাগবেই। আমার কবরের চিন্তার প্রয়োজন নেই, আমার হাশরের চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমার হাউজে কাওসারের পানির প্রয়োজন নেই। এরকম নিকৃষ্ট চিন্তা চেতনার নামই হচ্ছে ইয়াজিদিয়াত।

ইমাম হোসাইন রা. উনার জীবনের শেষ ভাষণে কী বলেছিলেন? ফোরাতের তীরে কারবালার ময়দানে সিনা টান করে সেদিন ওমর ইবনে সাদ, শিমার, ইবনে জিয়াদদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

"হে (২০,০০০) ইয়াজিদি সৈনিকেরা! তোমাদের মধ্যে কী একজনও মুসলমান নেই?"

প্রিয় পাঠক! এই একই কথা ইমাম হোসাইন রা. বোন সায়্যিদা জয়নব দামেশকে ইয়াজিদের দরবারে বলেছিলেন।

সায়্যিদা ফিজ্জা ছিলেন হজরতে ফাতেমাতুজ জাহরার রা. হাবশী (বর্তমান ইথিওপিয়ান) দাসী। সারাজীবন মা ফাতেমার সেবা করেছেন। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর যখন ইমাম জয়নুল আবেদিন, সায়্যিদাহ জয়নবসহ আহলে বায়তের বেঁচে থাকা সকল সদস্যকে কয়েদী বানিয়ে ইয়াজিদের দরবারে পেশ করা হলো, সেসময় তাঁদের সাথে এই সায়্যিদা ফিজ্জাও ছিলেন, তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু আহলে বায়তকে ছেড়ে থাকতে পারেন নি।

অভিশপ্ত ইয়াজিদ সায়্যিদাহ জয়নব ও ইমাম জয়নুল আবেদিনের প্রতি কয়েদীসুলভ আচরণ শুরু করল।

সায়্যিদা ফিজ্জার রা. তা দেখে সহ্য হলো না। ওঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "রে বদবখত ইয়াজিদ! তুই যাদেরকে কয়েদি মনে করে দুর্ব্যবহার করছিস তারা দুনিয়া আখিরাতের বাদশা। তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ কর।"

ইয়াজিদ কালো কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী দাসী সায়্যিদা ফিজ্জার রা. জবানে পাক থেকে এরকম কথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠল। সে তার সামনের দুই প্রহরীকে আদেশ করল এক্ষুনি এই বুড়ি মহিলার গর্দান উড়িয়ে দাও। সৈনিক দুজন উদ্যত হলো সায়্যিদা ফিজ্জা রা. কে আঘাত করবে। ইয়াজিদের দরবারে উপস্থিত ২০০ কালো কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী সৈনিক তলোয়ার বের করে ফেলল। সাবধান! এই বুড়ি

মহিলা আমাদের দেশের বাসিন্দা। হাবশার বাসিন্দা। এই মহিলাকে আক্রমণ করা হলে একটা মাথাও দেহে থাকবে না।"

ইয়াজিদের ঐসকল কৃষ্ণাঙ্গ প্রহরী ও সৈনিকদের মধ্যে নিজ দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা জেগে ওঠল।

এই দৃশ্য দেখে সায়্যিদা জয়নব রা. ওঠে দাঁড়ালেন, মদীনা শরিফের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়া হাবিবাল্লাহ! ওহ আমার নানাজী! আজ এখানে আমার আম্মাজানের দাসী ফিজ্জার জান মাল ইজ্জতের হেফাজতের জন্য ২০০ মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে।

ওহ আমার নানাজী! আপনার খান্দান উজাড় করে দিল এই ইয়াজিদের দল। কিন্তু আপনার উম্মতের মাঝে আজ কেউ নেই যে আপনার খান্দানের জান মাল ইজ্জত রক্ষার জন্য দাঁড়াবে।

দরবারের সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কী একজনও নবীর আশিক নাই? একজনও কী আহলে বায়তের প্রেমিক নাই? আমার নানাজীর পরিবারের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য কী তোমাদের মধ্যে একজন মুসলমানও নাই?" হায়রে মুসলমান! হায়রে মুসলমান!

ইমাম হোসাইন রা. কারবালার জমিনে শেষ ভাষণ দিচ্ছেন, হে (২০,০০০) ইয়াজিদি সৈনিকেরা! তোমাদের মধ্যে কী একজনও মুসলমান নেই?

তোমরা কী জান না যে আমি এবং আমার ভাই হাসান জান্নাতের যুবকদের সর্দার? তোমরা কী জাননা যে আমরা দুই ভাই আমাদের নানাজানের কলিজার টুকরা ছিলাম? তোমরা কী জাননা যে আমাদের নানাজান বলে গেছেন, (আমার হাসান হোসাইন জান্নাতের দুটো ফুল) তোমরা কী জাননা আমরা দুই ভাই কাল হাশরের দিনে হাউজে কাউসারের কাছে আমার নানাজীর দুই পাশে বসা থাকব। আমরা দুই ভাই উম্মতকে কাওসারের পানি পান করাব। নবীজির

(ﷺ) নাতিকে শহীদ করে তোমরা কাল হাউজে কাওসারের পানি পাবে তা কীভাবে আশা কর?"

প্রিয় পাঠক! হোসাইনিয়াত হচ্ছে একটা চেতনার নাম।

মন্দকে ত্যাগ করা ও ভালকে গ্রহণ করার নাম হোসাইনিয়াত।

প্রতিদিন হোসাইনীয়াত ও ইয়াজিদিয়াত আপনার দরজায় কড়া নাড়বে, অপশন আপনার কাছে থাকবে আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন। যদি হোসাইনিয়াতকে গ্রহণ করেন তবে আপনি জান্নাতী, আর যদি ইয়াজিদিয়াতকে গ্রহণ করেন তবে আপনি জাহান্নামী! ইখতিয়ার আপনার।

আপনি যদি সরকারী চাকুরী করেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নেয়ার সুযোগ আছে, আপনি নেন না। আপনি খাঁটি হোসাইনী।

আপনি বেসরকারী ফার্মে জব করেন। ছয় নয় করে লাখ লাখ টাকা আপনি কামাতে পারেন। কিন্তু সেই রাস্তায় যান না। ছেড়ে দিলেন সেই কাজ টিকতে না পেরে। আপনি খাঁটি হোসাইনি মুসলমান।

একটু যদি কম্প্রমাইজ করে নিতেন ইমাম হোসাইন রা. আর বলতেন, যা ইয়াজিদ! তুই জালিমকেই মেনে নিলাম খলিফা। তাহলে কী ইমাম হোসাইন দুনিয়াতে বেহেশতী জীন্দেগী যাপন করতে পারতেন না? পারতেন। কেন কম্প্রোমাইজ করলেন না? নানাজীর দ্বীন কে বাঁচাতে। একটা উদাহরণ কায়েম করতে। ইমাম হোসাইন রা. যদি কারবালার জমিনে জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ না তুলতেন, তবে কাল কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার ও জুলমের বিরুদ্ধে কেউ আওয়াজ ওঠাত না।

অনেকেই বলে, ইমাম হোসাইন রা. এবং তাঁর পরিবার পানির অভাবে কারবালাতে শহীদ হয়েছেন। আরে পানি তো একটা বাহানা ছিল মাত্র। খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি সাঞ্জরি রাহ. বলেন, অবুঝরা বলে ইমাম হোসাইন পানির অভাবে শহীদ হয়েছেন।

আরে নাদানো! আমি মুইনুদ্দিন ইমাম হোসাইনের আদনা একজন গোলামের গোলাম, আমি মুইনুদ্দিন যদি কারাবালার ময়দানে পা দিয়ে আঘাত করতাম তবে শত শত নদী বয়ে যেত। আর তিনি তো ছিলেন কে? ইমাম হোসাইন। দ্বীনের নবীজির (ﷺ) নাতি। সেই দ্বীনের নবী। রাহমাতুল্লিল আলামীন! বুখারী শরিফে হাদিস এসেছে, আঙুল মুবারক ডুবিয়ে দিয়েছেন, শত শত মানুষ অল্প পানি দিয়ে অজু গোসল করেছেন, আঙুল মুবারক থেকে নহর বয়ে গেছে। সেই নানাজীরই তো নাতি।

সম্মানিত পাঠক! হোসাইনিয়াত এমন একটা চেতনার নাম যেই চেতনা ধারণ করলে বর্শার আগায় থেকেও নামাজ আদায় করতে হয়, তীরের টার্গেটে থেকেও নামাজ ছাড়া যায় না। নামাজ কাজা করতে পারবেন না।

আর ইয়াজিদিয়াত কী জিনিস? ৬১ হিজরির ১০ মুহাররম কারবালার ময়দান আসরের সময় ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। ৩৫ টি বর্শার আঘাত, ৩৩ টি তীরের আঘাত, অনেকগুলো তরবারির আঘাতে ইমামের শরীর জর্জরিত। নিথর দেহ মুবারক পড়ে আছে।

ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী বলছে, জলদি জলদি হোসাইনের মাথাটা কেটে নাও আসরের নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে।

হায়রে নামাজি!! হায়রে ইবাদাতকারী।

লানত তোদের মত ইবাদাতকারীদের ওপর।

নামাজ দুই পক্ষতেই ছিল।

প্রিয় পাঠকেরা! দ্বীন দরদী ভাই ও বোন আমার! ইমাম হোসাইন রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কী একজনও মুসলমান নেই?

তারা তো বেশভূষায় মুসলমানই ছিল প্রিয় পাঠক! তাদের সুন্নতী দাড়িও ছিল, পাগড়িও ছিল, টুপিও পড়ত, লেবাসও ছিল সুন্নতি, কারবালার

ময়দানে তারাও নামাজ পড়েছে আজান-ইকামাতের মাধ্যমে। তারাও আল্লাহু আকবার তাকবির দিয়েছে। বাহ্যিক ইসলামের সবই ছিল তাদের মাঝে। তবুও ইমাম হোসাইন তাদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কী একজনও মুসলমান নেই?"

কারণ কী? কোন একটা জিনিস ছিল না তাদের মাঝে?

নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা, নবীজির (ﷺ) প্রেম। নবীজির (ﷺ) আহলে বায়তের ভালোবাসা। পাক পাঞ্জাতনের ভালোবাসা।

প্রিয় পাঠক! এখনো কী এমন নামাজি ও রোজাদার নাই আমাদের সমাজে?

শুক্রবার আসলে এই বাংলাদেশেই মিম্বরের মাঝে ইয়াজিদ বন্দনা হয়। ইয়াজিদের নামের শেষে মায়াজাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমনকি রাদিয়াল্লাহু আনহুও বলে অনেকে।

বাংলাদেশে হাজার হাজার মসজিদে খবর নিয়ে দেখুন পুরো মুহাররম মাসে আহলে বায়ত, পাঞ্জাতন, কারবালার কোন আলোচনাই নেই। সেই ইয়াজিদের দল আজও আছে। যারা আহলে বায়ত চিনে না। যারা কারবালার ঘটনা আলোচনা করে না।

আর যা ও কিছু মসজিদে আলোচনা হয় কিছু কিছু আছে বলে কী জানেন? ইমাম হোসাইন রা. এর শাহাদাতে ইয়াজিদের কোন দোষ ছিল না। এটা তার পাপাত্মা সেনাপতি ইবনে জিয়াদের কাজ। ইয়াজিদ ভাল ছিল। সে তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কন্সটান্টিনোপল বিজয়ী দলের সদস্য। মায়াজাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ।

আচ্ছা তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, কারবালার নির্মম ঘটনা ইবনে জিয়াদ, শিমার ও ওমর ইবনে সা'দের কাজ। তো ইয়াজিদ কারবালার এই ঘটনা জানার পর ঐ পাপিষ্ঠদেরকে শাস্তি কী দিয়েছিল? কিছুই না। স্বপদে বহাল ছিল সবাই। উল্টো সবার প্রমোশন হয়েছিল। এটা কী প্রমাণ করে? কারবালার ট্রাজেডি ইয়াজিদের কাজ।

উল্টো ইমাম হোসাইনের শির মুবারক সামনে নিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সে কবিতা আবৃত্তি করছিল,

আজ আমার বদরের যুদ্ধে নিহত আত্মীয়রা (নানা ও মামা) দেখলে খুশি হয়ে যেত।

সেই পাপিষ্ঠ কবিতার সুরে সুরে বলছিল, বদরের যুদ্ধে মাওলা আলী ও আমির হামজার রা. হাতে নিহত, তার মামা ও নানার মৃত্যুর বদলা নিয়েছিল ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের মাধ্যমে।

সম্মানিত পাঠক! হোসাইনিয়াত এমন একটা আদর্শের নাম যেই আদর্শ ধারণ করলে আপনি শত্রুর সাথেও ভাল ব্যবহার করবেন।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

কারবালা সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর ইমাম জয়নুল আবেদিন দামেশকের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে মদিনা শরিফে ফিরে আসলেন। ইমাম আলী জয়নুল আবেদিনের রা. কাছে এক লোক আসল। এসে আশ্রয় চাইল। ইমাম আশ্রয় দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করলেন। ঐ মেহমানকে উত্তম খাওয়া দিলেন, উত্তম পোশাক দিলেন। সকল প্রয়োজন মেটালেন।

তিনদিন পর ঐ মেহমান বললেন, ইমাম আমাকে এখন অনুমতি দিন। ইমাম জয়নুল আবেদিন ঐ লোককে কিছু টাকা পয়সা দিলেন পথ খরচের জন্য।

সে বিদায় নিয়ে কিছুদূর চলে গেল, আবার ফিরে আসল। এসে বলল, ইমাম আপনি কী আমাকে আসলেই চিনতে পারেন নি? আমি তো ইয়াজিদের এক সেনাপতি । ইয়াজিদ আমার উপরে রাগ করে

আমার নামে ফরমান জারী করেছে, তাই আমি আপনার আশ্রয়ে আত্মগোপনে ছিলাম। ইমাম আমি সেই নরাধমদের একজন যারা আপনার আব্বাজানের ওপরে কারবালার ময়দানে তীর মেরেছে।

হায়রে ইমাম বংশ! শত্রুও বিপদে পড়ে আশ্রয় চাইতে ইমাম বংশের কাছেই আসে। হায়রে ইমাম বংশ!

একথা শুনে ইমাম জয়নুল আবেদিন বলে ওঠলেন, রে পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ সেনাপতি! আমি তোকে প্রথম দিনই চিনেছি। কারবালার তাবু থেকে শুয়ে শুয়ে আমি সবই দেখেছি।

ঐ ইয়াজিদ সেনাপতি আশ্চর্য হয়ে গেল। বলে ওঠল, আপনি আমাকে চিনেছেন কিন্তু তারপরও আমার সাথে এত উত্তম ব্যবহার করলেন এই তিনদিন?

ইমাম জয়নুল আবেদিন বলে ওঠলেন, কী করব বল! আমার নানাজী দ্বীনের নবীজির (ﷺ) আদর্শ যে এটাই। মেহমানের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। যে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানের সম্মান করে।

প্রিয় পাঠক এরই নাম হোসাইনিয়াত!

এজিদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে মদিনা শরিফে ফিরে এসে ইমাম আলী জয়নুল আবেদিন ইবনুল হোসাইন আলাইহিমাস সালাম দাস-দাসী ক্রয় করতেন। তাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন শিক্ষা দিতেন অতঃপর তাদেরকে মুক্ত করে দিতেন আল্লাহর ওয়াস্তে।

অনেক আলীম বলেছেন যে, তিনি এভাবে হাজার হাজার দাস-দাসীকে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে মুক্ত করে দেন। এরকমভাবেই ইমাম আলী জয়নুল আবেদিন ইবনুল হোসাইন আলাইহিমাস সালামের বাগানের একটি ফলই হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস সাকাফি যিনি ভারতে ইসলামের রাস্তা উন্মুক্ত করেন। ভারত এখন ইসলামের আলোর মাঝে সাতার কাটছে আর তা ইমাম আলী ইবনুল হোসাইন আলাইহিমাস সালামের অবদান।

CamScanner

এরই নাম হোসাইনিয়াত!

নিজেকে পবিত্র করার নাম হোসাইনিয়াত!

ভেতরের জগতকে পরিবর্তন করার নাম হোসাইনিয়াত!

মানবিক গুণ দিয়ে নিজেকে সাজানোর নাম হোসাইনিয়াত। পাশবিকতার অপর নাম ইয়াজিদিয়াত।

মদ ছিল ইয়াজিদের নিত্যসঙ্গী। অশ্লীলতা ছিল তার নিত্যসঙ্গী। নর্তকী নাচিয়ে বাদ্য-বাজনা ছিল তার নিত্যসঙ্গী। এগুলোই ইয়াজিদিয়াত। এগুলোকে ত্যাগ করতে হবে।

যোগ্য লোকের কাছে না ঝুকা ইয়াজিদিয়াত। arrogance. আমি কেন কারো কাছে নত হব? হোক সে নবীজির (ﷺ) নাতি। হোক সে জান্নাতের যুবকদের সর্দার। হোক সে আলাহর নবীজির (ﷺ) সবচাইতে প্রিয়। হোক সে আমার চাইতে মহাজ্ঞানী। আমি কারো কাছে ঝুকব না। এটাই ইয়াজিদিয়াত।

যোগ্য লোকের কাছে আত্মসর্পণের নাম হোসাইনী চেতনা।

কারবালার চেতনা: জেনারেল শিক্ষিত ভাই ও বোনদের করমকমলে আরজি!

এই যুগে মানুষের শারীরিক রোগের চাইতে আত্মার রোগের চিকিৎসা বেশি হওয়া উচিত। শারীরিক রোগে শরীর নষ্ট হয়, কিন্তু কলবি বিমারে আখিরাত নষ্ট হয়। আমি যদি সৈয়দ বংশের না হতাম এবং আলীম না হতাম তাহলে সারা বছর শুধু আহলে বায়ত নিয়েই লিখতাম ও কাজ করতাম, এটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হত। কারণ সৈয়দ বংশের বা আলীম কেউ আহলে বায়তে আতহার নিয়ে কথা বললে অনেকেই বলেন, ওহ! আহলে বায়তের নামে ব্যবসা শুরু হয়েছে!" নাউজুবিল্লাহ!

এই যুগে এসে এই উম্মত প্রিয়নবীর (ﷺ) জাহিরি সুন্নাহকে (অবশ্যই মানতে হবে প্রিয়নবীর (ﷺ) সুন্নাহ) যেভাবে আঁকড়ে ধরেছে সেভাবে যদি আহলে বায়তের মুহাব্বাত, আদর্শের অনুসরণ, আখলাককে ধারণ ও তাঁদের সাথে রুহানী সম্পর্ককে জোরালো করত তবে পৃথিবী অন্যরকম হত। মুসলমান জাতি সংখ্যায় ১৮০ কোটি হয়েও বাতিলের হাতে মার খেত না। এতটা চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনে যেত না।

আলোচনা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, আমরা অধিকাংশ মানুষের ভেতরেই আজ এই ইয়াজিদ বাসা বেঁধেছে, দুনিয়াবি কামনা-বাসনা ও লালসার মূর্ত প্রতিরুপ হচ্ছে ইয়াজিদ (লানাতুল্লাহি আলাইহি)। ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামকে ধারণের মাধ্যমেই সেই ইয়াজিদ আমাদের থেকে দূর হতে পারে। এজন্য আহলে বায়তের ভালোবাসার মিশন জিন্দাবাদ। কারবালার চেতনার মিশন জিন্দাবাদ। এই মিশনকে জোড়ালো করতে হবে, আপনি ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, ব্যবসায়ী হন, চাকুরীজিবি হন, শ্রমজীবি হন অথবা যেই পেশারই হোন না কেন। আরবী শিক্ষিতদের বাহিরের ভাই ও বোনেরা যেদিন আহলে বায়তের মিশনকে সঠিকভাবে ধারণ ও প্রচার করবেন সেদিন বড় পরিবর্তন আসবে ইন শা আল্লাহ। কারণ বর্তমান দুনিয়াতে পলিসি ম্যাকিং ও ইমপ্লিমেন্টেশন আপনারা করেন, জেনারেল শিক্ষিতরা। আমরা মোল্লারা তো শুধু থিওরিটিকাল ওয়াজ করি, সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রাক্টিক্যালি কোন কিছু বাস্তবায়ন করার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতা কোনটাই আমাদের হয়ে ওঠেনি।

আপনার সন্তানকে যদি "হোসাইনি সৈনিক" বানাতে চান!

প্রথমত: হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন,

عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ : عَلَى

حُبِّ نَبِيِّكُمْ ، وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ"

"তোমরা তোমাদের সন্তানকে তিনটি আমল শিক্ষা দাও। ১. তোমাদের নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা ২. তাঁর (তোমাদের নবীজি (ﷺ) পরিবার বা আহলে বায়তের ভালোবাসা ৩. কুরআনের শিক্ষা। নিশ্চয়ই কুরআনের বাহকরা সেদিন (হাশরের দিন) তাঁর ছায়ার নিচে নবীগণও আল্লাহর মনোনীতদের সাথে থাকবে যেদিন তাঁর ছায়া ভিন্ন আর কোন ছায়া থাকবে না।

এখন চিন্তা করুন। আল্লাহর নবী কাদের ভালোবাসার উপরে এবং শিক্ষার উপরে আমাদের সন্তানদেরকে বড় করতে বলেছেন, আর আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কাদের ভালোবাসার উপর বড় করছি, কিসের শিক্ষা আমরা তাদেরকে দিচ্ছি! আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দুনিয়া পাগলদের ভালোবাসার উপরে বড় করছি, যারা তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার আইকন, সেলিব্রেটি। আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের কাছে সন্তান মানুষ করার সংজ্ঞা হলো সন্তান টাকা উপার্জনের মেশিন হতে পেরেছে কি না। আদর্শ থাকলে থাকুক না থাকলে নাই, কি আসে যায়। ডাক্তার হোক ডাক্তার হয়ে দুহাতে টাকা কামাক, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দুহাতে টাকা কামাক, বি সি এস ক্যাডার হয়ে সরকারী চাকুরীতে যোগ দিক, ঘুষ খাবে না কি করবে তাতে কি আসে যায়। দুনিয়া তো বলবে আমার সন্তান মানুষ হয়েছে। বড় ব্যবসায়ী হোক কিন্তু যদি লোক ঠকায় তো ঠকাক তাতে কি, টাকাওয়ালা তো হচ্ছে।

কিন্তু মূল সমস্যা কী! প্রিয় প্রিয় নবীর (ﷺ) ভালোবাসা, তাঁর আহলে বায়তের ভালোবাসা এবং কুরআনের শিক্ষার উপরে যদি আপনার সন্তানকে না রাখেন তবে সেই সন্তান ডাক্তার হতে পারে ঠিক, কিন্তু সে নিজ স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে ঠিক তবে তার মাঝে আদর্শ থাকবে না, বি সি এস ক্যাডার হবে ঠিক

তবে সে ঘুষখোর হবে। তাই এই তিন জিনিসের উপর ছাড়া সন্তানকে মানুষ করার কোন বিকল্প রাস্তা নেই। প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা, তাঁর আহলে বায়তের ভালোবাসা এবং কুরআনের শিক্ষা হোক আমাদের পাথেয়।

দ্বিতীয়তঃ হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সন্তান ও নাতি-নাতনীদের সাথে যেরকম আচার ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদেরকে যে তরবিয়ত ও ভালোবাসা দিয়েছেন, সেই আদর্শে যদি আমরা মা-বাবা ও শিক্ষকরা সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে না পারি তবে এই সন্তান কোনদিনই হোসাইনী সৈনিক হতে পারে না। আমাদের সন্তানদের ৭ বছর হলে তাদরকে নামাজ পড়াতে ও ১০ বছর হলে নামাজের জন্য তাদেরকে কড়া শাসন করতে যেমন বলা হয়েছে ঠিক তেমনি তাদেরকে আদর করতেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আদর ও শাসন দুটোর মাঝে যেন ব্যালেন্স থাকে সেই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে।

আদর! সে কেমন আদর? তৎকালীন আরবে ছোট বাচ্চাদেরকে কাঁধে করে পুরুষরা রাস্তায় বের হবে এটাকে আইব বা খারাপ চোখে দেখা হত। পুরুষের অহমে আঘাত হিসেবে একে গণ্য করা হত। সেই যুগে প্রিয় নবীজি (ﷺ) ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন দুভাইকে দুই কাঁধে তুলে মদীনার পথে পথে ঘুরেছেন। ওমর রাঃ সেই দৃশ্য দেখে বললেন, হে হাসান হোসাইন! তোমরা কতই না ভাগ্যবান। কত উত্তম সওয়ার তোমরা পেয়েছ। প্রিয় নবীজি (ﷺ) মুচকি হেসে বলেছেন, হে ওমর শুধু সওয়ারই দেখলে। আমার হাসান হোসাইন কতই না উত্তম সওয়ারী সেটা দেখলে না!

ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন দুভাইকে কাঁধে চড়িয়ে প্রিয় নবীজি (ﷺ) জিজ্ঞেস করতেন "হে হাসান হে হোসাইন বল তোমাদের উট কেমন! বল তোমাদের উট কেমন!" ঠিক তেমনি তাঁদের আদরের বোন সায়্যিদা জয়নব বিনতে আলী রা. কেও প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাঁর কাঁধে চড়িয়েছেন, তাঁকে নিয়ে খেলেছেন। এখানে মেয়ে সন্তান ও

ছেলে সন্তানে কোন ভেদাভেদ করেননি। There was no gender discrimination at all.

মদীনার রাস্তায় প্রিয় নবীজি (ﷺ) ইমাম হাসান হোসাইনের আঃ সাথে ছোঁয়াছোঁয়ি খেলেছেন তাঁদের মনে আনন্দ দিতে। ছোঁয়াছোঁয়ির এক পর্যায়ে ইমাম হোসাইনকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, حسين مني وانا من الحسين হোসাইন আমা হতে আমি হোসাইন হতে।

মসজিদে নববীতে জামাতের সাথে নামাজ পড়ছেন প্রিয় নবীজি (ﷺ) শত শত সাহাবী সাথে নিয়ে, গেলেন সিজদায়। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল প্রিয় নবীজি (ﷺ) মাথা ওঠান না। এত দীর্ঘক্ষন সেজদায় কেটে গেল যে সাহাবাগণকে এক অজানা ভয় পেয়ে বসল, তবে কি সিজদাতে প্রিয় নবীজি.....! না না এ কী করে হয়! এক সাহাবী মাথা তুলে দেখলেন ইমাম হোসাইন প্রিয় নবীর (ﷺ) কাঁধে চড়ে আছেন তাই তিনি সেজদা থেকে ওঠছেন না। হায়! যদি আমার হোসাইন পড়ে গিয়ে ব্যাথা পায়। সাহাবী হাত দিয়ে সড়িয়ে দিতে চাইলেন ইমাম হোসাইনকে। নবীজি (ﷺ) তাঁকে হাত দিয়ে বাঁধা দিলেন, না! আমরা হোসাইনকে যত সময় ইচ্ছা আমার কাঁধে থাকতে দাও।।

সমগ্র দুনিয়া মিলাদে ক্বিয়াম করে (দরুদ ও সালাম পড়তে দন্ডায়মান হয়) আমার প্রিয় প্রিয় নবীর (ﷺ) জন্য। আর রাহমাতুল্লিল আলামীন নবী (ﷺ) কার জন্য ক্বিয়াম করতেন জানেন? (তাঁর কন্যা ফাতেমার (আঃ) জন্য।) আবু দাউদ শরীফে সহিহ হাদিসে এসেছে, মা আয়েশা সিদ্দিকা রা. বর্ণনা করছেন, যখনি ফাতেমা প্রিয়রনবীর (ﷺ) ঘরে আসতেন নবীজি (ﷺ) তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ওঠে গিয়ে মা ফাতেমার হাত দুটোতে চুমু দিতেন এবং মা ফাতেমাকে নিজে যে জায়গায় বসেছিলেন সেই জায়গায় বসাতেন। মা ফাতেমার ঘরে নবীজি (ﷺ) গেলে মা ফাতেমাও অনুরুপ করতেন।

এই ছিল তরবিয়তে নববী, নবীজির (ﷺ) শিক্ষা।

CamScanner

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যেই উত্তম নমুনা রয়েছে। (সূরা আহজাব, আয়াত নং-২১)

আর আমরা তো সন্তানকে সময়ই দিতে চাই না। টাকার পেছনে, সম্পদের পেছনে ছুটতে ছুটতে কখন যে সন্তান মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে যায় তা পরে একদিন খেয়াল হয়। কিন্তু ততদিনে যে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সন্তান তো ততদিনে বিপথে চলে গেছে। আর আজ তাকে আপনার সকল সময় দিয়ে দিলেও সে আর মানুষ হবে না। মনে রাখবেন প্রিয় নবীজি (ﷺ) মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, শেষ নবী ও রাসূল ছিলেন। তাঁর সময়ের মূল্য ছিল অপরিসীম। সেই তিনি যদি তাঁর পরিবার- স্ত্রী সন্তান, নাতি নাতনীকে সময় দিতে পেরেছেন তো আপনি আমি কোন ক্ষেতের মুলা! আমাদের সময় কি তাঁর সময়ের চেয়েও দামী! (নাউজুবিল্লাহ) তাই সময় থাকতে সন্তানকে সময় দিন। অসময়ে যত যাই করেন লাভ হবে না।

প্রিয় নবীজির (ﷺ) আহলে বায়তের (আলাইহিমুস সালাম) হিকমতের (প্রজ্ঞার) পরিচয়

একদা এক আলীম-উলামাগণের মাহফিলে প্রশ্ন উঠল যে, কোরআন শরীফের কে কোন আয়াত পড়লে নবীজির (ﷺ) গুনাহগার উম্মতের জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির সবচেয়ে বেশি আশা করতে পারেন? সেই মাহফিলে আহলে বায়ত অর্থাৎ নবী করিমের (ﷺ) পরিবারের অন্যতম প্রধান সদস্য হযরত ইমাম জাফর আস-সাদিক্ব ইবনে বাকির ইবনে আলী আল-জায়নাল আবেদিন ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (আলাইহিমুস সালাম) ও উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক উপস্থিত এক আলীম এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমি যখন এই

আয়াতখানা পড়ি তখন মুক্তির সবচেয়ে বেশি আশা করতে পারি, বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতখানা পাঠ করলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [আন নিসা - ৪৮]

অপর এক আলীম এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমি যখন এই আয়াতখানা পড়ি তখন মুক্তির সবচেয়ে বেশি আশা করতে পারি, বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতখানা পাঠ করলেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্তগুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [আয্-যুমার - ৫৩]

অতঃপর সবাই হযরত ইমাম জাফর আ-সাদিক্বস (আলাইহিস সালাম) কে প্রশ্ন করলেন, হে ইমাম আপনারা অর্থাৎ নবীজির (ﷺ) আহলে বায়ত বা নবীপরিবারের নিকট কোরআন শরিফের কোন আয়াত পড়লে নবীজির (ﷺ) গুনাহগার উম্মতের জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির সবচেয়ে বেশি আশা করতে পারেন?

হযরত ইমাম জাফর আস-সাদিক্ব (আলাইহিস সালাম) জবাব দিলেন, আমরা যখন এই আয়াতখানা পড়ি তখন নবীজির (ﷺ) গুনাহগার উম্মতের জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির সবচেয়ে বেশি আশা করি, বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতখানা পাঠ করলেন:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

(হে নবী) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি খুশি হবেন। [আদ দুহা - ৫]

আর নবী করিম (ﷺ) ততক্ষণ পর্যন্ত খুশি হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীজির একজন গুনাহগার উম্মতও দোজখে থাকবে। কাজেই আমরা নবীপরিবার যখন কোরআন শরিফের এই আয়াতখানা পড়ি তখন নবীজির (ﷺ) গুনাহগার উম্মতের জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির সবচেয়ে বেশি আশা করি।

সুবহানাল্লাহ।

ইয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন মহান আহলে বায়তের আদর্শ আর ভালোবাসা দিয়ে আমাদের অন্তর, আমাদের জীবনকে তুমি রওশন করে দাও। আমিন।

ইয়াজিদ কী কাফির ছিল না মুসলমান?

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করতে চাই। আমার মতে ইয়াজিদ ফাসিক, মুনাফিক ও কাফির, থ্রি ইন ওয়ান, একের ভেতরে তিন। বদকারদের লিস্টে তার মর্যাদা এত উর্ধ্বে যে, এই তিনটি ফতোয়াই তার প্রাপ্য। ইমাম আজম আবু হানিফা তাকে ফাসিক বলেছেন, যেহেতু সে গুনাহ করে গোনাহের ওপর অনুতপ্ত ছিল না। প্রকাশ্যে পাপাচার করত। কেউ বা আবার তাকে মুনাফিক বলেছেন, যেহেতু সে ঈমান এনেও নবীজির (ﷺ) নাতিকে শহীদ করেছিল, নামাজও পড়ত আবার নবুওয়াত অস্বীকারও করত। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. তাকে কাফির বলেছেন, কারণ সে সরাসরি নবুওয়াত অস্বীকার করেছে। তাই আমার মতে সে একাধারে ফাসিক, মুনাফিক এবং কাফির।

CamScanner

এখন আসুন কেন আমি তাকে কাফির বলছি তার দলিল কী?

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিচে ইয়াজিদ রচিত কবিতাটি পড়ুন যা সে ইমাম হোসাইনের রা. শির মুবারক সামনে নিয়ে গেয়েছিল: বিশেষ করে সর্বশেষ লাইনটি পড়ুন আর আপনিই বলুন সে কী কাফির ছিল না মুসলিমঃ

لیت أشیاخي ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من وقع الأسل

لأهلّوا واستهلوا فرحا *** ثم قالوا یا یزید لا تشل

قتلنا القرم من ساداتهم *** و عدلناه میل بدر فاعتدل

قد اخذنا من علي ثارنا *** وقتلنا الفارس اللیث البطل

لست من خندف إن لم انتقم *** من بني أحمد ما کان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا *** خبر جاء و لا وحي نزل

ইমাম হোসাইনের রা. মাথা মুবারক দামেস্কে আসার পর সারা রাত ইয়াজিদ মদ্য পান করে সকালে দরবারে উপস্থিত, মাতাল অবস্থায় মনের আসল কথা ও ঘৃনা প্রকাশ পায়, ইমাম হোসাইনের রা. শির মুবারক সামনে নিয়ে সে বলছে,

"বদর যুদ্ধে (আলী ও হামজা রা. কর্তৃক হত্যা কৃত) আমার মুরুব্বিরা যদি আজকের এই দৃশ্য দেখত,

তাহলে তারা খুশি হয়ে বলত হে ইয়াজিদ! তুই চালিয়ে যা, কখনো স্তব্ধ হয়োনা।

আমি প্রতিশোধ স্বরুপ তাদের (রাসূল বংশের) বড় বড় ব্যক্তিদের হত্যা করেছি আর বদর যুদ্ধের বদলা নিয়েছি।

বিশেষ করে আমি আলী থেকে বদলা নিয়েছি আর তার বাহাদুর সন্তানদের হত্যা করেছি,

আমি (আমার দাদী) হিন্দা এর ঔরসজাত নই যদি না আমি আহমদের আওলাদ থেকে বদলা না নিই,

মোহাম্মদ যা আমাদের সাথে করেছে (বদর ও অন্য যুদ্ধে),

আসলে বনী হাশিম (মোহাম্মদ) আমাদের সাথে রাজত্ব কেড়ে নেয়ার জন্য নাটক করেছিল,

সে কোনো নবী ছিলনা আর কোন কিতাব ও ওহীও নাজিল হয় নাই"।

ذكر الطبري في تاريخه ٨/١٨

العواصم من القواصم: ٢٣٢.

تاريخ الطبري ١٠ / ٦٠ (٢).

তথ্যসূত্রঃ

১. তারিখে ইবনে জারির তাবারি, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৮

২. তারিখে ইবনে জারির তাবারি, ১০ ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৬০

৩. আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ইবনে কাসির, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৮১, ইমাম হোসাইন রা. এর শির মুবারক পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে এনেছেন কবিতাটি। (বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ দেখুন)

৪. হাফিয ইবনু আসাকির তার তারিখে দামেশকে বিস্তারিত এনেছেন

৫. আল আওয়াসিমু মিনাল কাওয়াসিম,পৃষ্ঠা নং ২৩২.

প্রিয় পাঠক শেষ লাইনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন আর আপনিই সমাধান দিন, প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নবুয়াত, রেসালাত ও ওহীকে যে অস্বীকার করে সে মুসলমান হয় কোন ফিকহি মাযহাব মতে?

CamScanner

রে পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ পূজারীরা! তোদের রুহানী বাবা ইয়াজিদ যদি ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাতের নির্দেশ নাই দিয়ে থাকে এবং সে পবিত্র শির মুবারক সামনে নিয়ে তথাকথিত দুঃখে দুঃখিত হয়ে কেঁদেই থাকে, তবে সে কেন ইমাম হোসাইনের শির মুবারককে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দামেশকের রাস্তায় রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখল?

কেন সে সম্মানের সহিত অন্তত শির মুবারক সাথে সাথেই দাফন করে ফেলল না?

এসব কিছু কী ওমাইয়া ইয়াজিদের ভেতরের আহলে বায়ত বনু হাশিম তথা নবী বংশের প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ নয়? জুলুম, অন্যায় -অবিচার সমাজে কেন বাড়বে না যদি নবীজির (ﷺ) সুন্নাতি লেবাসের অন্তরালে তোরা সৌদি পেট্রোডলার খোর এত এত মৌলভি জুলুম সমর্থক থাকিস?

তথ্যসূত্র: বেদায়া নেহায়া, ইবনে কাসির, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮১, ইমাম হোসাইনের রা. শির অধ্যায়। (বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ)

জালিমের ঘরে আলীম পয়দা: লা'নতি ইয়াজিদের পুত্র হযরত মুয়াবিয়া-২ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর খুতবা

ইয়াজিদ (লা'নাতুল্লাহি আলাইহি) মারা যাওয়ার আগে তার বড়ছেলে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের জন্য বায়আত নেয় Crown Prince (তার মৃত্য পরবর্তী বাদশাহ্) হিসেবে। তার পুত্রের নাম ছিল তার পিতা সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আমির মুআবিয়ার রা. নামানুসারে, যে কারণে তাঁকে ইতিহাসে মুআবিয়া-২ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যাই হোক ইমাম ইবনে হাজার হায়তামি রাহ. তাঁর বিখ্যাত কিতাব আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা'র ১৩৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, যখন

হযরত আমির মুআবিয়ার রা. জালিম পুত্র ইয়াজিদ (লানাতুল্লাহি আলাইহি) ৬৪ হিজরি সনে (মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা গেল) তার নেককার টগবগে যুবক পুত্র তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হলেন। যদিও আমৃত্যু তিনি রোগী ছিলেন। খলিফা হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর হতে আর কোনদিন তিনি মানুষের সামনে বের হননি কোনদিন, নামাজের ইমামতিও করেননি এবং রাষ্ট্রীয় কোন কাজেও মাথা ঘামাননি কোনদিন। তাঁর খেলাফাতের সময়কাল ছিল, চল্লিশ দিন। কেউ বলেছেন, দুমাস, কেউ বলেছেন, তিন মাস। মাত্র ২০ কিংবা ২১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম ইবনে হাজার হায়তামি রাহঃ বলেন, তাঁর (মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের) নেককার হওয়ার প্রকাশ্য নমুনা ছিল এমন, তাঁকে যখন খলিফা মনোনীত করা হলো তখন তিনি মিম্বরে আরোহন করলেন এবং খুতবা দিতে শুরু করলেন, তিনি বলতে শুরু করলেন এই খেলাফাত আল্লাহর রশি। আমার দাদা হযরত আমির মুআবিয়া রা. এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও হক্বদার যিনি ছিলেন সেই হযরত আলীর (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) সাথে বিবাদ করলেন এই খেলাফত নিয়ে, অতঃপর যা করার তিনি আপনাদেরকে নিয়ে করলেন যা আপনারা সম্যক অবগত আছেন (এখানে তার খুতবার একটি লাইনের অনুবাদ আমি দিতে চাচ্ছি না, কারণ তা সাহাবীয়ে রাসূলের শানে যায় না, এ ব্যাপারে নিরব থাকাই শ্রেয় মনে করি), অতঃপর আমার পিতা (ইয়াজিদ লানাতুল্লাহি আলাইহি) তার গলায় এই খেলাফতের বেরী পড়ে নিল এবং সে এর সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল, সে এই খেলাফতের জন্য প্রিয় নবীজির (ﷺ) দৌহিত্রের সাথে বিবাদ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। সে তার কবরে চলে গেল তার পাপের বোঝা নিয়ে।

অতঃপর মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ কাঁদতে লাগলেন, বললেন, আর আমার উপরে এটা খুব কঠিন বিষয় যে, আমি আমার পিতার (ইয়াজিদ লানাতুল্লাহি আলাইহি) নিকৃষ্ট অবস্থা ও পরিণাম জেনে গেছি। কারণ সে প্রিয় নবীজির (ﷺ) পরিবারকে শহীদ করেছে,

CamScanner

মদপানকে জায়েজ করেছে, কা'বা শরিফে আক্রমন করেছে। আমি খেলাফাতের মধু ভোগ করি নাই তবে কেন আমি এর তিক্ততা ভোগ করব! তোমরা এই ব্যাপারে যা ভাল মনে কর তাই কর। আল্লাহর কসম, যদি দুনিয়া উত্তম হত তবে আমি তা থেকে আমার অংশ অবশ্যই বুঝে নিতাম। আর যদি দুনিয়ার লোভ খারাপ কাজ হয়ে থাকে তবে আবু সুফিয়ানের (হযরত আমির মুআবিয়ার রা: সাহাবী পিতা) বংশ তা থেকে যা নেয়ার তা যথেষ্ট পরিমানে নিয়ে নিয়েছে। এই কথা বলে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন অতঃপর চল্লিশ দিন পর ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহ তাঁর উপরে রহমত বর্ষণ করুন যিনি তার পিতার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং খেলাফাতের যোগ্য কারা ছিলেন তাও অনুভব করেছিলেন।

হায়রে জালিম ইয়াজিদ! আল্লাহর লা'নত তোর উপরে। কার জন্য কি করলি তুই? ৬১ হিজরি সনে ইমাম হোসাইন (আলাইহিস সালাম) র শাহাদাতের মাত্র ৩ বছর পরই ৬৪ হিজরি সনে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তুই জাহান্নামে চলে গেলি। তোর মনোনীত খলিফা পুত্র মুআবিয়া-২ আহলে বায়তের রক্তে রঞ্জিত তোর সিংহাসনকে লাথি মেরে পরিত্যাগ করলেন। তোর আরেক ছেলে খালিদ ইবনু ইয়াজিদ যিনি আরবের নামকরা রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন তিনিও তোর সিংহাসনে বসলেন না। তোর জুলমের তখত এবং পাপের বোঝা তোর পরে পাপিষ্ঠ মারওয়ান ও তার বংশধররা খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে বয়ে বেরালো। তবে তুই কোন কূহকিনী মায়ার ফাঁদে তোর কবর হাশর বরবাদ করলি!

নিশ্চয়ই প্রত্যেক দুনিয়া লোভী, ক্ষমতা পাগলের জন্য ইয়াজিদ লা'নতির জীবনে আছে উত্তম উপদেশ।

আল্লামা যাহাবির দৃষ্টিতে এজিদ বিন মুয়াবিয়া ও তার মৃত্যু

হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোর তথ্যমতে, এজিদসহ ইমাম হুসাইনের সকল ঘাতক খুব অল্প সময়েই হৃদরোগ ও শত্রুর আঘাতের শিকার হয়ে মারা গিয়েছিল।

প্রিয় নবীজি স: এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের ঘাতক এজিদ ছিল মদ্যপ ও দুর্বৃত্তমনা লোক। বিষয়টি ইতিহাস গ্রন্থে রয়েছে। এমনকি বিখ্যাত নাসেবি বান্ধব আলেম আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ও বিখ্যাত সুন্নী হাদিস-ইতিহাস বিশারদ আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবিও এজিদের দুর্বৃত্ততার কথা নিঃসঙ্কোচে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত সিয়ারু আলামিন নুবালা নামক ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেনঃ

وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال: سكر يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه. قلت: كان قويا شجاعا إذ رأي وحزم وفطنة وفصاحة وله شعر جيد ، وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر ، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة ، فمقته الناس ولم يبارك في عمره ، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة قاموا لله وكمرداس بن أدية الحنظلي البصري ونافع بن الأزرق وطواف بن معلى السدوسي وابن الزبير بمكة. [سيرأعلام النبلاء: ٣٧/٤-٣٨.]

অর্থ: মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মাসমা বলেন, 'এজিদ মদ সেবন করে নাচা শুরু করলো। এতে সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল এবং মাথা ফেটে গিয়ে মগজ দেখা গেলো। ' আমি (যাহাবি) বলবো, 'সে শক্তিশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও স্ববাক ছিল। তার ভালো কবিতাও রয়েছে। তবে সে কঠোর, নিষ্ঠুর ও পাষাণ নাসেবি ছিল। মাদক সেবন করতো ও মন্দ কাজ করতো। হুসাইন হত্যার মধ্য দিয়ে তার ক্ষমতার যাত্রা শুরু হয় এবং (মদীনায়) হাররার গণহত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এতে মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং তার হায়াতে বরকত হয়নি। হুসাইনের পর তার বিরুদ্ধে অনেকে বিদ্রোহ করেন।

যেমন মদীনাবাসী আল্লাহর জন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অনুরুপ মুরাদিস বিন আদিয়া হানজলী বসরী, নাফে বিন আযরক, তওয়াফ বিন মুয়াল্লাআস-সাদুসী ও মক্কায় ইবনে যুবাইর বিদ্রোহ করেছেন।" [যাহাবি রচিত সিয়ারু আলামীন নুবালা: ৪/৩৭-৩৮]।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এজিদ প্রেমীদের অনিষ্টতা মুক্ত রেখে রসূল স: এর আহলে বাইতকে ভালোবাসার তৌফিক দান করুন।

সৌদি রিয়ালখোর ইয়াজিদপন্থী মোল্লাদের প্রতি!

প্রিয় পাঠক! আসলে সৌদি রিয়ালখোর মোল্লারা ইয়াজিদকে নির্দোষ প্রমাণে কেন ওঠে পড়ে লাগে জানেন? কারণ এই জালিম ইয়াজিদের শাসনকালকে বৈধতা না দিতে পারলে, ইয়াজিদকে ভাল মানুষ প্রমান না করতে পারলে, সৌদির বর্তমান জালিম বাদশাহদের শাসনকাল বৈধ হয় না। কারণ ইয়াজিদ যেভাবে খেলাফাতকে মিটিয়ে দিয়ে ছলে বলে কৌশলে ইমাম হোসাইন রা. কে শহীদ করে তার তখত পাকাপোক্ত করেছিল, ঠিক একইভাবে বর্তমান সৌদি বাদশাহদের পূর্বপুরুষরা ওসমানী খেলাফাতকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে বর্তমান সৌদির ক্ষমতা দখল করেছিল।

ইয়াজিদকে ভাল মানুষ মনে করা ও তার শাসনকালকে বৈধতা দেয়া ঐসব রিয়ালখোর সৌদি দরবারী মৌলভীদের প্রতি আমার একটাই প্রশ্ন: তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম আপনার মনিব ইয়াজিদ ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম কে হত্যার আদেশ দেয় নি। কিন্তু যখন ইয়াজিদ জানতে পারল যে তার গভর্ণর মারজানার পুত্র জারজ জিয়াদের পুত্র উবাইদুল্লাহ, শিমার বিন জুল জওশান, আমর বিন সাদ এরা নিষ্ঠুরভাবে ইমাম হোসাইন রা., ইমাম মুসলিম বিন আকিল রা. এবং দুধের শিশু আলী আসগর বিন হোসাইন রা. সহ নবী পরিবারের ২১-২২ জন সদস্যকে নির্মমভাবে শহীদ করে ফেলেছে তখন ইয়াজিদ তাদেরকে কী শাস্তি দিয়েছিল? ইবনে

জিয়াদ, শিমার, আমর বিন সাদ এদের কী ইতিহাসের জঘন্যতম এই গোনাহের জন্য কোন শাস্তি তাদের হয়েছিল? নাকি তারা স্বপদেই বহাল ছিল? নাকি তাদের আরো প্রমোশন হয়েছিল?

রে পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ প্রেমিক তোর মুনিবের পক্ষে তুই কী বলবি? আছে কোন জবাব?

এই জঘন্যতম ঘটনার কোন বিচার না করা কী এটাই প্রমাণ করে না যে ইয়াজিদের প্রত্যক্ষ ইশারাতেই এগুলো হয়েছিল?

দুধের শিশু আলী আসগর সহ নবী পরিবারের ২১-২২ জন পুরুষ সদস্য শহীদ হয়ে যাওয়া তোদের কাছে বড় কোন ঘটনা মনে হয় না রে নরাধম? কিসের মুসলমান তোরা?

ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামের শির মুবারক যখন ইয়াজিদের সামনে রাখা হয় তখন সে সেই শির মুবারকে লাঠি দিয়ে গুতা দিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কবিতার সুরে গাইছিল, আজ যদি বদরের যুদ্ধে হামজা ও আলীর হাতে নিহত আমার পূর্বপুরুষরা (ওতবা, রাবিয়াহ, শাইবা প্রমুখ) এই দৃশ্য দেখত তবে খুশি হয়ে যেত। (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ইবনে কাসির, ৮ম খন্ড, ইমাম হোসাইন রা. এর শির পরিচ্ছেদ) ইয়াজিদ মূলত ইমাম হোসাইন রা. এবং নবী পরিবারকে শহীদ করে বদরের যুদ্ধে ইমাম আলী ও আমির হামজার রা. হাতে নিহত তার দাদী হিন্দার ভাই ও বাবার মৃত্যুর বদলা নিয়েছিল। তার দাদী হিন্দা এ কারণেই ওয়াহশিকে দিয়ে উহুদের যুদ্ধে আমির হামজা রা. কে শহীদ করায় এবং আমির হামজার রা. কলিজা মুবারক চিবিয়ে খায়।

ইসলামি খেলাফাতে রাশেদার সিস্টেমকে শুরার মাধ্যমে আবার জিন্দা করতে চাওয়া ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামের শেষ চেষ্টাটাকে তোদের কাছে কিছুই মনে হয় না রে নরাধম! পাপিষ্ঠ ইয়াজিদের দল!

CamScanner

কারবালার এই মর্মান্তিক ঘটনার পর যখন মদিনা শরিফের মানুষ বিদ্রোহ করলেন তখন ইয়াজিদ (লানাতুল্লাহি আলাইহি) তার সেনাপতি উকবা ইবনে মুসলিমকে দিয়ে হাররার যুদ্ধে মদিনা শরিফের ৭০০ সাহাবী ও তাবিই কে শহীদ করিয়েছে, শত শত মদিনাবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করিয়েছে। অনেকের গর্ভে অবৈধ সন্তান পর্যন্ত চলে এসেছিল। তবুও তোদের মুনিব ইয়াজিদ ভাল মানুষ। খারাপ না। রে পাপিষ্ঠ সৌদির রিয়ালখোর।

তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে নামাজ আজান ও ইকমাত বন্ধ ছিল। মসজিদে নববীকে ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছে। তবুও তোদের নেতা ইয়াজিদ ভাল ছিল!

মক্কা শরিফে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, তখন তাঁকে সরানোর জন্য ইয়াজিদ মুসলিম ইবনে উকবা কে দিয়ে মক্কা শরিফে আক্রমন করিয়েছে। মানজানিক বা আগুনের গোলা মেরে কাবা শরিফ জ্বালিয়ে দিয়েছে, হাজরে আসওয়াদ ৭-৮ টুকরো করে দিয়েছে। তবুও তোদের মুনিব ইয়াজিদ ভাল। পাপিষ্ঠ নরাধম কোথাকার।

মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মাসমা বলেন, 'এজিদ মদ সেবন করে নাচা শুরু করলো। এতে সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল এবং মাথা ফেটে গিয়ে মগজ দেখা গেলো। আমি (যাহাবি) বলবো, সে শক্তিশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও স্ববাক ছিল। তার ভালো কবিতাও রয়েছে। তবে সে কঠোর, নিষ্ঠুর ও পাষাণ নাসেবি ছিল। মাদক সেবন করতো ও মন্দ কাজ করতো। হুসাইন হত্যার মধ্য দিয়ে তার ক্ষমতার যাত্রা শুরু হয় এবং (মদীনায়) হাররার গণহত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এতে মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং তার হায়াতে বরকত হয়নি। হুসাইনের পর তার বিরুদ্ধে অনেকে বিদ্রোহ করেন। যেমন মদীনাবাসী আল্লাহর জন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অনুরুপ মুরাদিস বিন আদিয়া হানজলী বসরী, নাফে বিন আযরক, তওয়াফ

বিন মুয়াল্লা আস-সাদুসী ও মক্কায় ইবনে যুবাইর বিদ্রোহ করেছেন।" [যাহাবি রচিত সিয়ারু আলামীন নুবালা: ৪/৩৭-৩৮]।

মদ খেত, নারীবাজ ছিল, অশ্লীল নৃত্য করত তবুও তোদের নেতা ইয়াজিদ ভাল ছিল রে পাপিষ্ঠ নরাধর্মেরা। ওয়াক্তের পর ওয়াক্ত নামাজ সে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিত। তবুও তোদের নেতা ইয়াজিদ ভাল ছিল রে নরাধম পাপিষ্ঠরা!

ইয়াজিদ মলউন ও তার দোসরদের প্রতি বেশুমার লানত। গত পাঁচ বছর ধরে দেখছি, শিয়াদের অপপ্রচারের কারণেই হোক, আমরা সুন্নীরা মুহাররম মাসে হজরতে আমির মুওয়াবিয়া রা. কে শিয়াদের হাত থেকে বাঁচাতে ব্যস্ত থাকি। আর ওদিকে সালাফি আহলে হাদিসরা সৌদিপন্থীরা ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালামকে বিদ্রোহী সাব্যস্তে ব্যস্ত। ইয়াজিদকে হিরো বানিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে।

খবর নিয়ে জানতে পারলাম মুহাররম মাসে জুমুয়াতে রাজধানী ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার মসজিদে কারবালা নিয়ে তো আলোচনা হয়ই নাই। উল্টো ইমাম হোসাইন রা. কে কয়েকজন মুরুব্বি সাহাবীর কথা শুনে মক্কা শরিফে অবস্থান না করার কারণে দোষারোপ করা হচ্ছে। তিনি নাকি ইসলামি হুকুমতকে দ্বিখন্ডিত করে দিচ্ছিলেন। তিনি নাকি বিদ্রোহী ছিলেন। ইয়াজিদ নাকি হক ছিল। নাউজুবিল্লাহ মায়াজাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহাল আজিম।

এখন চয়েজ আপনার, আহলে বায়ত পাক পাঞ্জাতন যাদের ভালোবাসা ফরজ, মুহাররম আসলে আপনি কী ইমাম হোসাইন রা. কে সাধারণ মানুষের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরবেন নাকি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। সময় চলে যাচ্ছে। আগামী পাঁচ বছর পর তারা সফল হয়ে যাবে পুরোপুরি। আমাদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষিত সমাজটাকে অনেকটাই বিভ্রান্ত করে দিয়েছে তারা।

CamScanner

আগামী মুহাররম আসার আগে লাখো মুখে আওয়াজ তোলা প্রয়োজন ইমাম হোসাইনের রা. পক্ষে এবং ইয়াজিদ লানাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে মসজিদের মিম্বরে, সোশাল মিডিয়া ফেসবুকে ওয়াজের মঞ্চে অথবা কিতাব লিখে। সকল জায়গায়।

কে কে আছেন আহলে বায়ত পাক পাঞ্জাতন প্রেমিক যারা খুতবাতে, মসজিদে ও মাহফিলে, সোশাল মিডিয়া ফেসবুকে ব্যাপকভাবে ইমাম হোসাইন রা. কে নিয়ে আলোচনা করবেন?

মোহাররম মাস, শিয়া ফিতনা থেকে সাবধান!

আমাদের আকিদা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত হচ্ছে মধ্যমপন্থার নাম, যা ছাড়াছাড়ি ও বাড়াবাড়ির (ইফরাত ও তাফরিত) মাঝখানে অবস্থান করে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করেছি। (সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৪৩)

আহলে বায়তে আতহার অর্থাৎ হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পরিবার এবং সাহাবায়ে কেরাম আজমাইনের ব্যাপারেও আমাদের আকিদা মধ্যমপন্থায় আছে। যেমনটা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাওলা আলী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে, "হে আলী তোমার অবস্থা হবে ঈসা আলাইহিস সালামের মত। নাসারারা তাঁকে ভালবেসে এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছে যা তিনি নন, আর ইহুদীরা তাকে হিংসা করে তার আম্মাজানের ওপর অপবাদ দিয়েছে।" (ইমাম তাবরানি, মুজামুল কাবির, ১/৩২০, আশ শাজারি ফিল আমালি, পৃ: ৬৫২)

অর্থাৎ মাওলা আলীকে ঘিরে দুটো সম্প্রদায় হবে যারা উভয়েই পথভ্রষ্ট। এক সম্প্রদায় তাঁকে ভালবেসে অতিরঞ্জিত করে পথভ্রষ্ট

হবে, যেমন শিয়া রাফিজি যারা সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশিদিন ও আযওয়াজে মুতাহহারার ওপরে মিথ্যা মনগড়া কাহিনী রচনা করে অপবাদ দিয়েছে। আর আরেকটি দল মাওলা আলীকে হিংসা করে পথভ্রষ্ট হবে, যেমন খারিজি নাসিবিরা। সিফফিনের যুদ্ধে মাওলা আলীর দল ত্যাগ করে গিয়ে বলেছিল, লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ফায়সালা মানি না। তখন মাওলা আলী বলেছিলেন, কালিমাতুন হাক উরিদা বিহা বাতিল। সত্য কথার দ্বারা উদ্দেশ্য মিথ্যা। (সহিহ মুসলিম)

কিন্তু আমরা এই খারিজি/নাসিবি এবং শিয়াদের মাঝখানে অবস্থান করি আহলে বায়তের আতহারের ব্যাপারে। আহলে বায়তে আতহারকে ভালোবাসা ইমানের দাবি। ঠিক একইভাবে সাহাবায়ে কেরামকে পরিপূর্ণ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের ইমানের দাবি। কারণ ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সংস্পর্শে তারা সোনার মানুষে পরিনত হয়েছিলেন। তাদের যুগ ছিল সবচাইতে উত্তম যুগ।

"আমার সাহাবারা নক্ষত্রতুল্য, যদি কোন একজনের অনুসরণ কর তবেই তোমরা হেদায়াত পেয়ে যাবে।

"আমার সাহাবাগণকে কেউ গালি দিবে না"। হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) র এই ফরমানগুলো আমাদের জন্য শিরোধার্য।

সাহাবায়ে কেরামগণের নিজেদের মধ্যে কী দ্বন্দ ছিল না ছিল সে সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে তাওয়াক্কুফ বা সুকুত ইখতিয়ার। মুখ বন্ধ রাখা, কারো সমালোচনা না করা। কারণ এসব বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমরা এসব বিষয়ে কোন সমাধানও দিতে পারব না। উল্টো এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে ফিতনা ছড়াবে সমাজে।

CamScanner

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৩৪)

আমরা নিঃসন্দেহে হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা., হযরত ওমর ফারুক রা., হযরত ওসমান জুন নুরাইন রা., মাওলা আলী রা. এবং ইমাম হাসান রা. এর খেলাফাতের ছয়মাস সহ মোট ৩০ বছরকে খেলাফাতে রাশেদার সময়কাল হিসেবে মানি।

মাওলা আলীর মাওলাইয়াত, ইমামাত ও বেলায়াতকে খেলাফাতের সাথে মেশানোর কোন সুযোগ নেই। খেলাফাত ভিন্ন বিষয়, এটা প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের ওপরে ছেড়েছেন আল্লাহর নির্দেশক্রমে। ওয়া শাবিরহুম ফিল আমর, ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম। - আল কুরআন। সেই পরামর্শ বা শুরার ভিত্তিতেই পরবর্তী চার খলিফা পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে সাহাবাগণের মাধ্যমে হয়েছে। এর প্রতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রত্যেক সদস্যের বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। এটা ইজমায়ে সাহাবা।

আমরা তরিকত তাসাউফপন্থীদের জন্য মাওলা আলীর মাওলাইয়াত, ইমামাত ও বেলায়াত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়, যা উনার সন্তান ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে কেয়ামতের আগে। ইমাম মাহদিতে খেলাফাত এবং বেলায়াত আবারো মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। যুগের আধ্যাত্মিক ইমাম মাওলা আলীর বংশ থেকেই হবেন। আর খেলাফাত মুসলমান মেজরিটির মতামতের ভিত্তিতেই হবে।

CamScanner

তাই এসব বিষয়ে কোন শিয়া পথভ্রষ্টদের ইন্ধনে কান না দেয়ার জন্য সকল সরলপ্রাণ মুসলমানদের সতর্ক করছি। মুহাররম মাসে আমরা আহলে বায়তের স্মরণ করব, আলোচনা করব। কিন্তু কোন শরীয়ত গর্হিত কথা ও কাজে লিপ্ত হব না। বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার খেলাফ কোন ফিতনা আমরা সমাজে ছড়াব না, ছড়াতে দেব না ইন শা আল্লাহ।

প্রতিদান আহলে বায়তে আতহারের কাছে চাই!

হজ্জের মৌসুম। কা'বা শরিফের চারপাশে প্রচন্ড ভীড়! তাওয়াফ করতে আসল উমাইয়া বাদশা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান। কা'বা শরিফের প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে তাওয়াফ করল। হাজরে আসওয়াদের কাছে যেতে চাইল। মানুষের ধাক্কায় ভীড়ের মধ্যে পৌঁছাতে পারল না। হাজরে আসওয়াদে চুমু না দিয়েই ফিরে গেল। দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

একটু পর ইমাম সাজ্জাদ আলী জয়নুল আবেদিন ইবনুল হোসাইন ইবনে আলী (আলাইহিমুস সালাম) আসলেন। লোকজন তাঁর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। তিনি তাওয়াফ করলেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন। চলে গেলেন।

হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের সাথে ছিল সিরিয়ার এক গোত্রপতি। সে এই দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বাদশাহর জন্য মানুষ রাস্তা ছাড়ে না। কিন্তু এই লোক কে? তার জন্য লোকে কেন রাস্তা ছেড়ে দিল? সে বলে ওঠল, "কে এই লোক?"

হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক ভাল করেই জানত তিনি কে। তারপরও হিংসাবশতঃ বলল, "জানি না সে কে!"

পাশেই ছিল বিখ্যাত কবি ফারাজদাক। সে বলল, "খলিফা! যদি অনুমতি দেন তবে আমি বলব তিনি কে?"

বাদশা বলল, "বল।"

ফারাজদাক ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমাম আলী জয়নুল আবেদিন হুবনুল হোসাইন ইবনে আলীর (আলাইহিমুস সালাম) শানে ৩৫-খানা শে'র (কবিতার লাইন) পাঠ করল।

هَذا الّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأَتَهُ

وَالبَيْتُ يِعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ

هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ الله كُلّهِمُ،

هذا التّقيّ النّقيّ الطّاهِرُ العَلَمُ

هذا ابنُ فاطمَةٍ، إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ،

بِجَدّهِ أنْبِيَاءُ الله قَدْ خُتِمُوا

"ইনি সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার সম্মান জানে মক্কার উপত্যকা,

আরো জানে তাঁকে এই হেরেম, হেরেমের বাহিরের দুনিয়া ও এই কা'বা!

তিনি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দার সন্তান,

তিনি মুত্তাকি, পাক ও পবিত্র বিদ্বান!

যদিও আপনি না জানেন তাঁকে, তিনি ফাতিমার সন্তান,

তাঁর নানাজীর মাধ্যমেই আল্লাহর নবীগণের হলো সমাপন।"

এই কবিতা শুনে হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক সাথে সাথে ফারাজদাককে মক্কা ও মদিনা শরিফের মাঝখানে এক জায়গায় বন্দী করে দিল।

ইমাম জয়নুল আবেদিন এই ঘটনা শোনার পর ফারাজদাকের জন্য ১০,০০০ দিরহাম পাঠালেন উপহার হিসেবে। ফারাজদাক দিরহামবাহী সেই লোককে বলল, তুমি এগুলো ফেরত নিয়ে যাও। গিয়ে ইমামকে বল, আমি সারাজীবন রাজা বাদশাহদের গুনগান গেয়েছি। কিন্তু এই কবিতার মাধ্যমে দুনিয়া চাই না। আখিরাতে এর

প্রতিদান চাই তাঁর নানাজীর কাছে। ইমাম জয়নুল আবেদিনের কাছে ফেরত গেলে তিনি আবার বলে পাঠালেন, যাও ফারাজদাককে বল, আহলে বায়তের ঘর থেকে দান একবার বের হলে আবার ফেরত আসতে পারে না। আমি এটা উপহার হিসেবে দিচ্ছি। দ্বিতীয়বার পাঠানোর কারণে ফারাজদাক ইমামের সম্মানে ঐ দিরহাম রাখতে বাধ্য হলেন।

তথ্যসূত্রঃ দিওয়ানে ফেরেজদাক, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত লেবানন, পৃষ্ঠা-৫১১।

পঞ্চম অধ্যায়

তাসাউফ ও আখলাক

সুফিগণের তরিকা: সবার জন্য ভালোবাসা

মানুষ মূলত দুই প্রকার, ১. ভালোবাসার দল (আহলে ইশক) ২. ঘৃণার দল (আহলে বুগজ)। ভালোবাসার দলের মানুষের মন মানসিকতা, কথাবার্তা, চলাফেরা ও আচার আচরন ঘৃনার দলের মানুষের সাথে কোনদিনও মিলবে না।

ভালোবাসার অর্থ কী আসলেই আমরা বুঝি? ভালোবাসার সবচাইতে ভাল সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এমন, "কোন সংজ্ঞা দ্বারাই এটাকে ব্যাখ্যা করে বুঝানো সম্ভব নয় এই ভালোবাসা কী জিনিস, এমন একটি অনুভূতির নাম ভালোবাসা।"

তবুও এরকম বলা হয়েছে,

ميلان القلب الي شيئ لوجود الجمال او الكمال فيه او لاحسان

"কারো প্রতি বা কোন কিছুর প্রতি অন্তর ঝুকে যাওয়া উনার মধ্যকার সৌন্দর্যের জন্য বা ঐ জিনিসের মধ্যকার সৌন্দর্যের জন্য, উনার গুণের পরিপূর্ণতার জন্য বা উনার কোন ইহসানের (উপকার) জন্য।"

মুসলমানদের মধ্যে মূলত দুই প্রকারের লোক আছেন যাদের মধ্যে ঘৃণা আছে। তাদের মধ্য এক প্রকারের লোক দাবি করেন আমরা প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসাতে বাড়াবাড়ি করি। সারাক্ষণ খালি নবীজির (ﷺ) ভালোবাসার কথা বলি, দরুদ ও সালামের কথা বেশি বেশি বলি। আরে ভাই প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা থেকে আলাদা কিছু নয়। যদি প্রিয় নবীজির (ﷺ) ভালোবাসাকে আলাদা কিছু মনে করেন কেউ তবেই কেবল সমস্যা।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ

তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাজি করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে রাজি করা অধিক জরুরী। (আল কুরআন, ৯ঃ৬২)

আরবী ব্যাকরণ যারা জানেন তারা বুঝবেন, এখানে আল্লাহ ও তার রাসুল (ﷺ) দুজনের জন্য একবচনের সর্বনাম ব্যবহার হয়েছে। يُرْضُوهُ, এসেছে يرضوهما এর জায়গায়। উনাদের দুজনকে রাজি করা অধিক জরুরী বুঝাতে উনাকে রাজী করা অধিক জরুরী বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, এটা বুঝানো যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের রাজি খুশি একই।

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। (আল কুরআন, ৪৮ঃ৯)

সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখানেও দ্বিবচনের জায়গায় একবচন নেয়া হয়েছে।

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। (আল কুরআন, ৪ঃ৮০)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (আল কুরআন, ৩৩ঃ৫৭)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

যারা আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (আল কুরআন, ৪৮ঃ১০)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। (আল কুরআন, ৮ঃ১৭)

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (আল কুরআন, ৫৩ঃ৩-৪)

আল্লাহ ও তার রাসুলের (ﷺ) জাত আলাদা, অস্তিত্ব আলাদা কিন্তু, বাকি সব এক। রাসুলের (ﷺ) আনুগত্য, আল্লাহর আনুগত্য, নবীজির (ﷺ) রাজি- খুশি আল্লাহর রাজি খুশি, নবীজির (ﷺ) হাত

মোবারক আল্লাহর কুদরতি হাত, নবীজির (ﷺ) কংকর নিক্ষেপ মূলত আল্লাহর কংকর নিক্ষেপ, নবীজির (ﷺ) হাতে বায়াত মূলত আল্লাহর কুদরতি হাতে বায়াত। নবীজির (ﷺ) কথা মূলত আল্লাহর কথা। নবীজিকে (ﷺ) সাহায্য করা মূলত আল্লাহকে সাহায্য করা, নবীজিকে (ﷺ) সম্মান করা ও ভালোবাসা মূলত আল্লাহকে তাজিম করা ভালোবাসা। তাহলে এখানে বাড়াবাড়ি কোথা থেকে আসে?

احبوا الله لما يغذوكم من نعمه واحبوني لحب الله واحبوا اهل بيتي لحبي

সুনান তিরমিজিতে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস কারণ তিনি তোমাদেরকে বহু নিয়ামত দিয়েছেন, আর আমাকে ভালোবাস আল্লাহর ভালোবাসার ওয়াস্তে, আমার আহলে বায়তকে ভালোবাস আমার ভালোবাসার ওয়াস্তে।

কাজেই আমরা হুজুর নবীয়ে পাক (ﷺ) কে ভালবাসি আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে উনাকে রাজিখুশি করানোর জন্যই।

যারা বলেন যে নবীজির (ﷺ) অনুসরণই নবীজির ভালোবাসা, তারা অনেক বড় পরিক্ষার সম্মুখীন। ভালোবাসা এক জিনিস আর অনুসরণ আরেক জিনিস। ভালোবাসার সংজ্ঞা তাই বলে। কারো দিকে আপনার রুহ ঝুকে যাওয়াকে ভালোবাসা বলে, আর অনুসরণ হচ্ছে ভালোবাসার লাওয়াযিমাতের (যা ভালোবাসার কারণে আবশ্যক হয়) অন্যতম।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (আল কুরআন, ৩ঃ৩১)

CamScanner

আগে ভালোবাসা, তারপর বলা হচ্ছে অনুসরণ। তাই অনু
ভালোবাসা বলাটা বিরাট বড় ভুল। তবে ভালোবাসার পর অনুসরণ
করলেই কেবল আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়, তখনই মানুষ অলি
বা আল্লাহর বন্ধু হয়। যদি তাই না হত তবে নবীজি (ﷺ) শরাব
পানের অপরাধে কয়েকবার শাস্তি পাওয়া সাহাবী আব্দুল্লাহ আল
হিমারের রা. ব্যাপারে এই স্বাক্ষ্য দিতেন না যে, তোমরা আমার
আব্দুল্লাহ আল হিমারকে লানত করবে না, তিনি আল্লাহ ও তার
রাসুলকে (ﷺ) ভালোবাসেন। (সহিহ বুখারি, শাস্তির অধ্যায়, হাদিস
নং ৬৩৯৮)

প্রাণের চাইতে অধিক ভালোবাসতে বলা হয়েছে, তাই এখানে
বাড়াবাড়ির কোথা থেকে আসে? আমরা কেউ প্রাণ দিয়ে কোথায়
ভালোবাসতে পারলাম রাসুল (ﷺ) কে?

রাসুল (ﷺ) হযরত ওমর রা. কে বললেন, না হে ওমর! যতক্ষণ না
প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাস ততক্ষণ তোমার ঈমান পরিপূর্ন হবে
না।

একদিন খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. দাওয়াত দিলেন ওমর রা. কে।
খলিফাকে দাওয়াত দিয়েছেন, আমিরুল মুমিনিনকে। তাই অনেক
আইটেম রান্না করা হলো, আমিরুল মুমিনিনের সামনে উপস্থাপন
করা হলো। ওমর রা. কাদতে শুরু করলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ
রা. জিজ্ঞেস করলেন, ما يبكيك يا امير المؤمنين؟

হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি জবাব দিলেন, আমার দুইজন সাথী (প্রিয় নবীজি (ﷺ) ও আবু
বকর রা.) চলে গেছেন, যারা একটির বেশি দুইটি আইটেম দিয়ে
খান নাই কোনদিন, এক নাগাড়ে তিন দিন কোন সময় পেট পুড়ে
খান নাই। এই বলে তিনি খাওয়া থেকে ওঠে গেলেন।

CamScanner

এটা ভালোবাসা ছিল যা উনার মনে ঐ সময় উদয় হয়েছে। যা উনার মনকে খেতে সায় দেয়াতে পারেনি। ভালোবাসা এমনই। ভাপ খাওয়া জায়েজ, হারাম নয়। কয়েক পদ দিয়ে খাওয়াও জায়েজ, কিন্তু ভালোবাসা যখন প্রাণের চেয়ে অধিক কারো প্রতি হয়ে যায় তখন আশিকের অবস্থা এমনই হয়।

আর ভালোবাসা হবেই বা না কেন বেশি?

ভালোবাসার সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা যদি প্রিয় নবীজির (ﷺ) দিকে তাকাই, তাহলে দেখব পৃথিবীর সব সৌন্দর্য তার মাঝে ছিল।

নবীজির (ﷺ) বাহ্যিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সব চাইতে সুন্দর যা বলা হয়েছে তা হলোঃ

ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত মিশরের রমনীরা ছুরি দিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেললেন,

ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত সাহাবীগণ জিহাদের ময়দানে আপনার জন্য নিজেদের সর (মাথা) কাটিয়ে ফেললেন।

আর নবীজির (ﷺ) আখলাকি কামাল সম্পর্কে কী বলব? যার সম্পর্কে আলাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আপনি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের অধিকারী। (আল কুরআন, ৬৮ঃ৪)

আমাদের প্রতি ইহসান! ঈমান পেলাম উনার মাধ্যমে, ইসলাম পেলাম উনার মাধ্যমে, কুরআন পেলাম উনার মাধ্যমে, স্বয়ং আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানলাম উনার মাধ্যমে। এর চেয়ে বড় ইহসান দুনিয়ার কোন মানুষ কারো উপরে করেছে বলে কেউ চিন্তা করতে পারে?

দরুদ ও সালামে বাড়াবাড়ি কীভাবে আসে?

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীজির (ﷺ) প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীজির (ﷺ) প্রতি দরুদ প্রেরণ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর বেশি বেশি। (আল কুরআন, ৩৩:৫৬)

নবীজি (ﷺ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সেই আমার সবচাইতে নিকটে থাকবে যে আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করে।

এভাবে বেশি বেশি দরুদ পড়তে বলা হয়েছে। দরুদ পাঠের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা ক্ষণ ঠিক করে দেয়া হয়নি। বরং যে যত বেশি পড়তে পারেন যখন খুশি।

হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ

يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم
اجعل لك من صلاتي

আমি আমার ইবাদাতের (ফরজ ইবাদাত আদায় করে বাকি সময়ের কতটুকু) কতটুকু আপনার উপর দরুদ পড়ব? প্রিয় রাসুল (ﷺ) বললেন, তুমি যেরকম চাও। তিনি বললেন, চার ভাগের একভাগ? প্রিয় নবী (ﷺ) বললেন,

وان زدت كان خيرا لك

কি আরো বেশি করতে ভাল হত।

কি অর্ধেক? প্রিয় নবী (ﷺ) বললেন,

وان زدت كان خيرا لك

কি আরো বেশি করতে ভাল হত।

কি বললেন, অর্ধেক?

وان زدت كان خيرا لك

যদি আরো বেশি করতে ভাল হত।

তিনি বললেন, اجعل لك صلاتي كلها

"আমি আমার সকল সময় দরুদে দিয়ে দেব"।

নবীজি (ﷺ) বললেন, তাহলে তোমার দুঃখ দূর্দশা সব দূর হয়ে যাবে, তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

তাই এখানে বাড়াবাড়ি কোথা থেকে আসে?

আর মানুষের মধ্যকার অপর দল বলে, আমরা মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তেই ঘৃণা করি। অর্থাৎ আল্লাহর রাজি খুশি পাওয়ার জন্যই কাউকে ঘৃণা করি। তাদের দলিল, الحب في الله والبغض في الله

প্রফেসর ড. সায়্যিদ শামিমুদ্দিন আহমেদ মুনায়েমি (মা জি আ) কে জিজ্ঞেস করলাম এই হাদিস খানার ব্যাখ্যা সম্পর্কে। তিনি বললেন, আজহারি সাহেব! আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করব কীভাবে? যদি তাই হয় তবে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কতটুকু ঘৃণা করি?

দুনিয়ার সকল গুনাহ খাতা করার পরও নিজেকে যদি সবচাইতে বেশি ভালোবাসতে পারি তবে গুনাহ করার কারণে, অন্যায় করার কারণে অপরকে কীভাবে ঘৃণা করব? বরং আমাদের উচিত কোন মানুষকে নয়, তাদের খারাপ আমল ও গোনাহের কাজগুলোকে ঘৃণা করা। আল্লাহর ওয়াস্তে গোনাহের কাজ ও খারাপ আমলের প্রতি ঘৃণা থাকা।

আর আমরা সবাই তো দ্বীনের দায়ী। ডাক্তার শারীরিক রোগের চিকিৎসা করে। কোন ডাক্তার যদি তার রোগীকে রোগের জন্য ঘৃণা করে দূরে সড়িয়ে রাখতে শুরু করে তবে কী ঐ রোগী কোনদিনও ভাল হবে?

CamScanner

আমরা প্রত্যেক মুসলমান দ্বীনের দায়ী। মানুষের কলবি বিমারের ডাক্তার। কুফর, মুনাফিকি, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি দুশমনি, রাগ, লোভ, জিদ- হিংসা, অহংকার, জিনা, ফাহিশ, মদ, জুয়া ইত্যাদিসহ যত গুনাহ আছে সব আমাদের রোগীর কাছে থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য কী আমরা কাউকে ঘৃণা করতে পারব? ঘৃণা করলে ঐ কলবি বিমার রোগী ভাল হবে কীভাবে? তাই পাপকে ঘৃণা করা যায়, পাপীকে না।

আমরা সাধারণ মানুষ যেন ঐ পথে প্রভাবিত না হই সেজন্য দূরে থাকতে পারি। কিন্তু কোন মানুষকেই ঘৃণা করতে পারি না। সে যে মতবাদ বা ধর্মেরই হোক না কেন। এতটুকু সহনশীলতা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে।

ভালোবাসা দিয়ে সব জয় করা সম্ভব। আমরা কিন্তু ঐ রাস্তায় হাটি কম। বরং ঘৃণা ও নফরতের রাস্তায় হাটতে শুরু করি। ঘৃণা দিয়ে কিছুই হাসিল হবে না। প্রিয় নবীজি (ﷺ) তার বড় বড় শত্রুকে ভালোবাসা ও আখলাক দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন। পথে কাটা বিছানো সেই ইহুদি বুড়ি থেকে শুরু করে উনারই ভয়ে অন্য শহরে পলায়ন করা বুড়ি পর্যন্ত। সবাইকে ভালোবাসা ও আখলাক দিয়ে জয় করেছেন। কারো মধ্যে খারাপ কোন অভ্যাস দেখলে তাও আদর, সোহাগ ও ভালোবাসা দিয়ে দূর করেছেন। তিনি জিনা করার অনুমতি চাওয়া সেই সাহাবীই হন, শরাবি সেই সাহাবীই হন আর যেই হন। কাউকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে যাননি, আক্রমণের স্বীকার হলে প্রতিরক্ষা করেছেন।

সুফিগণও এই তরিকাই অনুসরণ করেছেন। ভালোবাসা ও উত্তম আখলাক দিয়েই সবাইকে জয় করেছেন। রাজ্য জয় করেছেন মুসলিম শাসকরা। সাধারন মানুষের মন জয় করেছেন সুফিগণ এবং তা তলোয়ারের মাধ্যমে হয়নি, কোনদিনও তা সম্ভব ছিল না। আরবের দুই একটা দেশ ছাড়া সারা পৃথিবীর মুসলমান সুফিগণের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এটা আমি দাবির সাথে

বলতে পারি। শায়খ জাকারিয়া বাহাউদ্দিন মুলতানি রাহ. যেরকম বলে গেছেন, যদি কোন এলাকার মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হয় তবে ২ বছত পর্যন্ত মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বরং সেখানে একটা ব্যবসা দাও। আখলাক ও আমানতদারীর মাধ্যমে সবার সাথে চল এমনিতেই তোমার ধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে।

আগের যুগের সুফিগণ ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করেন নি, নসিহত করেননি, শত শত কিতাব লিখেননি। কিন্তু তাদের হাতেই মানুষ বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় চলে এসেছে। তা কীভাবে সম্ভব হয়েছে? ভালোবাসা ও উত্তম আখলাকের মাধ্যমে, ঘৃণা হিংসার মাধ্যমে তা সম্ভব ছিল না।

শায়খ হাবিব আলী আল জিফরি সাহেব একজন জাপানী মুসলমানকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই জাপানে তো মুসলমান নেই বেশি। আপনি মুসলমান কীভাবে হলেন? ঐ জাপানী ভাই জবাব দিলেন, আমি না বরং আমার আব্বা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ব্যবসা করতেন। তার পাশের দোকানের মালিক ছিলেন ইন্দোনেশিয়ান এক মুসলমান যার দোকানে প্রচুর ব্যবসা হত। আমার আব্বার ব্যবসা উনার দোকানের কারণে বেশি চলত না, তাই আমার আব্বা ঐ ইন্দোনেশিয়ান মুসলমান ভদ্রলোককে ঘৃণা করতেন, হিংসা করতেন। কিন্তু ঐ ইন্দোনেশিয়ান মুসলমান আমার বাবাকে হিংসাও করতেন না, ঘৃণাও করতেন না, আমার বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন, হাসিমুখে কথা বলতেন বরং লোকজনকে আমার বাবার দোকানে আসতে বলতেন। এক পর্যায়ে আমার বাবা ব্যবসা বন্ধ করে চলে যাওয়ার সময় ঐ ইন্দোনেশিয়ান ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই আমি তোমার সাথে অনেক হিংসা পোষণ করেছি, তোমার সাথে বাজে ব্যবহার করেছি, কিন্তু তুমি আমার সাথে হাসিমুখে চলেছ, ভাল ব্যবহার করেছ। তার কারণ কী?

ঐ ইন্দোনেশিয়ান ভদ্রলোক জবাব দিলেন, এটা আমার ধর্ম আমাকে করতে শিখিয়েছে। সাথে সাথে আমার আব্বা বললেন, তাহলে

CamScanner

আমাকে তোমার ধর্মে শামিল করে নাও ভাই। আমার আব্বা কালিমাহ পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইসলাম এভাবেই ছড়িয়েছে। ভালোবাসা, উত্তম ব্যবহার ও আখলাকের মাধ্যমে।

০১.০৩.২০১৯

দিল্লী থেকে আজমির শরিফের ট্রেনে বসে, ভারত।

এক মুসলমান সম্পর্কে আরেক মুসলমানের কি ধারণা থাকা উচিৎ: সায়্যিদ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাহ.র শিক্ষা

মূল: প্রফেসর ড. সায়্যিদ শামিম উদ্দিন আহমেদ মুনায়েমী (মা জি আ), সাজ্জাদানশীন-খানকায়ে মুনায়েমীয়া, মিথানঘাট, পাটনা, বিহার, ভারত।

দিল্লীর আধ্যাত্মিক সম্রাট মাহবুবে এলাহি খাজা হযরত সায়্যিদ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রাহ. খানকাতে যদি কেউ অতিথি হিসেবে যেতেন, তবে অবশ্যই তিনি খালিপেটে ফিরে আসতেন না। কিছু না কিছু খাবার-পানীয় সামনে দিয়ে হলেও আগত অতিথিগণকে খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাহ. আপ্যায়ন করতেন।

এক ব্যক্তি অনেক বছর পর্যন্ত এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার পর একদিন হযরতকে বললেন, "হুজুর আমি যখনি আপনার দরবারে এসেছি আপনি কিছু না কিছু খাবার-পানীয় তাবাররুক হিসেবে আমার সামনে পেশ করেছেন। খালি পেটে আমি কোন দিন ফিরে যাইনি আপনার দরবার থেকে!"

হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাহ. বলেন, সুফিগণের খানকাতে এই হাদিসগুলোর উপর আমল করা হয় من زار حيا ولم يكرمه فكأنما زار ميتا

"যে কোন জীবিত ব্যক্তির সাক্ষাতে গেল অতঃপর সে (ঐ অতিথির) সম্মান করল না, সে যেন মৃত ব্যক্তির সাক্ষাত করল"। من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليكرم ضيفه"

"যে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে"। তাই আমার খানকাতে কেউ এসে যদি খালি পেটে ফিরে যান, তবে তা মেহমানের সম্মানের খেলাফ হয় বলে আমি মনে করি।

তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, "কিন্তু হযরত! দিল্লীতে তো হযরত খাজা রুকনুদ্দিন মুলতানী সাহেবও এসেছেন। তিনিও তো নিজেও অনেক বড় সুফি এবং বিখ্যাত আরেক সুফি শায়খ হযরত খাজা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানীর রাহ. নাতি। কিন্তু উনার খানকাতে তো এসব হয় না। আমি তো ওখানেও প্রায়ই যাই, কিন্তু হযরত! সেখানে আমাকে কোনদিন কিছু দিয়েই আপ্যায়ন করা হয় নি!"

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন! এরকম মূহুর্তগুলোতেই আমাদের আসল চেহারা প্রকাশ পায়, কে সত্যিকারের সুফি, কে সচ্চরিত্রবান আলীম আর কে ভাওতাবাজ। এরকম মূহুর্তগুলোতে আমরা দুনিয়া পাগল এক আলীম অপর আলীমকে, এক পীর অপর পীরকে নিচ ও হেয় প্রতিপন্ন করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করি না। আফসোস!

আর এদিকে জবাব শুনুন মাহবুবে এলাহি হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রাহ.। তিনি বলেন, "আরে ভাই দেখ! আমরা কাছে কোন আধ্যাত্মিক কিছু বা বাতেনী কিছু নেই, আমি জাহেরী মানুষ! তাই আমি সবাইকে দুনিয়াবি বাহ্যিক খাবার-পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করি। আর খাজা রুকনুদ্দিন মুলতানী সাহেব তো বিশাল আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী, তাই তিনি আগত মেহমান সবাইকে রুহানী খোড়াক দিয়ে আপ্যায়ন করেন। যা আমার দেয়া বাহ্যিক দুনিয়াবি খাবার-পানীয়ের চেয়ে অনেক উত্তম।"

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার!

ইসলাম মানে অন্যের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা। তাসাউফ মানে অন্যের মন্দের মধ্যেও ভাল খোঁজা। কাউকে ছোট দেখানোর ঘোরবিরোধী আমাদের দ্বীন-ধর্ম। তরিকত-তাসাউফ আমাদেরকে সেই শিক্ষা দেয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয়কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সুরা হুজরাত, ৪৯:১২)

إيَّاكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه

"তোমরা (অপরের সম্পর্কে খারাপ ধারণা) পোষণ করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই (অপরের সম্পর্কে) খারাপ ধারণা পোষণ করা সবচাইতে বড় মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

অশ্লীল নাটক, সিনেমা স্লো-পয়জনিং (ধীরগতির বিষ)

কদিন আগে আমি ফেইসবুকে একটা স্টেটাস দিয়েছিলাম ভারতীয় ও বাংলাদেশী টিভি সিরিয়ালগুলো নিয়ে। আমার অতি ঘনিষ্ট অনেকেই নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন এই স্টেটাসটি নিয়ে। আমি নির্মল নিষ্কলুষ বিনোদন ও প্রগতিশীল যে কোন কিছুর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এই ওয়েস্টার্ন, ভারতীয় ও বাংলাদেশী টিভি সিরিয়াল এবং নাটক সিনেমাগুলো স্লো পয়জনিং হিসেবে কাজ করে।

এগুলো এক প্রকারের ধীরগতির বিষ যা আমাদের মানসিকতাকে আস্তে আস্তে বিষিয়ে দেয়। আমি এই স্লো পয়জনিং এর শিকার হিসেবেই বলছি। এই বিষ পান করে এর ক্ষতিকর দিকটা দেখে তা ত্যাগ করেই বলছি। নিজেকে গুনাহগার দাবি করেই বলছি।

অশ্লীল নাটক সিনেমাগুলোর অন্যতম প্রধান একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এগুলো যেকেন পাপকে আমাদের দৃষ্টিতে ছোট করে দেখতে শেখায়, হোক তা কবিরা গুনাহ কিংবা সগীরা।

নাটক সিনেমাগুলোতে অশ্লীলতাকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা দীর্ঘদিন দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে আমাদের কাছে আর এগুলোকে গোনাহের কাজ বলে মনে হয় না। পর্দা না করাকে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে, দৃষ্টি সংযত না রাখার মত ভয়ানক বিষয়গুলোকে এক সময় আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয় বলে প্রতীয়মান করে। সেক্স বিফোর মেরেজ, বিয়ে ছাড়া লিভ টুগেদারকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন এগুলো তো কোন বিষয়ই নয়। হলিউডের নাটক সিনেমাগুলোতে তো এগুলো বহু আগে থেকেই দেখাচ্ছে, হালের বোম্বের কিংবা বাংলাদেশের নাটক সিনেমাগুলোতেও এগুলো দেদারসে প্রমোট করা হচ্ছে।

এখানে আসল সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে বলি। মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবসহ সকলেই একসাথে বসে এসব দেখছি, এগুলো থেকে মজা নিচ্ছি, এগুলো দেখে হাসাহাসি করছি। এসবের প্রতি আমাদের খোলাখোলি সাপোর্ট না হোক অন্তত: মৌন একটা সমর্থনের সিগনাল সন্তানদের কাছে যাচ্ছে। তারপর যখন আমাদেরই সন্তান এসব অশ্লীলতার দিকে যায় তখন আমরা এগুলোতে বাধা দিই। এটা এক ধরনের ভন্ডামী যা আমাদের সন্তানদের মাথায় হিট করে। আরে আমার মা-বাবা ও মুরুব্বিরা এসব দেখে মজা নেয় আবার এসব কাজে আমাকে বাধা দেয়। এটা হিপোক্রেসী। সন্তানরা আমাদের এসব অহেতুক শাসন মানবে না।

CamScanner

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভূলে যাও?" (সূরা বাক্বারা: ২:৪৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (সূরা সাফ, ৬১:২-৩)

আমাদের আচার-ব্যবহারগুলো কি পরোক্ষভাবে অশ্লীলতা সমাজে প্রসার করতে ভূমিকা রাখছে না?

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা নুর: ২৪:১৯)

পরোক্ষভাবে আমরা আমাদের যুবসমাজকে এমন এক কালচারের দিকে ঠেলে দিচ্ছি যা ধ্বংসের রাস্তা:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (সুরা ইসরা: ১৭:৩২)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সূরা আরাফ, ৭:৩৩)

CamScanner

অথচ আল্লাহ পাক আমাদের পুরুষদেরকে আগে এবং পরে নারীদেরকেও দৃষ্টির হেফাজত করতে বলেছেন।

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সূরা নুর, ২৪:৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনা মুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ,

তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নুর, ২৪:৩১)

নাটক-সিনেমাগুলো আমাদেরকে এসকল বিষয়ের দিকে ভয়ানকভাবে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই গোনাহের কাজগুলোকে তাচ্ছিল্য করতে শেখাচ্ছে। আমাদের মনঃস্তত্বে এগুলোকে পজিটিভ একটা জায়গা করে দিচ্ছে।

মদপান, জুয়া, চুরি এবং গুন্ডাগীরিকেও পজিটিভলি উপস্থাপন করছে নাটক-সিনেমাগুলো। আমাদের কিশোর ও যুবসমাজ দ্রুত এগুলো দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। অভার অল মিডিয়া জগৎ সম্পর্কে অনেক বড় বড় কন্সপিরেসী থিওরি আছে, যার কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা তা আমি জানি না। তবে এগুলো যে আমাদের আখলাক ধ্বংস করে দিচ্ছে এটা চরম সত্য।

হিন্দী সিনেমা ও সিরিয়ালগুলোতে দেবদেবি পূজা, কীর্তন-ভজন ইত্যাদি শিরকি কাজগুলো দেখাচ্ছে। যেগুলো আমাদের শিশুদের মনে এই চরম গোনাহের কাজগুলোকে হালকা করে দিচ্ছে। যে কারণে এখন পূজা মন্ডপগুলোতে লাখ লাখ মুসলমানও যাচ্ছে। অথচ এগুলো শিরক বা সবচাইতে বড়গুনাহ। এই গুনাহ আমরা দেখছি, উপভোগ করছি এবং আমাদের ঘরের ভেতরে এগুলো হচ্ছে হোক না তা টিভিতে। তারপর আমরা কীভাবে আশা করতে পারি আমাদের ঘরে আল্লাহর রহমত প্রবেশ করবে?

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সূরা শামস, ৯১:৯-১০)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাজিয়াত, (৭৯:৪০-৪১)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্রতা অর্জনের দিকে যেন নিয়ে যান। আমিন।

"সুফিয়ানা তাফসির" বা "তাফসিরে ইশারি": সূরাতুল বাক্বারার ৮ খানা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত

আমরা জানি যে আল-কুরআনের সর্ববৃহৎ ও দ্বিতীয় সূরাখানার নাম সূরাতুল বাক্বারাহ বা গাভী। এই সূরার নামকরনের পেছনের ইতিহাসও (যা ৬৭-৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে) আমরা কমবেশি সবাই জানি। বনি ইসরাইল বা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মতের এক ধনী লোক নিহত হয়েছিল। ঐ ধনী ব্যক্তির কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু তার এক ভাতিজা ছিল যে তার মৃত্যুর পর চাচার সকল সম্পত্তির মালিক হবে। ঐ ভাতিজা চাচাকে হত্যা করল তাড়াতাড়ি সম্পত্তি লাভের জন্য। রাতের বেলা চাচাকে মেরে বনি ইসরাইলেরই আরেক লোকের বাড়ির দরজাতে লাশ রেখে দিল। সকালে সবাই ঘুম থেকে ওঠার পর এ নিয়ে বনি ইসরাইলের ঐ দুই পরিবারের মধ্যে বিশাল বড় ফ্যাসাদ লেগে গেল। অতঃপর তাদের মধ্য থেকেই এক নেককার বান্দা যখন বললেন, "তোমাদের মাঝে আল্লাহর একজন রাসূল (মুসা আলাইহিস সালাম) উপস্থিত থাকার পরও তোমরা এরকম ঝগড়া করছ?"

তখন তারা লজ্জিত হয়ে মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এর সমাধান চাইল এবং মুসা (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে একটি গাভী জবাই করে সেই গাভীর অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত

CamScanner

করতে বললেন, সেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে সব সত্য বলে দিল, তার ভাতিজাই সম্পত্তির জন্য তাকে খুন করেছে। এটাই হচ্ছে ঐ ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত হাকিকত বা মূল ঘটনা। এটাই চরম সত্য। এই ঘটনাটির মধ্যে বাহ্যিকভাবেই আমাদের জন্য অনেক কিছু শেখার আছে।

১. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ভাতিজা ধৈর্য্য ধরলেই চাচার মৃত্যুর পর তার সকল সম্পত্তির মালিক সে হতে পারত। কিন্তু সে লোভের পথে পা রেখে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হলো, আখিরাতও হারাল।

২. সে তার চাচাকে হত্যা তো করলই উল্টো আরেক নির্দোষ ব্যক্তির দরজার সামনে লাশ রেখে সে বনি ইসরাইলের দুই পরিবারের মাঝে বিশাল ফিতনার সৃষ্টি করল। উভয় পরিবার একে অপরের ওপর চড়াও হলো। ফিতনা সৃষ্টি হত্যার চেয়েও গুরুতর গুনাহ। ফিতনা সৃষ্টি করা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে।

৩. আমাদের জীবনের যে কোন ফ্যাসাদে আমরা যেন পবিত্র কুরআন ও প্রিয় নবীজির (ﷺ) শিক্ষার কাছে ফিরে যাই।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের মধ্যে যারা (উপযুক্ত) কর্তৃপক্ষ তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (সূরা নিসা: আয়াত নং-৫৯)

"আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের (উপযুক্ত) কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত: আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয়

CamScanner

লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!" (সূরা নিসা:৮৩)

৪. উপযুক্ত শাসক বা কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে আমরা যেন যে কোন ফ্যাসাদে না জড়াই।

৫. রাষ্ট্রের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজেরা যেন আইন হাতে তুলে না নিই বরং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যেন যাই।

৬. অযথা প্রশ্ন যেন না করি। এতে করে দ্বীন আমাদের জন্য কঠিন করে দেয়া হয়। বনি ইসরাইল যদি যেকোন একটি গরু জবাই করে সেই গরুর একটি টুকরু দিয়ে আঘাত করত মৃত ব্যক্তির গায়ে তাহলেই হয়ে যেত। কিন্তু তারা একের পর এক প্রশ্ন করছিল। গাভিটি কেমন হবে, বয়স কেমন, রঙ কেমন, নিখুঁত নাকি খুঁতওয়ালা হলেও চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাদের জন্য এই বিষয়টিকে কঠিন করে দিয়েছেন। বিরল রঙ, দুষ্প্রাপ্য বয়স ও বৈশিষ্ট্যওয়ালা এক গাভীর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যাও এখন এরকম গাভী খোঁজে এনে জবাই করে তার অংশবিশেষ দিয়ে ঐ লাশের গায়ে আঘাত কর।

যাই হোক, এসবই হচ্ছে এই আয়াতের বাহ্যিক তাফসির। এই বাহ্যিক অর্থ মেনেই সুফিগণ পবিত্র কুরআন শরিফের প্রতিটি আয়াতের একটি নিগুঢ় অর্থের সন্ধান দেন, যা বাহ্যিক অর্থটি থেকে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কুরআন শরিফের আয়াতসমূহের গোপন অর্থের প্রতি সেই ইশারামূলক তাফসিরকে বলে তাফসির ইশারি বা সুফিয়ানা তাফসির।

যেমন আল্লাহ পাক যখন মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তার কওমকে গাভী জবাই করতে বলেছিলেন, সেই গাভী দ্বারা আসলে বুঝানো হয়েছিল "নফসে আম্মারা"। নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তিকে কুরবানী করতে বলা হয়েছিল। নিজের মনগড়া মতবাদে জীবন

পরিচালনা পরিত্যাগ করে নফসকে সম্পূর্ণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ইচ্ছার কাছে সমর্পন করতে বলা হয়েছিল।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

"মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়-হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।" (সূরাতুল বাক্বারা: আয়াত নং-৭১)

সেই নফস (গাভী) এমন নফস ছিল যা মুজাহাদা বা সাধনার আগুনে কোনদিন জ্বলেনি। তাহাজ্জুদ গোজার যাকে দিয়ে হয়নি, আল্লাহর জিকিরের সেচ দিয়ে যেই নফসকে সিক্ত করা হয়নি, প্রিয় নবীজির (ﷺ) দরুদ ও সালাম দিয়ে যেই নফসকে নিড়ানী দেয়া হয়নি। এমন অন্তর যা আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার অশ্রুতে কোনদিন সিক্ত হয়নি। এই নফসকে কুরবানী দিতে বলা হচ্ছে যা মৃতবৎ লাশের ন্যায়। এই নফসে আম্মারাকে কুরবানী দিলেই কেবল মুর্দা দিল জিন্দা হতে পারে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"অতঃপর আমি বললাম: গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর। (সূরাতুল বাক্বারা: আয়াত নং-৭৩)

গরুর সেই অংশটি দ্বারা রুপক অর্থে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি, আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর রহমতের আশাকে বুঝানো হয়েছে।

CamScanner

এর দ্বারা মুর্দা দিল (লাশ) কে আঘাত করলেই কেবল তা জিন্দা হতে পারে হক্ব বলার জন্য, সত্য উন্মোচন করার জন্য।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়েগেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়েখসে পঙতে থাকে! আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (সূরাতুল বাক্বারা: আয়াত নং-৭৪)

তারপরই আসছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি। মানুষের মুর্দাদিল বা অন্তর কতটা কঠিন হতে পারে তার বর্ণনা। যেই অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তাঁর শাস্তির ভয় নেই, দোজখের আজাবের ভয় নেই, তাঁর ভালোবাসা নেই, তাঁর রহমতের আশা নেই, ইবাদাত নেই, নবীপ্রেম নেই, জিকির নেই, না তার দ্বারা দ্বীনের কোন কাজ হয়, মানুষের হেদায়াতের কাজ তো হয়ই না। এই অন্তরের কথাই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়েগেছে। এরকম অন্তরের অধিকারী তারাই যারা আল্লাহর নিদর্শন দেখেও অস্বীকার করে, আল্লাহর নিয়ামত পেয়েও যারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই অন্তর হচ্ছে গাফিল মানুষের অন্তর যা কুফরির উপর রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ পাক এই আয়াতে তিন ধরনের পাথরের উপমা এনে তিন ধরনের মুমিনদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মুমিনগণ মূলত: ৩ প্রকার।

প্রথম প্রকার: সবচাইতে উঁচু দরজার মুমিনগনের, যাদের অন্তর আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসাতে বিগলিত হয়, চোখে অশ্রু আসে

আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায়, তাঁর রহমতের আশায়, সেজদায়-তাহাজ্জুদে জিকিরে, সেসব মানুষ নিজেরও চরম উপকার করছেন, আবার তাঁদের দ্বারা অসংখ্য মানুষও উপকৃত হচ্ছে। পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। এই আয়াতাংশ দ্বারা সে সমস্ত মানুষকে বুঝানো হয়েছে যারা নিজেরাও আল্লাহর ভয়ে কম্পমান, ভালোবাসায় সিক্ত আবার ঝর্ণার মত বয়ে গিয়ে বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত হেদায়াতের নদী সৃষ্টি করেছেন, আশেপাশের এবং দূর দূরান্তের মানুষকেও আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন, মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছেন। তাঁরাই আল্লাহর নবী-রাসূলগণ ও আউলিয়াগণ।

দ্বিতীয় আরেকটি প্রকার হচ্ছে, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়"।

এই দ্বিতীয় প্রকারের মুমিন হচ্ছেন তারা যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, ভালোবাসা আছে, তাঁরা নেককার-পরহেজগার, কিন্তু অপরের জন্য তাঁদের খেদমত অতদূর নয় যেমনটা প্রথম প্রকারের মুমিনগণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাদের দ্বারাও মানুষ উপকার পায়, দ্বীনের খেদমত পায় কিন্তু তা সীমিত পরিসরে।

আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হচ্ছেন তারা যাদের অন্তর আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় কেঁপে ওঠে শুধু এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে!" তাঁদের দ্বারা অন্য মানুষ হয়ত উপকার পায় না, দ্বীনের খেদমত হয়তো তাঁদেরকে দিয়ে হয় না, কিন্তু তাঁদের অন্তরেও তাক্বওয়া ও পরহেজগারী আছে।

আমাদের অন্তর যেন পাথরের মত শক্ত না হয়, আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় যেন বিগলিত হয়। আল্লাহ পাক এবং তাঁর হাবিবের (ﷺ) ভালোবাসায় যেন অন্তর সিক্ত থাকে, তাঁদের আনুগত্য যেন আমরা করতে পারি, আমাদের নাম যেন কৃতজ্ঞ বান্দাদের খাতায়

লেখা হয়, আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ পাক যেন তওফিক দেন। আমিন।

ধারণা: শায়খুল ইসলাম আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী (মা জি আ) র লেকচার থেকে।

বিস্মৃত কথা শোনার কলা!

মূল: ইসলামি আদব, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গোদ্দাহ

যদি কেউ আপনাকে এমন কোন ঘটনা বা কোনকিছু বলা শুরু করে যা আপনি ভাল করেই জানেন, হয়ত আপনার একাকীত্বে অথবা অনেক মানুষের মাঝখানে, তখন আপনি এমন ভান করুন যেন আপনি এটা জানেনই না। এমন কিছু করা উচিৎ নয় যাতে এ বিষয়ে আপনার পান্ডিত্য প্রকাশ পায় অথবা ঐ ব্যক্তির কথার মাঝে কথা বলা উচিৎ নয়। বরং আপনার উচিৎ তার কথার দিকে মনোযোগ দেয়া এবং শোনা।

সম্মানিত ইমাম আত্বা ইবনু আবি রাবাহ বলেন, কিছু কিছু যুবক আমার কাছে এমন কিছু ঘটনা বলেন, যা আমি তার জন্মের আগে থেকেই জানি, তবুও আমি তার কথা এমনভাবে শুনি যেন আগে কখনোই শুনিনি।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহ. এবং হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক বলেন, যদি কেউ আপনাকে এমন কোন ঘটনা বা কোনকিছু বলা শুরু করে যা আপনি ভাল করেই জানেন, তখন এমন কিছু করা উচিৎ নয় যাতে এ বিষয়ে আপনার পান্ডিত্য প্রকাশ পায় অথবা ঐ ব্যক্তির কথার মাঝে কথা বলা উচিৎ নয়। এটা খুবই অভদ্র এবং বাজে কাজ।

সম্মানিত ইমাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব কুরেশি মিসরি রাহ. ইমাম মালিকের রাহ. একজন সাগরেদ তিনি বলেন, ইমাম লাইস

CamScanner

ইবনে সাদ এবং ইমাম সওরি রাহ. বলেন, মাঝে মাঝে কিছু মানুষ এমন কিছু বিষয় আমাকে বলেন যা আমি তাদের মা-বাবার বিয়ের আগে থেকেই জানি। তবুও আমি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, যেন আমি এসব কোনদিন শুনিনি।

ইব্রাহিম ইবনে জোনাইদ রাহ. বলেন, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার সন্তানকে শিক্ষা দিলেন, কথা শোনার কলা রপ্ত কর, যেভাবে তুমি কথা বলার কলা রপ্ত কর।

ভালো ভাবে কারো কথা শোনা মানে হচ্ছে, চোখাচোখি ঠিক রাখা, বক্তাকে তার বক্তব্য শেষ করার সুযোগ দেয়া এবং তার বক্তব্যের মাঝে অসুবিধা করার ইচ্ছা থেকে বিরত থাকা।

হাফিজ খতিব বাগদাদী রাহ. এক কবিতাতে বলেন,

"কখনো কারো কোন বক্তব্যের মাঝে কথা বলো না, যদিও তুমি ঐ বক্তব্যের ভেতর-বাহির ভাল করে জান।"

আল্লাহর বন্ধুগণের ইবাদাত ও মুফতির ইবাদাত

মূল: রিসালাহ কুশাইরিয়া, ২/৭৩৩

একবার ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. নামের অনেক বড় বুজুর্গ ও ইবাদাতকারী আল্লাহর ওলীর সাথের সাক্ষাৎ করতে মরুভূমির মাঝখানে গেলেন। হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. মরুভূমির মাঝখানে থাকতেন আর ছাগল ও মেষ চড়াতেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. যিনি ইমাম শাফিয়ি রাহ. এর সাগরেদ ছিলেন, বললেন, ইয়া শায়খ! আমরা কী হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. কে শরীয়তের কিছু মাসয়ালা মাসাইল জিজ্ঞেস করব

না? যেন আমরা জানিতে পারি যে তিনি যে ইবাদাত করছেন তা কী সুন্নাহ অনুসারে হচ্ছে কী না?

ইমাম শাফিয়ি রাহ. বললেন, হে আহমদ ইবনে হাম্বল, শরীয়তের ব্যাপারে তিনি আমাদের চেয়ে বেশি অবগত আছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. বললেন, তবুও আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য আমাকে কটা প্রশ্ন করতে দিন।

তিনি হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া শায়খ! আপনাদের যদি নামাজে ভুল হয় তখন কী করেন?

হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. বললেন, এই প্রশ্নের জবাব কি আপনাদের মাযহাব অনুযায়ী দেব নাকি আমাদের মাযহাব অনুযায়ী?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, এই ব্যাপারে আপনাদের নিজস্ব মাযহাব আছে?

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. বললেন, আগে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জবাব দিন।

হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. সিজদা সাহু সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করলেন ফুকাহাগণের মতামত সহ।

বিস্তারিত শুনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন, এখন এই ব্যাপারে আপনাদের কী মাযহাব বলুন।

হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. বললেন, আমাদের তরিকা হচ্ছে আল্লাহর সামনে নামাজে দাঁড়িয়ে যদি আমাদের ভুল হয়, তার মানে আমাদের অন্তর আমাদের সাথে নেই, আমাদের কলব আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে গেছে। এরকম প্রতিটি ভুলের জন্য আমাদের অন্তরকে ঠিক করতে এক বছর পর্যন্ত রাত্রি জাগরন করি এবং দিনে রোজা রাখি।

CamScanner

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. বললেন, ইয়া শায়খ আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল।

ইমাম শাফিয়ি রাহ. বললেন, হে আহমদ ইবনে হাম্বল যথেষ্ট হয়েছে তাই নয় কী?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন, ইয়া শায়খ আমার অন্তরকে শান্ত হতে দিন।

তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, ইয়া শায়খ! এই যে আপনার এত এত ছাগল-মেষ। এগুলোর জাকাত কীভাবে দেন?

হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. আবারও বললেন, প্রশ্নের জবাব কী আপনাদের মাযহাব অনুযায়ী দেব নাকি আমাদের মাযহাব অনুযায়ী?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, এই ব্যাপারেও আপনাদের নিজস্ব মাযহাব আছে?

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

ইমাম আহমদ বললেন, আগে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জবাব দিন।

হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ.বললেন, চল্লিশটি ছাগল বকরি ও মেষে একটি দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করলেন ফুকাহাগণের মত সহ।

এবার ইমাম আহমদ বললেন, এখন আপনাদের মাযহাব অনুযায়ী বলুন।

হযরত শাইবান আর রায়ি রাহ. বললেন, আমাদের মাযহাব হচ্ছে, العبد و المال لسيده

"দাসের জীবন ও মাল তার মালিকের জন্য।"

আমাদের বকরি, মেষ থেকে আল্লাহর যেই বান্দা যেভাবে ইচ্ছা উপকার নিক, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। যার দুধ দরকার

সে দুধ নিয়ে যাক, যার গোশত দরকার সে মেষ নিয়ে যাক, সম্পদ তো আমার নয়, আল্লাহর।

তাদের সম্পর্কেই সম্ভবত কুরআন শরিফে বলা হয়েছে,

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। (সুরা ফাতির, ৩৫ঃ৩২)

সূত্রঃ রিসালাহ কুশাইরিয়া, ২/৭৩৩

শায়খ মোহাম্মদ মোতাওয়াল্লি শা'রাবির রাহ. কঠিন আত্মশুদ্ধির সাধনা

শায়খ মোহাম্মদ মোতাওয়াল্লী শা'রাবি আজহারী রাহ. মিশরের সবচাইতে জনপ্রিয় নাম। বিদগ্ধ মুফাসসির, ফকিহ ও অসাধারণ বক্তা। আরবি ভাষাতে হাল জমানায় এত influencial বক্তা আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। বর্তমানে শায়খ হাবিব আলী জিফরির মাঝে উনার ছায়া দেখতে পাই। শায়খ মোতাওয়াল্লী শা'রাবি রাহ. শুধু যে একজন বিখ্যাত আলীম ও বক্তা ছিলেন তাই না, একজন আপাদমস্তক সুফি ছিলেন তিনি।

একবার শায়খ মোতাওয়াল্লী শা'রাবি রাহ. মিশরের তানতা নামক এক জায়গায় গেলেন interfaith dialogue (আন্তঃধর্মীয় সংলাপ) এ অংশ নিতে। সেখানে খ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন করা হলো তাঁকে। তিনি সেসব প্রশ্নের একদম দাঁতভাংগা জবাব দিলেন। তারা হযরত ইসা আঃ, crucification, trinity, মারিয়াম আঃ সহ আরো বহু বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি ঠিক ঠিক জবাব দিলেন। শায়খকে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা প্রশ্ন করলেন, ইয়া শায়খ মোতাওয়াল্লি! আপনারা আমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করেন ঠিকই, কিন্তু আমাদেরকে আপনাদের মুসলিমা মেয়েদেরকে বিয়ে করতে দেন

না। আপনাদের কুরআন আমাদেরকে সেই অধিকার দেয় না। এর কারণ কী? এটা কী অবিচার নয়?"

শায়খ মোতাওয়াল্লি শা'রাবি রাহ. মুচকি হেসে বললেন, আমরা আপনাদের নবীকে (ইসা আঃ) মানি, আবার আমাদের নবীকেও মানি। কিন্তু আপনারা আপনাদের নবীকে মানেন, কিন্তু আমাদের নবীকে মানেন না। তাই আমাদের কুরআন আপনাদের সাথে অর্ধেক আত্মীয়তার অধিকার দিয়েছে। কারণ আপনাদের বিশ্বাস আমাদের ব্যাপারে অর্ধেক। যেদিন আমাদের নবীকে মানবেন সেদিন আমাদের মেয়েকেও আপনারা বিবাহ করতে পারবেন।

উপস্থিত জনতা তুমুল হাত তালি দিল, তাকবির দিল।

উনার বড় ছেলে এবং আরো কয়েকজন ছাত্র উনার সাথে ছিলেন, উনার বড় ছেলে বলছেন, "ফেরার পথে আমাদেরকে আব্বা বললেন একটা পেট্রল পাম্পে থামার জন্য। উনি ওয়াশরুমে যাবেন। আমাদেরকে গাড়িতে বসে থাকতে বললেন, তিনি একা ওয়াশরুমে গেলেন। অনেক সময় হয়ে গেল আব্বা ফিরছেন না। একসময় আমরা দুই তিন জন তাঁর খুঁজে ওয়াশরুমে গিয়ে দেখলাম, আব্বা নিজের হাতে ঘষে ঘষে ময়লা কমোড পরিষ্কার করছেন।"

আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আব্বা আপনি হাত দিয়ে ঘষে কমোড পরিষ্কার করছেন কেন? এজন্য লোক আছে আলাদা, আর এখানে ব্রাশও আছে, কমোড পরিষ্কার করার ক্যামিকেলও আছে, সব রেখে নিজ হাতে ঘষে কমোড পরিষ্কার করছেন কেন?"

শায়খ জবাব দিলেন, একটু আগে যে ডিবেটে আমি জয়ী হয়ে আসলাম, সেখানে জনতা খুশিতে হাততালি দিচ্ছিল, তাকবির দিচ্ছিল, আমার নামে বিজয়ধনি করছিল। এসবের কারণে আমার ভেতরে অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। My ego boosted up. সেই ইগোকে কাবুতে আনতে, নফসকে ডাউন করতে চেষ্টা করছি

এই কমোড পরিষ্কারের মাধ্যমে। বাগে আনতে পারছি না কোনভাবেই।

সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

নেক সাহচর্য ছাড়া এই বিষয়গুলো শুধু কিতাব পড়ে পাওয়া যায় না। এগুলোর প্রাকটিকাল ক্লাস নেয়া হয় সত্যিকারের সুফিগণের আস্তানায়।

সূরা কাহফেই "মুর্শিদ ও ওলি" শব্দ দুখানা আসলো কেন?

কখনো চিন্তা করেছি কি কুরআন মাজিদের বাকি ১১৩ খানা সূরা রেখে এই সূরা কাহফ ১৮ নং সূরার ১৭ নং আয়াতেই কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা "মুর্শিদ ও ওলি" দুটো শব্দ উল্লেখ করলেন? এটা কী কোন কাকতালীয় ঘটনা? না, কুরআন মাজিদে কোন কিছুই অকারণে আসেনি, নেই কোন কাকতালীয় ঘটনা। বরং প্রত্যেকটি বিষয়ের পেছনেই সূক্ষ্ম কিছু কারণ আছে।

কারণ হাজারো থাকতে পারে, তবে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই সূরাতেই (৯-২৬ নং আয়াত পর্যন্ত) আসহাবে কাহফের (গুহার অধিবাসী) সেই সাতজন আল্লাহর ওলী ও তাদের সেই বিখ্যাত সাথী এবং তাদের গোলামীর জন্য লালায়িত কুকুরের ঘটনাটি এসেছে। তাফসিরে কুরতুবিতে এসেছে, ঐ সাতজন আল্লাহর ওলী কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন পাথর মেরে। এই ভয়ে যে সে ঘেউ ঘেউ করবে। এতে অত্যাচারী রোমান সম্রাট দাকিয়ানুসের লোকজন বুঝে ফেলবে যে, তারা ঐ গুহাটির ভেতরে লুকিয়ে আছেন। কুকুরটি আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইল, তার জবান খুলে দেয়া হলো। সে বলল, হে আল্লাহর ওলিগণ আমি কোন ঘেউ ঘেউ করা কুকুর নই। আমি আল্লাহর ওলিগণকে ভালবাসি।

CamScanner

আল্লাহ পাক ঐ কুকুরকে তাদের একজন সংগী হিসেবে গণ্য করলেন। বললেন, যদি আসহাবে কাহফের সদস্য তিনজন হয় তবে ৪র্থ জন তাদের কুকুর, ৫ জন হলে ৬ষ্ঠ জন তাদের কুকুর, ৭ জন হলে ৮ম জন তাদের কুকুর।

ঐ কুকুরটি গুহার সামনে কীভাবে দুই পা বিছিয়ে আল্লাহর ওলিগণকে পাহাড়া দিচ্ছিল তাও বর্ণনা করেছেন কুরআন মাজিদে।

একটা কুকুর যাকে আমরা শরীয়তের পরিভাষায় নাপাক প্রাণী হিসেবে জানি, যেই প্রাণীটি আপনার থালা বাসনে মুখ দিলে মাটি দিয়ে লেপে, সাতবার পানি দিয়ে ধুতে হয়। সেই প্রাণীটিই কুরআন মাজিদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল শুধুমাত্র আল্লাহর ওলিগণের সোহবত বা সাহচর্য নেয়ার কারণে।

অতঃপর আল্লাহ পাক এই সূরা কাহফেই (৬০-৮২ নং আয়াত পর্যন্ত) মুসা আ: ও খিদির আ: এর সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন। মুসা আ: জলিল কদর নবী ও তাওরাত কিতাবপ্রাপ্ত রাসুল হওয়ার পরও আল্লাহ পাক উনাকে খিদির আ: এর সাহচর্যে পাঠালেন। বেশিরভাগ মুফাসসিরিন বলেছেন, খিদির আ: নবী ছিলেন না, বরং ওলি ছিলেন।

মুসা নবীর আ: একজন ওলির সাহচর্যে যাওয়ার মাধ্যমে, এই সাহচর্য নেয়াটাকে আল্লাহ পাক সুন্নাতে রাসুল বানিয়ে দিলেন। ওলি যদি নবীর কাছে যেতেন তবে তা হত বরকত, যা শরীয়তের কোন দলিল না।

কিন্তু এটাকে সুন্নাত বানিয়ে দেয়া হল।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেককার, পরহেজগার আল্লাহর কামিল ওলীগণের সাহচর্য নসীব করুন। এখানেই জীবনের সফলতা। আমিন।

একজন ইমাম ও কৃষ্ণাঙ্গ দাসের অসাধারন কাহিনী

ইংলিশ লেকচারঃ শায়খুল ইসলাম আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদরী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বর্ণনা করেন, একবার আমি মক্কা শরিফে ছিলাম এবং সেখানে বহুদিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছিল না। মানুষ এবং পশুপাখি সবাই বৃষ্টির জন্য লালায়িত ছিল, সবার কষ্ট হচ্ছিল। সবাই সালাতুল ইসতেসকা (বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ) পড়ার মনস্থ করলেন। পরের দিন সূর্যোদয়ের পর সবাই বায়তুল্লাহ শরিফে এসে সালাতুল ইসতেসকা আদায় করলেন, দোআ করলেন তবুও বৃষ্টি এলো না। সবাই হতাশ হয়ে বসে রইলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বলেন, আমি বাব বনী শাইবার নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম এক কালো কৃষ্ণাঙ্গ দাস হেরেম শরিফে প্রবেশ করল এবং দু রাকাত নামাজ পড়ে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলল, "হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ অনেক বেশি এবং নেককাজ খুব কম। আমাদের গুনাহ তোমার রহমতের বৃষ্টির পথে অন্তরায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গোনাহের দিকে না তাকিয়ে আপনার রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।" সাথে সাথে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। হেরেম শরিফ থেকে বের হওয়ার পর আমি ঐ ছেলের পেছন পেছন যেতে লাগলাম সে কোথায় থাকে দেখার জন্য। দেখে নিলাম সে কোথায় থাকে।

পরে আমি এই ঘটনা গিয়ে হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ ও ইমাম সুফিয়ান সওরির রাহ. কাছে বর্ণনা করলাম। তাঁরা দুজনই আমাকে বললেন, তুমি যাও এবং ঐ ক্রীতদাস কালো যুবককে কিনে নিয়ে এস। আমরাও তোমার সাথে যাব তার সাথে দেখা করতে। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহঃ বলেন, আমি তাঁদের দুজনকেই বললাম, ওখানে কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে।

CamScanner

আপনাদের যাওয়া সমীচিন হবে না, আমি বরং একাই ঐ দাসের মালিকের কাছে যাই।

তরুন সমাজের জন্য উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ছিলেন ইমামে আজম হযরত আবু হানিফার রাহ. সাগরেদ এবং ইমাম বুখারীর রাহঃ দাদা ওস্তাজ। কারণ ইমাম বুখারীর বাবা হযরত ইসমাইল রাহঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রাঃ ছাত্র ছিলেন। অপরদিকে ইমাম ফুজায়েল ইবনে আয়াজ রাহঃ ছিলেন ইমাম মালিকের রাহঃ ওস্তাজ। আর ইমাম সুফিয়ান সওরি রাহঃ তো সকল পরিচয়ের উর্ধ্বে। তাঁকে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিসও বলা হয়। কাজেই হযরত সুফিয়ান সওরি, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ফুজায়েল ইবনে আয়াজ রাহঃ এই তিনজনই ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম এবং আলীমে দ্বীন।

যাই হোক, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহঃ একাই গেলেন ঐ ক্রীতদাস যুবকের মালিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কোন দাস আছে? ঐ লোক বললেন, হ্যাঁ আমার ১৪ জন দাস আছে যারা আমার জন্য কাজ করে এবং টাকা আয় করে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাঃ বললেন, ওখান থেকে কোন দাস আমার কাছে বিক্রি করবেন? ঐ ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ আপনি যাকে চান তাকেই কিনতে পারেন। অতঃপর একে একে ১৪ জনকেই হাজির করা হলো। ১৪তম ব্যক্তি ছিল ঐ নেককার পরহেজগার কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। ইবনে মুবারক রাঃ বললেন, আমি একেই কিনতে চাই।

ঐ ব্যক্তি বললেন, একে দিয়ে তো আপনার কোন কাজ হবে না। ওহ তো কোন কাজই করতে পারে না। হালকা পাতলা দুর্বল। আপনি অন্য কাউকে কিনুন যে আপনার জন্য কাজ করবে এবং টাকা রুজি করে আনবে।

ইবনে মুবারক রাঃ বললেন, ও যখন এতই অকর্মন্য আপনি তবে ওকে রেখেছেন কেন? ঐ লোক বললেন, ওকে তো আমি কাজের

জন্য রাখিনি বরং আল্লাহর রহমত-বরকত লাভের জন্য রেখেছি। সে কম খায়, কম ঘুমায়, সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে।

ইবনে মুবারক রাহঃ বললেন, না আমি একেই কিনতে চাই। ঐ ব্যক্তি বললেন, যান তাকে আপনাকে দিয়ে দিলাম।

ঐ কালো ক্রীতদাস যুবক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহঃ কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ইমাম! আমি তো কোন কাজের না আপনি আমাকে কেন কিনছেন?

ইমাম ইবনে মুবারক রাহঃ বললেন, আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে আল্লাহর রহমত ও বরকত পেতে চাই।

ঐ কালো ক্রীতদাস যুবক বুঝে গেলেন এবং বললেন, আপনি কি গতকাল আমাকে হেরেম শরিফের ভেতরে বাবে বনি শাইবার নিকটে নামাজ পড়তে ও দোআ করতে দেখে ফেলেছেন? ইমাম ইবনে মুবারক রাহঃ বললেন, হ্যাঁ।

সাথে সাথে কালো ক্রীতদাস যুবক দুচোখের পানি ঝরঝর করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আহ্। ওহ আল্লাহ আমাকে প্রকাশ করে দিলে?" ইমাম ইবনে মুবারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ইমাম এখন সালাতুদ দ্বোহার (প্রভাতের নামাজ) সময়, আমাকে দুরাকাত নামাজ পড়তে দিন। কালো ক্রীতদাস নেককার যুবক দুরাকাত নামাজ আদায় করলেন এবং নামাজ শেষে হাত তুলে কাঁদতে লাগলেন আল্লাহর দরবারে। বলতে লাগলেন, হে আমার রব্ব! আপনার ও আমার মধ্যকার এই মুহাব্বাতের সম্পর্কটি ছিল একটি গোপন রহস্যাবৃত বিষয়। হে মাবুদ আপনি সেটি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেন? ইমাম ইবনে মুবারক জেনেছেন, তাঁর কাছ থেকে ইমাম সুফিয়ান সওরি ও ফুজায়েল ইবনে আয়াজ রাহঃ জেনেছেন। তাঁদের কাছ থেকে এখন দুনিয়ার সকল মুসলমান জানবে। হে আমার রব্ব! কোনকিছুই তো গোপন রইল না। সবাই যখন জেনেই যাচ্ছে আপনার ও আমার মধ্যকার এই সম্পর্কের কথা সেহেতু আমার আর এই দুনিয়াতে থাকার কোন ইচ্ছা নেই।

CamScanner

আমাকে আপনার কাছে নিয়ে যান। ঐ নেককার ওলি কৃষ্ণাঙ্গ যুবক সেই জায়নামাজেই সাথে সাথে ইন্তেকাল করলেন।

তথ্যসূত্রঃ সিফাতুস সাফওয়া, ইবনে জওজি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৬৮, আল রিক্কা ওয়াল বুকা, ইমাম ইবনে কুদামাহ আল মাকদিসী, পৃষ্ঠা নং-১৯২

ইসলামের প্রথম যুগে এরকম ইখলাস একনিষ্ঠা ও একাগ্রতার ঘটনা ঘটেছে তাসাউফ ও তরিকতপন্থীদের জীবনে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে রিয়া (লোক দেখানো) মুক্ত ইবাদাত ও জীবন যাপনের তওফিক দেন। আমিন।

একটি গল্পঃ আমাদের জন্য রুহানী শিক্ষা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন এবং তার চারজন স্ত্রী ছিলেন। রাজা শেষ বয়সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যুশয্যায় রাজার মনে একা একা কবরে থাকার বিষয়ে খুব বেশি ভয় সৃষ্টি হলো। তার মনে পরকাল সম্পর্কে এত ভয় সৃষ্টি হলো যে, তিনি একা একা এই কঠিন পথ পাড়ি দিবেন সেটা মনে করে অস্থিরতা বোধ করতে লাগলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার চার স্ত্রীর যে কোন একজনকে তার সাথে কবরে নিয়ে যাবেন। তিনি প্রথমে তার ছোট স্ত্রী চার নাম্বার জন, যাকে তিনি সবচাইতে বেশি ভালোবাসতেন, যার জন্য দামি দামি হীরা জহরতের অলংকার ও মূল্যবান কাপড় চোপড় কিনে দিয়েছিলেন তাকে বললেন, তুমি কি আমার কবরে আমার সঙ্গী হবে? আমার পরকালের সাথী হবে?"

চতুর্থ স্ত্রী না বলে চলে গেলেন।

তৃতীয় স্ত্রীকেও রাজা খুব ভালোবাসতেন, এই স্ত্রীকে নিয়ে রাজা খুব গর্ব করতেন তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজাদের সাথে। তাকেও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি পরকালে আমার সাথী হবে,

আমার সাথে মরতে ও কবরে যেতে রাজী আছ?" এই রানীও বললেন, আমি পারব না, আমি আমার জীবনকে অনেক ভালবাসি। আপনার মৃত্যুর পর আমি আবার বিয়ে করব।

দ্বিতীয় স্ত্রী যিনি সব সময় রাজাকে বিপদে আপদে সাহায্য করতেন তাকেও রাজা একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমি তা পারব না, তবে আমি আপনার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করব, ততদিন পর্যন্ত আমি আপনার সাথে আছি।"

দূর থেকে একটি আওয়াজ আসল, আমি আপনার সাথে যাব, আপনি যেখানে যান আমি আপনার সাথে যাব যদিও তা হয় পরকাল। আমি আপনার সাথে মরতে ও আপনার কবরের সাথী হতে রাজি আছি। ইনি ছিলেন রাজার প্রথম স্ত্রী যাকে রাজা সবচাইতে কম ভালোবাসতেন এবং যাকে সবচাইতে বেশি অবহেলা করতেন। যার আদর যত্ন খুব বেশি করেননি কোনদিন। রাজা লজ্জিত হলেন, তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং বললেন, আমার উচিত ছিল দুনিয়াতে থাকতে তোমার বেশি যত্ন নেয়া এবং তোমাকে সময় দেয়া।

নৈতিক শিক্ষা: আমাদের প্রত্যেকের চারজন স্ত্রী আছে এই দুনিয়াতে। চতুর্থ স্ত্রী হচ্ছে আমাদের শরীর। যাকে আমরা সবচাইতে বেশি ভালবাসি এবং খুব বেশি যত্ন নেই। এই শরীরকে আমরা গয়না দিয়ে সাজাই, দামি কাপড় দিয়ে সাজাই। শরীর অসুস্থ হলে চিকিৎসা করি। কিন্তু এই শরীর পরকালে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথী হয়না, এক সময় পচে গলে মাটির সাথে মিশে যায়।

তৃতীয় স্ত্রী হচ্ছে আমাদের সম্পদ। যাকে আমরা অনেক ভালবাসি এবং মানুষের সাথে গর্ব ও অহংকার করি যাকে নিয়ে। অথচ পরকালে তা আমাদের একটুও কোন কাজে আসে না, আমাদের সাথী হয়না। বরং আমাদের মৃত্যুর পর আরেকজনের হয়ে যায়।

CamScanner

দ্বিতীয় স্ত্রী হচ্ছে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। দুনিয়াতে থাকতে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করে কিন্তু পরকালে আমাদের সাথী হয়না। বেশি হলে জানাজা পর্যন্ত ও কবরে দাফন করা পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকে।

আর আমাদের প্রথম স্ত্রী হচ্ছে আমাদের নফস, কলব বা অন্তর। আমাদের আত্মা বা রুহ। যাকে আমরা এই দুনিয়াতে প্রচন্ড অবহেলা করি, যার কোন যত্ন আমরা নেই না। যাকে আমরা দুনিয়ার সকল পাপকর্ম দিয়ে দূষিত করে ফেলি। একে আল্লাহর জিকির দিয়ে আবাদ রাখি না। নামাজ দিয়ে, রোজা দিয়ে, কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে, প্রিয় নবীজির (ﷺ) দরুদ ও সালাম দিয়ে সতেজ রাখি না। অথচ এই আত্মা, রুহ, অন্তর, নফস বা কলব যেই নামেই নামকরণ করি না কেন, একমাত্র সেই আমাদের পরকালের সঙ্গী হয়।

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

শপথ (মানুষের) অন্তরের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর,

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

অতঃপর (মানুষের) অন্তরে অসৎকর্ম ও সৎকর্ম সম্পর্কে ইলহাম করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

যে নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

এবং যে নিজের অন্তরকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।
(সূরা শামস, আয়াত নং: ৭-১০)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)) ؛ متفق عليه

হযরত নুমান ইবনে বশির (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শোনেছি, সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরে একটি মাংসপিন্ড আছে তা যদি পরিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে পুরো শরীর পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর এই মাংস পিন্ডটি যদি দূষিত হয়ে যায় তবে পুরো শরীরই দূষিত হয়েযায়। সাবধান সেই মাংসপিন্ডটি হচ্ছে তোমাদের কলব বা অন্তর। (বোখারি ও মুসলিম)

সলফে সালিহিনের আখলাক

এক চোর ইমাম নববীর রাহ. পাগড়ি ছু মেরে কেড়ে নিয়ে দৌড় দিল। ঐ চোরের পেছনে পেছনে ইমাম নববী রাহ. দৌড়াতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আমি এই পাগড়িটির মালিক তোমাকে বানিয়ে দিলাম, তুমি বল, আমি কবুল করলাম।

মূলঃ রওদা আর রায়াহিন, ইমাম ইয়াফিই।

সুবহানাল্লাহ।

একজন দৌড়াচ্ছিল কীভাবে পাগড়ি নিয়ে ভাগবে আর অপরজন দৌড়াচ্ছিলেন কীভাবে তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করবেন!

তথ্যসূত্রঃ আল ইনসানিয়াতু কাবলাত তাদাইউন, শায়খ হাবিব আলী জয়নুল আবেদিন ইবনু আব্দির রাহমান আল জিফরি (মা জি আ)

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মাঝে আছেঃ একজন সাধকের অনুধাবন

জনৈক সাধক বলেন, আমি সুরা আসরে উল্লেখিত নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মাঝে আছে" এর মর্মার্থ বুঝতাম না। মানুষ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ততার মাঝে আছে? পরে একদিন বাজারে গেলাম, শুনতে

CamScanner

পেলাম এক বরফ বিক্রেতা চিৎকার করে বলছে, আমার বরফ আপনারা কিনে নিন, ارحم علي من يذوب رأس ماله

"আমার ওপরে দয়া করুন, আমি এমন মানুষ যার মূলধন গলে যায়!"

কাপড়, আসবাব পত্র, খাদ্য-শষ্যের অনেক দিন মেয়াদ থাকে। কিন্তু বরফ এমন এক জিনিস সাথে সাথে বিক্রি না হলে গলে যায়। পরের দিনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ঐ সাধক বললেন, ঐ মূহুর্তে আমি বুঝতে পারলাম সুরাতুল আসরের প্রথম আয়াতখানার মর্মার্থ। ঐ ব্যবসায়ীর পূজি বরফের মত আমাদের পূজি হচ্ছে আমাদের আয়ু। যা প্রতিটি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গলে গলে পড়ছে, কিন্তু আমরা উদাসীন। আয়ুকে কাজে লাগাচ্ছি না আল্লাহর ইবাদাতে, জিকিরে, ইস্তেগফারে, প্রিয় নবীজির (ﷺ) দরুদ-সালামে, মানবতার কাজে। আয়ু অপচয় করছি নফসের তাবেদারিতে, অবহেলায়, অলসতায়।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (٥٧:١٦)

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।

এক মজ্জুব আল্লাহর ওলির অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

এক ব্যক্তি দেখতে পেলেন এক মজ্জুব আল্লাহর ওলি বাজারে বসে কাঁদছেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন?

মজ্জুব আল্লাহর ওলি বললেন, আমি কাঁদছি বাজারের লোকগুলোর অবস্থা দেখে। এদের আল্লাহ-রাসুল ছেড়ে দুনিয়া মগ্নতা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এদের জন্য মায়া হলো, মনে করলাম আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধুত্ব করিয়ে দেই। আল্লাহর কাছে আরজ করলাম, "ইয়া আল্লাহ! এদেরকে কি ক্ষমা করা যায় না, তোমার পথে নেয়া যায় না?"

গায়েব থেকে আওয়াজ আসল, অবশ্যই! কেন না? একবার শুধু কায়মনো বাক্যে তওবা করতে বল তাদেরকে!

ওই মজ্জুব আল্লাহর ওলি বললেন, আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বুঝালাম, কিন্তু কেউ মানল না! যে যার মত দুনিয়াতেই মগ্ন রইল। আল্লাহ মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এরা মানল না।

এদের জন্য আমি কাঁদছি।

ঐ ব্যক্তি আবার আরেক দিন ওই একই আল্লাহর ওলি মজ্জুব ফকিরকে দেখলেন, তিনি কবরস্থানের পাশে বসে কাঁদছেন। ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম উনার কান্ড দেখে। তিনি বাজারে বসেও কাঁদেন, আবার কবরস্থানে বসেও কাঁদেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে তো কোন জনমানব নেই, তবে এখানে কার জন্য বসে কাঁদছেন?"

মজ্জুব আল্লাহর ওলি বললেন, আমি কাঁদছি কবরের লোকগুলোর অবস্থা দেখে। এদের ওপর প্রচন্ড আজাব হচ্ছে। এদের জন্য মায়া হলো, মনে করলাম আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধুত্ব করিয়ে দেই। আল্লাহর কাছে আরজ করলাম, ইয়া আল্লাহ! এদেরকে কি ক্ষমা করা যায় না, তোমার জান্নাতে কী এদেরকে জায়গা দেয়া যায় না?

CamScanner

এবার আল্লাহ মানলেন না, কবরের লোকগুলো ঠিকই মেনে ছিল। এদের ক্ষমার কোন রাস্তা আল্লাহ পাক আমাকে দেখালেন না। এদের জন্য আমি কাঁদছি। মৃত্যুর পর আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর আর কোন সুযোগ থাকে না। যা করার এই জীবনেই করতে হবে। হায় কখন বুঝব আমরা!

এজন্যই প্রিয় নবীজির (ﷺ) শানে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরেলি রাহ. বলেনঃ

"আজ লে উনকি পানাহ, আজ মদদ মাংগ উনছে,

"আজ লে উনকি পানাহ, আজ মদদ মাংগ উনছে!

ফির না মানেংগে কায়ামাত মে আগার মান গেয়া!"

"আজ উনার আশ্রয় নাও, আজ উনার সহায়তা চাও,

"আজ উনার আশ্রয় নাও, আজ উনার সহায়তা চাও!

কাল কেয়ামতের ময়দানে যদি ইজ্জত যায় তোমার তবে তিনি নাও মানতে পারেন!"

হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রাহ. সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির মধ্যকার শিক্ষনীয় ঘটনা

মূল: শায়খ রাজা সাকিব মুস্তাফাভি

দিল্লীর সম্রাট সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সারাজীবনের আফসোস ছিল তিনি হযরত সায়্যিদ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রাহ. খানকা ভ্রমণ করবেন ও উনার সাক্ষাৎ লাভ করবেন। কিন্তু হযরত সায়্যিদ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাহ. এতে সম্মত ছিলেন না, তিনি তার দরবারে কোন রাজা বাদশাহ আসতে দিতে রাজি না। শেষ পর্যন্ত যখন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি পীড়াপীড়ি শুরু করলে নিজামুদ্দিন

আউলিয়া রাহ. চিঠি লিখলেন সুলতানকে, তিনি লিখলেন, "হে সুলতান! ফকিরের খানকার দুটো দরজা থাকে, তুমি যদি সত্যি এসে পড় আমার খানকায় তবে তুমি সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে আমি পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাব। তোমার শহর আমি ছেড়ে চলে যাব।"

তারপরও সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি না জানিয়ে হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া রাহ. এর খানকাতে চলে আসলেন, খবর শুনে নিজামুদ্দিন আওলিয়া রাহ. তার হুজরার সামনে একজন দারোয়ান নিযুক্ত করলেন যেন ঐ সুলতানকে প্রবেশ করতে না দেয়। সুলতান একটা কাগজ নিয়ে লিখলেন, এটা আমি কী দেখলাম? বাদশাহের দরজাতেও দারোয়ান থাকে, ফকিরের দরজাতেও দারোয়ান, তাহলে বাদশাহের দরবার ও ফকিরের আস্তানার মাঝে বেশ কম কী হলো?"

কাগজটা দারোয়ান মারফত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার রাহ. কাছে গেলে, তিনি কাগজের অপর পৃষ্ঠায় লিখে দিলেন, বাদশাহের দরজাতে দারোয়ান থাকে গরিব মিসকিন ফকির আটকানোর জন্য, আর ফকিরের আস্তানার দরজাতে দারোয়ান থাকে বাদশাহকে আটকানোর জন্য। এটাই পার্থক্য।

দেখা না পেয়ে বাধ্য হয়ে সুলতান খাদিমকে বললেন, "হজরতের জিয়ারত যদি নাও হয় খানকা একটু ঘুরে দেখতে তো দিবেন?"

খাদিম বললেন, "কেন নয়?"

বাদশাহ সবকিছু দেখতে দেখতে ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করলেন। ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন ঘোড়ার খুড় রুপার তৈরি কাভার দিয়ে ঢাকা, আর তাদেরকে বেধে রাখা হয়েছে সোনার তৈরি শিকল দিয়ে।

সুলতান হয়রান হয়ে আবারও কাগজ নিয়ে লিখে পাঠাল, ইয়া শায়খ! বাদশাহের কাছেও স্বর্ন-রৌপ্য থাকে আবার ফকিরের কাছেও স্বর্ন-রৌপ্য? তাহলে পার্থক্য কোথায়?"

CamScanner

নিজামুদ্দিন আওলিয়া রাহ. আবারও কাগজের অপর পৃষ্ঠায় লিখে দিলেন, বাদশাহের কাছে স্বর্ন-রৌপ্য হীরা জহরত থাকে খাজাঞ্চি খানায় অতি যতনে, আর ফকিরের দরবারে এসব থাকে ঘোড়ার আস্তাবলে অযতনে।

নৈতিক শিক্ষা: আগের যুগের আওলিয়াগণ রাজা-বাদশাহ থেকে দূরে থাকতেন। তাদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতেন। আর আমরা এখনকার যুগের পীর ফকিররা নেতা-নেত্রী ও উচু শ্রেণির মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য লাইনঘাট খুঁজি, দালাল লাগাই। এরকম কেউ খানকাতে আসলে নিজের সম্মান বেড়েছে বলে মনে করি। হযরত বড়পীর দস্তগীরের রাহ. সময়কার প্রবল পরাক্রমশালী আব্বাসি খলিফা হাদিয়া হিসেবে এক থলী আশরাফি বা স্বর্নমুদ্রা দিলেন! বড়পীর দস্তগীর রাহ. সেই থলিটিকে নিয়ে একটা মোচড় দিলেন। সেই থলি থেকে তাজা রক্ত বের হয়ে আসতে লাগল। বড়পীর দস্তগীর রাহ. বললেন, এগুলো মানুষের ওপরে জুলম করে সংগ্রহ করা, আমার এসবে কোন প্রয়োজন নেই।

সম্মানিত পাঠক! আর আমরা?

"আমিত্ব" একমাত্র পর্দা যা দীদারে ইলাহির অন্তরায়

ইয়েমেনের বিখ্যাত শায়খ সুফি সায়্যিদ হাবিব আলী জয়নুল আবেদিন জিফরি (মা জি আ) কে একবার এক বোন চিঠি লিখলেন।

ঐ বোন লিখলেন, ইয়া শায়খ! আমি সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছি কিন্তু কোথাও আল্লাহকে পাইনি। আমি মক্কায় গিয়েছি সেখানে আল্লাহকে পাইনি, আমি মসজিদে গিয়েছি আল্লাহকে পাইনি, আমি আমার ঘরের এক কর্ণারে নামাজ পড়ি সেখানেও আল্লাহকে পাইনি। (অথচ হাদিসে জিবরিলে এসেছে আল্লাহকে দেখছি এমনভাবে ইবাদাত করতে)

ইয়া শায়খ! আপনি আমাকে বলবেন না, দান খয়রাত করতে, তাসবিহ তাহলিল করতে, তাহাজ্জুদ পড়তে। আমি সব করে দেখেছি কিন্তু আল্লাহর দীদার পাইনি।

আল্লাহর দীদার কীভাবে পাব বলুন।

শায়খ জবাব দিলেন, "বোন আমার। আপনি যেসব জায়গায় আল্লাহকে খোঁজেছেন সেখানে আল্লাহকে এখন পাবেন না। আপনি আপনার ভেতরে আল্লাহকে খুঁজেন নাই। আপনি আল্লাহ এবং আপনার মাঝখানের শুধুমাত্র একটা পর্দা তুলে দেন, তাহলে সকল জায়গায় আপনি আল্লাহকে পাবেন। সেই পর্দাটির নাম আমিত্ব বা Ego."

একদা একব্যক্তি হুজুর নবী কারিমের (ﷺ) দরজার কড়া নাড়লেন।

প্রিয় নবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, কে?

জবাব আসল, আনা অর্থাৎ আমি"।

জবাব শোনে প্রিয় নবী (ﷺ) ও বললেন, "আনা আনা" আমি আমি।

হাদিসখানার বর্ণনাকারী বলেন, মনে হল যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আগন্তুকের জবাবকে অপছন্দ করলেন।

আগের যুগের কোন কোন সলফে সালেহীন বলতেন, "আউজুবিল্লাহি মিন আনা। আমি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই"।

কিন্তু আমাদের জীবন পর্যালোচনা করলে তো শুধু আনারই কারবার দেখতে পাই। আমি, আমি সর্বত্র আমাকেই দেখতে চাই, আমারই চর্চা হোক, আমারই গুনগান হোক, আমি পাই, আমি খাই, আমি বাঁচি, আমি বড় হই... আমি আমি আমি...

আউজুবিল্লাহি মিন আনা...

CamScanner

হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর রাহ. কাফন চোরের ঘটনা

মূলঃ শায়খ হাবিব আলী জয়নুল আবেদিন জিফরি (মা জি আ)

হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর রাহ. যুগে এক কাফন চোর ছিল। সে মানুষকে কবর দিয়ে আসার দুই এক দিনের মধ্যেই রাতের বেলা কবর খুড়ে কাফন চুরি করে তা বাজারে বিক্রি করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করত। প্রচন্ড অভাবের তাড়নায় সে এই গোনাহের কাজ করত। এক পর্যায়ে সে হযরত বায়েজিদ বুস্তামির রাহ. সাক্ষাৎ পায় এবং উনার হাতে তওবা করে এই জঘন্য গোনাহের কাজ পরিত্যাগ করে।

বায়েজিদ বুস্তামীর রাহ. দরবারের অন্যান্য মুরিদানগণ ঐ প্রাক্তন কাফন চোরকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জীবনে কতগুলো কাফন চুরি করেছেন?

তিনি জবাব দিলেন, এক হাজারের কম হবে না।

তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই এক হাজার বা তার বেশি কাফন রাতের বেলা চুরি করেছেন কবর খুড়ে। নিশ্চয়ই আজব কোনকিছু কোন না কোন সময় দেখেছেন।

ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি ঐ এক হাজার বা তার বেশি কবরের কাফন চুরি করতে গিয়ে মাত্র দুইজন মানুষের মুখ কেবলা থেকে বিপরীত দিকে ফেরানো পেয়েছি।

অর্থাৎ সকলের মুখই কেবলার দিকে ফেরানো পেয়েছি কিন্তু দুজনকে শুধু পেয়েছি তারা কেবলার বিপরীত দিকে ফেরানো।

বায়েজিদ বোস্তামির রাহ. দরবারের লোকজনের মাঝে এই কথা শুনার পর একটা আতংক শুরু হয়ে গেল, সেই সাথে একটা উৎসাহও জাগল এর কারণ জানতে। কারণ কেবলা থেকে মুখ বিপরীত দিকে ফেরানোটাকে তারা খুব খারাপ বিষয় মনে করতেন। আল্লাহর নারাজীর কারণেই এরকম হয়েছে বলে মনে করলেন।

তারা ইমাম বায়েজিদ বুস্তামি রাহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া শায়খ এটার কারণ কী হতে পারে?

হযরত বায়েজিদ বুস্তামি রাহ. কিছু সময় চিন্তা করার পর বললেন, ঐ দুজন লোকের দুনিয়াতে থাকতে সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব যে আল্লাহর ওপর সেই ওয়াদার ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল না। সুরা হুদের এই আয়াতের প্রতি তারা বিশ্বাসী ছিল না যেখানে আল্লাহ পাক বলছেনঃ

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন... (১১ঃ৬)

এজন্য ফেরেশতারা আল্লাহর নারাজির চিহ্ন হিসেবে তার মুখকে কেবলা থেকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এই আয়াতের প্রতি যদি কারো বিশ্বাস পরিপূর্ণ হয় তবে সে রিজিকের জন্য হারাম পথে পা বাড়াতে পারে না।

হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনার রিজিকের ওয়াদার প্রতি বিশ্বাসী করে তুলুন। আমিন।

সুফিগণের সুফিয়ানা আখলাক ও কালাম

মূলঃ শায়খুল ইসলাম আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদেরি (মা জি আ), আন্তর্জাতিক সুফি কনফারেন্স, রামলিলা ময়দান, দিল্লী, ভারত।

ঘটনাপ্রবাহ-১ঃ

হিংগ্র তাতার চেংগিস খান ও হুলাকু খানরা যখন ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে বাগদাদ দখল করে নিল সেসময়ের কথা। হুলাকু খানের এক ছেলে উতার খান শিকার করার জন্য বাগদাদের পাশের

এক বনের উদ্দেশ্যে বের হলো। সাথে ছিল তার শিকারী কুকুর। পথিমধ্যে দেখা পেয়ে গেল হযরত বড়পীর দস্তগীর সায়্যিদ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানির রাহ. একজন সাগরেদ সুফি জালালুদ্দিনের রাহ.। ঐ হিংস্র উতার খানের মনে এই ফকির জালালুদ্দিন রাহ. কেও হত্যা করার ইচ্ছা জেগে ওঠল। এজন্য সে বাহানা খুঁজতে লাগল। সে জিজ্ঞেস করল, "হে ফকির! তোমার দাড়ি উত্তম না আমার কুকুরের লেজ উত্তম?" (নাউজুবিল্লাহ)

ঐ সুফি ফকির জালালুদ্দিন রাহ. সুফিয়ানা উত্তরই দিলেন, বললেন, যদি আমি আমার মালিক আমার রব আল্লাহ পরোয়ারকে রাজি খুশি করিয়ে ফেলতে পারি তবে আমার দাড়িই উত্তম। আর যদি আমি আমার মালিককে রাজি না করাতে পারি, আমার ওপরে সন্তুষ্ট না করাতে পারি তবে তোমার কুকুরের লেজই উত্তম। কারণ এই কুকুর আর কিছু না হউক তার মালিকের জন্য শিকার তো করছে। তার মালিককে তো খুশি রাখছে।

সেই সুফি ফকিরের এই কথা বলতে দেরী হলো কিন্তু চেংগিস পুত্রের দিল পরিবর্তন হতে দেরী হলো না।

ঘটনাপ্রবাহ-২:

ইমাম সুলামি তার কিতাবুল ফুতুয়াতে লিখেছেন, ইমাম মারুফ আল কারখি রাহ. একবার উনার সংগী-সাথীদেরকে নিয়ে দজলা নদীর পাড়ে ভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন সেখানে একদল যুবক অশ্লীল গান বাজনা করছে, শরাব পান করছে আর উদ্যাম নৃত্যতে মশগুল হয়ে আছে।

হযরত মারুফ কারখী রাহ. কে দেখেও তাদের নৃত্য, গান বাজনা ও শরাব পান বন্ধ হলো না। মারুফ কারখী রাহ. এর সাথীরা আরজ করলেন, ইয়া শায়খ! আপনি এদের জন্য বদদোয়া করুন। কত বেহায়া দেখুন, আপনাকে দেখেও তারা তাদের এই অবাধ্যচারীতা বন্ধ করল না।

হযরত মারুফ কারখী রাহ. দোয়া করার জন্য হাত ওঠালেন, বললেন, "হে আল্লাহ আপনি এদেরকে আখিরাতেও এরকম আনন্দে রাখুন, যেমন আনন্দে তারা এখন এই দুনিয়াতে আছে।

মারুফ কারখীর রাহ. সাথীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া শায়খ! আমরা অনুরোধ করলাম এদের জন্য বদদোয়া করতে আপনি তাদের আখিরাতে আনন্দে থাকার দোয়া করছেন?"

ইমাম মারুফ কারখী রাহ. বললেন, আল্লাহ যদি তাদের জন্য আমার এই দোয়া কবুল করেন অর্থাৎ আখিরাতে আনন্দে রাখেন, তবে এই দুনিয়াতেই তাদের তওবা নসীব হবে।

তথ্যসূত্রঃ ইমাম সুলামি, কিতাবুল ফুতুয়া, পৃষ্ঠা নং -৬০

ঘটনাপ্রবাহ-৩:

হযরত ইমাম সুফিয়ান সওরি রাহ. একবার জুমুয়ার দিনে গোসল করার জন্য দজলা নদীতে নামলেন। কাপড় রেখে গেলেন নদীর পাড়ে এক পাথরের ওপর। গোসল থেকে ওঠে দেখলেন কাপড় নেই। চোর কাপড় নিয়ে গেছে। পেরেশান হয়ে ভেজা কাপড়ে নদীর পাড়েই বসে রইলেন। একটু পর দেখলেন চোর কাপড় নিয়ে ফেরত চলে এসেছে। এসে কাপড় ফিরিয়ে দিল ইমাম সুফিয়ান সওরীর রাহ. হাতে। ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহ. দেখলেন চোরের হাত একটা প্যারালাইজড। এক হাত সে নাড়াতে পারে না। চোর কিছু বলার আগে তিনি হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ আপনি এই লোকের হাতের শক্তি ফিরিয়ে দিন, যেভাবে সে আমার কাপড় ফিরিয়ে দিয়েছে।

CamScanner

মোল্লাতান্ত্রিক তাসাউফ-তরিকত কেন ইমাম গাজ্জালী রাহ. ছুড়ে ফেলেছিলেন?

আমরা সবাই জানি যে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ আল-গাজ্জালী রাহ. বাগদাদের বিখ্যাত নিজামীয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। ৪ বছর সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। বর্ণিত আছে তাঁর কাছে সে যুগের সেরা ৪০০ জন আলীম শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এক পর্যায়ে রাতের আঁধারে বাগদাদ থেকে তিনি বের হয়ে যান। অতঃপর ১১ টি বছর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে দেশে ঘুরতে থাকেন। সিরিয়া, মিশর, হেজায, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশ। এই সময় তিনি তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত কিতাব "ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন" রচনা করেন। তরিকত-তাসাউফের অনবদ্য কিতাব।

প্রিয় পাঠক! ইমাম গাজ্জালী রাহ. তাসাউফ চর্চার জন্য বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসা ছেড়ে দেন। তখনকার যুগের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দ্বীনি শিক্ষার জন্য। কেন? তিনি কী মাদ্রাসার অধ্যাপনাতে থেকে তাসাউফ চর্চা করতে পারতেন না?

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল মাওলানা রুমির রাহ. জীবনেও। কেন তাঁদের মোল্লার লেবাস ফেলে দিয়ে সুফির লেবাস আঁকড়ে ধরার আগ পর্যন্ত কামিয়াবি মিলে নাই?

এর ব্যবহারিক উত্তর আমাদের চারপাশের তথাকথিত তাসাউফপন্থী উলামায়ে কেরামের দিকে তাকালেই পাবেন।

সত্যি কথা হচ্ছে, মোল্লার লেবাসের মধ্যেই একটা আমিত্ব আছে। এই আমিত্ব তাসাউফের পথে অন্তরায়। মোল্লায়িয়াতের মাঝে অন্যের মতকে ছোট করে নিজের মতকে বড় করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এগুলো তাসাউফের পথের অন্তরায়। মোল্লার লেবাসের মধ্যেই একটা গোপন হিংসা-বিদ্বেষ এবং অহংকার লুকিয়ে থাকে।

CamScanner

মোল্লাইয়াতের সেই খোলস খোলে ফেলে আসহাবে সুফফার লেবাস নেয়ার আগ পর্যন্ত কেউ সত্যিকারের সুফি হতে পারে না।

আমাদের আজকের সমাজে যা হচ্ছে তার মূলে আছে এই মোল্লাইয়াতের লেবাসে তাসাউফকে ধরে রাখার প্রবণতা। একদিকে আমরা প্রচন্ড ভোগবাদী, হিংসুক, আমিত্বে পরিপূর্ণ আবার অপরদিকে তাসাউফের দাবিদার। দ্বন্দময় জীবন আমরা যাপন করছি।

মোল্লা অপরকে ও অপরের মতকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু একজন সুফি শুধু পারেন মানুষকে কাছে ডাকতে, ভালোবাসা-প্রেম ও তাঁর মানবীক গুণাবলী দিয়ে তাকে জয় করে নিতে।

এই টানাপোড়েনে পড়ে আমাদের অবস্থা এখন না ঘরকা না ঘাটকা।

সময় হয়ে এসেছে, এক সাইড হয়ে যাওয়ার। আর সেই সাইড নিঃসন্দেহে তাসাউফ ও তরিকতের সাইড। এখানে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই মানবজীবনের চরম সফলতা লাভ হতে পারে। আর না হয় পুরো জীবনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। মাওলা আমাদের সকলকে তৌফিক দিন। আমিন।

সুফি ইমাম শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানীর রাহ. প্রজ্ঞা

মূলঃ শায়খ হাবিব আলী জয়নুল আবেদিন ইবনে আব্দির রহমান জিফরি (মা জি আ)

মিশরের বিদগ্ধ আলীমে দ্বীন ও সুফি ইমাম শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানীর রাহ. দরসে একজন লোক নিয়মিত আসতেন। ঐ ব্যক্তি একদিন শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানীর রাহ. কাছে আরজ করলেন, ইয়া শায়খ! আমি সাদাকাতুস সির (গোপন দান খয়রাত) করতে চাই!

CamScanner

প্রসঙ্গত: হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ পাক উনার (আরশের) ছায়ার নিচে ছায়া দিবেন হাশরের দিনে, যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে এক প্রকারের লোক তারা যারা ডান হাতে দান করে কিন্তু বাম হাত জানে না সে ডান হাতে কী দান করেছে, এতটা গোপনীয়তা যে অবলম্বন করে। কাজেই সাদাকাতুস সির বা গোপনে দান সদকা ইসলামে highly recommended| its a great virtue.

যাইহোক, শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রাহ. ঐ লোককে বললেন, ভাই আমার তুমি তাজকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া এই সাদাকাতুস সির হজম করতে পারবে না। এটা বের হয়ে আসবেই।

তবুও ঐ লোক বার বার বলতে লাগলেন, শায়খ আমাকে বলুন কার কার অভাব আছে, দেখুন আমি সাদাকাতুস সির কীভাবে করি!

শায়খ এক পর্যায়ে বললেন, ঐ ঐ এলাকার মানুষ খুব অভাবে আছে।

ঐ ব্যক্তি ঐ রাত্রেই নিজে কাধে করে বয়ে নিয়ে আটা, ময়দা, খেজুর ইত্যাদি অভাবগ্রস্থ ঐসব মানুষের দরজায় দরজায় রেখে আসলেন। কেউ কিছুই বুঝল না।

পরের দিন ঐ ব্যক্তি আবার শায়খের মাজলিসে আসলেন। নসিহত শেষ হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি বললেন, শায়খ আপনি কী শুনেছেন যে, মানুষ সাদাকাতুস সির করা শুরু করে দিয়েছে!

শায়খ কিছুই বললেন না, শুধু মুচকি হাসলেন।

পরের রাত্রিতে আরো বেশি সংখ্যক অভাবি মানুষের দরজায় দরজায় এভাবেই সাহায্য পৌঁছে দিলেন সেই ব্যক্তি।

পরের দিন আবার এসে শায়খের মাজলিস শেষে শায়খকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শায়খ আপনি কী শুনেছেন যে, মানুষ আগের চেয়ে

অনেক বেশি গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে সাদাকাতুস সিররের প্রতি। এখন বেশি বেশি গরীব মানুষ উপকার পাচ্ছে এর মাধ্যমে।

শায়খ তার কথা শুনে আবারও মুচকি হাসলেন।

পরের রাত্রিতে আরো বেশি সংখ্যক অভাবি মানুষের দরজায় দরজায় এভাবেই সাহায্য পৌঁছে দিলেন সেই ব্যক্তি।

পরের দিন আবার এসে শায়খের মাজলিস শেষে ঐ ব্যক্তি উপস্থিত সকল লোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাইয়েরা আমার, আমি অহংকার করছি না, তবে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করছি মাত্র। আমি এভাবে এভাবে সাদাকাতুস সির করছি। আপনারাও করুন। এটা খুব ভাল কাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রাহ. আবারো মুচকি হেসে ঐ লোককে বললেন, ভাই আমার আমি আগেই বলেছিলাম তুমি তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া এই সাদাকাতুস সির হজম করতে পারবে না। এটা বের হয়ে আসবেই। তাই হলো শেষ পর্যন্ত।

Moral Lesson: ইবাদাত আমরা করতে পারি অনেক। কিন্তু লোক দেখানো রিয়া, অহংকারমুক্ত এবং অপরকে তাচ্ছিল্য করা ব্যাতিরেকে ইবাদাত তাজকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া হয় না। তাই তাসাউফ ছাড়া মুক্তি নেই।

অপ্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আমাদের মেমরি ফুল, কুরআন-হাদিস ও দোয়া মনে থাকবে কোথা থেকে?

ইমাম শাফিই রাহ.কবিতার সুরে বলেন,

شكوت الي وكيع بسوء حفظي,

فأرشدني الي ترك المعاصي

لأن العلم نور من الٰهي

ونور الله لا يعطي للعاصي

অর্থাৎ- আমি আমার ওস্তাদ ওয়াকির নিকট অভিযোগ করলাম,
আমার খারাপ স্মরণশক্তির বিষয়ে,
তিনি আমাকে নসিহত করলেন, বৎস্য! গুনাহ ছাড়,
কারণ জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নুর,
আর আল্লাহর নুর কোন গুনাহগারকে দেয়া হয় না।

আমরা অনেকেই খারাপ স্মৃতিশক্তি নিয়ে অভিযোগ করে থাকি। শিখি কিন্তু মনে থাকে না, এত এত পড়ি কিন্তু মনে থাকে না। করণীয় কী?

প্রথম করণীয় হচ্ছে গুনাহ পরিত্যাগ করা। কারণ দ্বীনের জ্ঞান কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটা নুরে ইলাহি। কোন গুনাহগারকে আল্লাহ তা দান করেন না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি পরিত্যাগ করতে হবে তা সায়েন্টিফিক একটা ফ্যাক্ট। অপ্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আমাদের মেমরি ফুল করে রাখা যাবে না। আমাদের মেমরি কিন্তু কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের হার্ডডিস্ক এর মত। এর একটা নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি আছে। ঐ নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত মেমরি এখানে চাপিয়ে দিলে সে আগের মেমরি মুছে দিয়ে নতুন ইনফরমেশন গ্রহণ করে। কঠিন হয়ে গেল? সহজ ভাষায় বলি।

শাহরুখ খানের বাড়ির নাম কী? সাকিব আল হাসানের কাজের বুয়ার নাম কী? মেসির বউয়ের কুকুরের নাম কী? আমির খানের ছেলের নাম কী? মেসির কাজের বুয়ার স্যান্ডেল নাম্বার কত?

ভাই ও বোনেরা এই তথ্য নামের আজেবাজে জিনিসগুলো কী আমাদের মেমরিতে রাখার প্রয়োজন আছে? অবশ্যই না। অনেকাংশে তা গোনাহের কাজ।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এসব অপ্রয়োজনীয় ও গুনাহ মিশ্রিত তথ্য দিয়ে আমরা আমাদের মেমরিকে ফুল করে রেখে দিয়েছি। তো সেই মেমরিতে কুরআন মাজিদের সূরা, হাদিস ও দোয়াগুলো কীভাবে থাকবে?

যদি স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হয় তবে গোনাহের কাজ পরিত্যাগ করতে হবে এবং এসব অপ্রয়োজনীয় ও গুনাহ মিশ্রিত তথ্য মুখস্থ করা যাবে না। এছাড়াও যে বিষয় আমার মেমরিতে নেয়া প্রয়োজন না তা মেমরিতে নেয়া যাবে না।

যা চোখে দেখা যায়, তা সবসময় সত্যি হয় না!

একজন পীর সাহেবের কাছে এক ব্যবসায়ী বায়য়াত নেন। ঐ ব্যবসায়ী একবার এক দেশে বাণিজ্যের কাজে যাবেন বলে মনস্থ: করেন। যাওয়ার আগে তার পীরসাহেবের সাথে দেখা করতে যান। পীর সাহেব বলেন, তুমি ঐ এলাকায় যেহেতু যাচ্ছ, ঐখানে একজন ভাই আছেন, যিনি আল্লাহর অনেক বড় একজন ওলী। উনার সাথে দেখা করবে। আমার সালাম দিবে। আমার জন্য দোয়া করতে বলবে এবং তোমার নিজের জন্যও দোয়া চাইবে।

যাইহোক, ব্যবসায়ী ঐ এলাকায় গেলেন। তার ব্যবসার কাজ শেষ করলেন। এখন তার পীরসাহেবের আদেশ মানার পালা। তিনি ঐ আল্লাহর ওলীকে খুঁজতে বের হলেন। মানুষকে ঐ আল্লাহর ওলীর নাম জিজ্ঞেস করতেই বলল, তিনি তো রাজপ্রাসাদে আছেন।

ব্যবসায়ী ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন, ওলী রাজপ্রাসাদে!

যাই হোক, তিনি রাজপ্রাসাদে গেলেন, গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তি কোথায়? রাজপ্রাসাদের লোকজন বলল, তিনি তো এখন রাজার সাথে নাশতা করছেন।

CamScanner

এবার ব্যবসায়ীর আরো আশ্চর্য হওয়ার পালা। ওলী রাজপ্রাসাদে আছেন, আবার রাজার সাথে বসে নাশতাও করেন। এ কেমন আল্লাহর ওলী? আল্লাহর ওলীরা তো সবসময় জানতাম রাজা বাদশাহদের থেকে দূরে থাকেন। এ কেমন আল্লাহর ওলী?

যাই হোক, এক সময় সেই আল্লাহর ওলী রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে এলেন। সেই ব্যবসায়ী সাক্ষাৎ করলেন, তার পীরসাহেবের পক্ষ থেকে সালাম জানালেন এবং দোয়ার আরজি রাখলেন।

এমন সময় সেই আল্লাহর ওলী বলে ওঠলেন, ওহ আপনি সেই মানুষের হাতে বায়য়াত? আচ্ছা উনাকে জিজ্ঞেস করবেন, উনি কখন থেকে এভাবে দুনিয়ার লোভে মত্ত হওয়া শুরু করলেন?

ব্যবসায়ীর ইচ্ছা হল সেই লোককে সেখানেই আচ্ছামত ধোলাই দেন। আরে আপনি আছেন রাজদরবারে, রাজার সাথে নাশতা খাচ্ছেন, আর আমার পীরের বদনাম করছেন? আমার পীর যিনি কুড়ে ঘরে থাকেন, নাই জায়গা নাই জমি, খাওয়া পেলে খান আর না হয় এভাবেই কাটিয়ে দেন। তাকে আপনি দুনিয়া লোভী বলছেন?

যাই হোক, যেহেতু তিনি ব্যবসায়ীর পীরসাহেবের খুব পরিচিত এবং তিনি বলেছেন এই ব্যক্তি কামিল মানুষ, তাই ব্যবসায়ী নিজেকে সংযত করে নিলেন।

ব্যবসায়ী নিজের পীরসাহেবের কাছে ফিরে আসলেন।

এসে বিস্তারিত খুলে বললেন। যখনই ব্যবসায়ী বললেন, যে ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছেন যে, আপনি কখন থেকে দুনিয়ার লোভে মত্ত হওয়া শুরু করলেন?" ব্যবসায়ীর পীরসাহেব কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন।

হুশ আসার পর পীরসাহেব বললেন, বাবা! ঐ আল্লাহর ওলীর কথা সত্য। তিনি কাশফের মাধ্যমে আমার অবস্থা জেনেছেন। ইদানীং

আমার মনে প্রায়ই এক খেয়াল উদয় হয়, আমার কাছে যদি অজস্র টাকা পয়সা থাকত! আমার কাছে যদি কিছু দুনিয়াবি সম্পত্তি থাকত!

শিক্ষাঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়কতক ধারণা গুনাহ। (৪৯:১২)

যা চোখে দেখা যায়, তা সবসময় সত্যি হয় না। তাই হাকিকত না জেনে কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা, খারাপ মন্তব্য করা গোনাহের কাজ, যা ইসলামের খেলাফ, তাসাউফের খেলাফ।

তরিকত ও তাসাউফ কি?

সত্যিকারের মুমিনের জন্য বছরের প্রত্যেকটি মাস আল্লাহ প্রেমের মাস, প্রত্যেকটি মাস নবীপ্রেমের মাস, প্রত্যেকটি মাস ওলীপ্রেমের মাস। প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, তাঁর প্রিয় হাবিব (ﷺ) ও তাঁর প্রিয় ওলী-আউলিয়াগণের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশের মাস। কিন্তু তারপরও রবিউল আউয়াল মাস হচ্ছে এমন এক পবিত্র মাস যেই মাসে যাঁকে ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অঙ্গ করে দেয়া তিনি সেই মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের প্রিয় হাবিব দয়াল নবীজি নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) এই দুনিয়াতে আগমনের মাস। কাজেই এই মাস নবীজির প্রতি আমাদের বিশেষ ভালোবাসা প্রকাশের দাবি রাখে। আবার পবিত্র ওফাত শরিফও এই পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে। আর আল্লাহর কুদরত ঠিক তার পরের মাস রবিউস সানীতে তাঁরই বংশের নয়নমনি আল্লাহ পাকের ওলীকূল শিরমনি বড়পীর দস্তগীর হযরত সৈয়দ শায়খ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) পবিত্র ওফাত শরিফ লাভ করেন। কিন্তু আল্লাহর এই বড়

CamScanner

বড় ওলীগণ বন্ধুগণ কি মিশন নিয়ে এই দুনিয়াতে এসেছিলেন, কি ছিল তাঁদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য? এই পবিত্র রবিউস সানী মাসে ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলোরই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমি অধম, অজ্ঞান, খোদার নাফরমান। ওয়া মা তাউফিকি ইল্লা বিল্লাহ। ওল্লাহুল মুস্তাআন।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরিফে ইরশাদ করেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

(হে নবী) আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের ইরাদাতে (إرادة ইরাদা অর্থ উদ্দেশ্যে বা খোঁজে) আহ্বান করে (ইবাদাত কর) এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার দিকে তাকাবেন না। [সুরা আল কাহফ - ২৮]

অসংখ্য তাফসীরের কিতাবে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে শানে নুজুল বর্ণনা করতে গিয়ে এসেছে যে উপরোক্ত এই আয়াতখানা আহলে সুফফার শানে নাজীল হয়েছে। أَهْلُ الصُّفَّة বা বারান্দার অধিবাসী ছিলেন সে সকল সাহাবীগণ যাঁরা গরীব কিন্তু জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। সকাল সন্ধা যাঁরা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন এরকম মহান ৭০/৭২ (এক রেওয়ায়াতে এসেছে ৩০০ জন) জন সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম) যাঁরা পবিত্র মসজিদে নববীর বারান্দায় বসবাস করতেন ও যাঁদের একমাত্র কাজ ছিল কোরআন হাদিসের জ্ঞান আহরন ও এক আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের

ইবাদাত করা। অনেক ঐতিহাসিকের দাবি এই সুফফাহ, صُفَّة (বা বারান্দা) শব্দ থেকেই تصوف বা তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি। তাঁদের একমাত্র কাজ ছিল নবী করিম রাউফুর রাহীমের (ﷺ) কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ওহী নাজিল হলে তা মুখস্থ করা ও সেই আয়াতসমুহ বুঝতে অসুবিধা হলে নবী করিম রাউফুর রাহীমের (ﷺ) কাছ থেকে বিস্তারিত বুঝে নেয়া ও নবীজির সুন্নাত এর শিক্ষা ও আমল করা। নবীজির (ﷺ) দরবারে কোন খাদ্য আসলে তা খেতেন অথবা ভুকা পড়ে থাকতেন। (বুখারী শরিফ, কিতাবুল ইলম, পরিচ্ছেদ: ৮৪, হাদিস নং: ১১৯-১২০ হাদিসের বর্ণনাকারী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি আহলে সুফফার অন্যতম প্রধান সদস্য)। অতঃপর নবী করিমের (ﷺ) ইন্তিকালের পর তাঁরাই কোরআন সুন্নাহর শিক্ষাকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা কোরআন শরিফের তাফসিরের জ্ঞান পাই। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের বেশির ভাগ আহলে সুফফার সদস্য। আহলে সুফফার সদস্যগণের সাথে তাসাউফ-তরিকত পন্থিদের সম্পর্ক অতি গভীর। আহলে সুফফার সদস্যগণ যা করতেন এবং যে উদ্দেশ্যে জীবন কাটিয়েছেন তাই তাসাউফ-তরিকত পন্থিদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

যাই হোক, গাউসুল আজম গাউসুস সাকালাইন মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী বড়পীর দস্তগীর হযরত সৈয়্যদ মুহীউদ্দিন আব্দুল কাদীর জীলানি (রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি) তাঁর বিখ্যাত "গুনিয়াতুত ত্বালিবিন" নামক কিতাবে মুরিদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উপরোক্ত এই আয়াতখানা আনয়ন করেন। দাতা গঞ্জে বখশ আলী ইবনে উসমান আল-হাজবিরী (রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি) ও তাঁর বিখ্যাত "কাশফুল মাহজুব" কিতাবে অনুরুপ করেছেন মুরিদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন উপরোক্ত এই আয়াতখানাতে বলেছেন, নবী করিম (ﷺ) যেন সেসব

সাহাবীগণের থেকে তাঁর পবিত্র দৃষ্টি মোবারক সড়িয়ে না নেন, يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ অর্থাৎ যাঁরা দিন রাত আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বা ইরাদা ارادة নিয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদাতে মশগুল থাকে তাঁদের থেকে, আর তাঁদের সাথে যেন নিজেকে আবদ্ধ রাখেন। অনেকেই বলতে চান নবীজি (ﷺ) কাউকে কিছু দিতে পারেন না। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। যদি নবীজি (ﷺ) কাউকে কোন কিছু নাই দিতে পারবেন তবে আল্লাহ পাক কেন তাঁর হাবিবকে বললেন যে সেসব সাহাবীগণের থেকে আপনার পবিত্র দৃষ্টি মোবারক সড়িয়ে নিবেন না। তাই বুঝা গেল যে নবীজির (ﷺ) পবিত্র দৃষ্টিতে আল্লাহর রহমত আছে, আছে হিদায়াতের তাজাল্লী যা তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে দৃষ্টির মাধ্যমে দান করতেন। অযথা কোন আয়াত বা কোন একখানা অক্ষর তো আল্লাহর কোরআনে নাজিল হতে পারে না। নবীজির (ﷺ) পবিত্র দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামগণের কোন না কোন উপকার তো হতই এজন্যই আল্লাহ পাক এই পবিত্র আয়াতখানা নাজীল করেছেন। তো বুঝা গেল যে আহলে সুফফার সদস্য সাহাবীগণ ছিলেন খাস বা বিশেষ, যাঁদের আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবিবের দরবারে বিশেষ মর্যাদা ছিল, ছিল বিশেষ স্থান।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে উল্লেখিত ইরাদা ارادة বা উদ্দেশ্য শব্দ থেকেই مريد বা মুরিদ শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ مريد বা মুরিদ সেই যে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বা ইরাদা ارادة করে নিজেকে সম্পূর্ণরুপে আত্মসমর্পন করেছেন। সত্যিকারের মুরিদের নিজের খেয়াল খুশি থাকতে পারে না, কারণ সে নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পুর্ণরুপে আত্মসমর্পন করে দিয়েছে। আল্লাহর রাজীখুশিই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের নফসের খেয়াল খুশি আরাম আয়েশ স্থান পেতে পারে না।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরিফে ইরশাদ করেন,

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। [আল বাকারা -আয়াত নং-১৫১]

আমরা যদি গভীরভাবে উপরোক্ত এই আয়াতখানা লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবিব নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে কেন এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। অথবা বলা যায় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) উম্মতের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমুহ সংক্ষেপে এই আয়াতখানাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াত অনুযায়ী উম্মতের প্রতি নবী করিমের (ﷺ) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ ছিল নিম্নরুপ:

১. কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করে শোনানো

২. উম্মতকে পবিত্র করা

৩. কোরআন শরিফের ব্যাখ্যা বা তাফসীর ও হিকমত তথা তত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং সবশেষে

৪. এমন জ্ঞান শিক্ষা দেয়া যা মানুষ জানত না।

দেখুন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নবী করিম (ﷺ) কে কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করে শোনানোর পর পরই সরাসরি তাফসীর বা হিকমত শিক্ষা দিতে বলেন নাই, বরং বলেছেন উম্মতে মুহাম্মাদীকে

CamScanner

পবিত্র করতে। এই পবিত্রতা নিশ্চয়ই শারীরিক পবিত্রতা বা ওযু গোসলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই পবিত্রতা হচ্ছে অন্তরের পরিশুদ্ধতা, আত্মার পবিত্রতা। তাসাউফের পরিভাষায়একেই বলে تَزكِيَةُ النفس তাজকিয়াতুন নাফস বা অন্তরের পরিশুদ্ধতা। অতঃপর বলা হয়েছে কোরআন শরিফের ব্যাখ্যা বা তাফসীর ও হিকমত তথা তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে, কারণ যার অন্তরের পরিশুদ্ধতা হাসিল হবে না তার মধ্যে কোরআন শরিফের ব্যাখ্যা বা তাফসীর ও হিকমত তথা তত্বজ্ঞান টিকে থাকবে না। কারণ সাদা কাগজের মধ্যেই অর্থবহ কোন কিছু লিখা সম্ভব।

অন্তর যখন পরিষ্কার সাদা কাগজের মত হবে তাতেই আল্লাহর কোরআন কিতাবের শিক্ষা ও হিকমতের শিক্ষা টিকে থাকতে পারে, নইলে নয়। অতঃপর যখন কিতাবের তিলাওয়াত জানা হয়ে গেল, অন্তরের পরিশুদ্ধতাও হাসিল হয়ে গেল এবং সেই সাথে শরীয়তের জ্ঞানও লাভ হয়ে গেল তখন সর্বশেষে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলছেন এখন হাবিব (ﷺ) আপনি তাঁদেরকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিন যা তারা কোনদিনও জানত না। আর এ জ্ঞানই হচ্ছে মারিফতের গুপ্ত জ্ঞান। আর এই জ্ঞানই হচ্ছে সেই জ্ঞান যা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর মোত্তাকী পরহেজগার বান্দাগণকে শিক্ষা দেন খোদাভীতির বিনিময়ে। যেমন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলছেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন। [আল বাকারা - ২৮২]

যাই হোক আমরা আলোচনা করছিলাম অন্তরের পরিশুদ্ধতা নিয়ে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় [আল আ'লা - ১৪]

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। [আশ শামস - ৯]

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।

[আশ শামস - ১০]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলীহি ওয়া আসহাবীহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدتفسد الجسد كله الا وهي القلب

"সাবধান। তোমাদের শরীরে এমন একটা মাংসপিন্ড আছে, যা পরিশুদ্ধ হয়েগেলে তোমাদের পুরো শরীর পরিশুদ্ধ হয়েযায়, আর তা দূষিত হয়েগেলে পুরো শরীরই দূষিত হয়েযায়। সাবধান তা হচ্ছে তোমাদের কলব বা অন্তর। (সহীহ বুখারী)

উপরোক্ত আয়াত সমূহ ও হাদীসখানা বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়যে, রাগ, লোভ-লালসা, জিদ, হিংসা, অহংকার, ঘৃণা, আমিত্ব, গীবত, বুহতানের মত যত মনের ব্যাধী আছে সেসব থেকে অন্তরের পরিশুদ্ধতাই মানব জীবনের সফলতার মাপকাঠি। যে অন্তরের পরিশুদ্ধতা হাসিল করল সেই সফলকাম আর যে অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জনে ব্যর্থ হলো সেই বিফলকাম। এর আগের পর্বে আমরা পেয়েছিলাম যে, مريد মুরিদ সেই যে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বা ইরাদা إرادة নিয়ে নিজেকে সম্পুর্ণরুপে আত্মসমর্পন করেছেন। এখন এই সংজ্ঞাকে আরেকটু বিশদভাবে বলা যায়যে مريد বা মুরিদ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বা ইরাদা إرادة করে অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য নিজেকে সম্পুর্ণরুপে পীরের কাছে বা আধ্যাত্মিক শিক্ষকের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন"। প্রশ্ন

CamScanner

ওঠতে পারে এখানে পীরের কথা আসল কোথা থেকে? আগামী পর্বে আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের রাস্তায় অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য বায়আত ও এর দলিল এবং পীরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

গত পর্বেই আমরা শুদ্ধ অন্তর বা আত্মার পরিশুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছি। আল্লাহ পাক বলেছেন,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

যে দিবসে (হাশরের দিনে) ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না;

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

একমাত্র যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে তা ছাড়া। (সূরা শুআরা, সূরা নং-২৬: আয়াত নং ৮৮-৮৯)

যাইহোক, বায়আত (بيعة) শব্দের অর্থ কেনা-বেচা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করে তখন প্রকৃতপক্ষে সে এ ওয়াদাই করে যে, সারা জীবন আমি আমার ওয়াদা পালন করে চলবো।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরিফে ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"যারা আপনার কাছে বায়আত বা আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে বায়আত বা আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে

কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। [আল ফাত্হ - আয়াত নং ১০]

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় বায়আতে রিদওয়ানের ব্যাপারে। যখন হুজুর নবী করিম (ﷺ) ৬ষ্ঠ হিজরী সনে ওমরা করার জন্য মক্কা শরিফের উদ্দেশ্যে বের হন তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁদেরকে ওমরা করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সংকট নিরসনের জন্য ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে মক্কা শরিফে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়। তাঁর আসতে দেরী হলে নবী করিম (ﷺ) ১৪০০ সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে ওসমান রা. কে যদি হত্যা করা হয়ে থাকে তবে তার প্রতিশোধ নিতে তারা আমৃত্যু যুদ্ধ করবেন।

এই বায়আত সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করছেন,

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। [আল ফাত্হ - আয়াত নং ১৮]

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, এই বায়আতের সাথে পীর-মুরিদী সিলসিলার বা তরিকত তাসাউফের বায়আতের কি সম্পর্ক? জবাব নিম্নরুপ:

১. মুসলিম শরিফের কিতাবুল ইমারাতে এসেছে নবী করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন, ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية "যে ব্যাক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যার ঘাড়ে বায়আত নেই। সে

যেন জাহিলিয়্যাতের অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগের মৃত্যুবরন করল।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, পরিচ্ছেদঃ ১২, হাদিস নংঃ ৪৬৪২) অর্থাৎ যে বায়আত গ্রহণ না করে মারা গেল সে জাহেলী যুগের ব্যক্তির ন্যায় অর্থাৎ কাফিরের ন্যায় মারা গেল।

রাসূলের (ﷺ) যুগে যে বাইয়াত ছিল তা হলো বাইয়াতে রাসূল। খিলাফাতের যুগে ছিল বাইয়াতে খিলাফাহ। খিলাফাতের পর যে বাইয়াতের প্রচলন শুরু হয়তা হলো বাইয়াতে তাকওয়াহ। তাকওয়া অর্জনের জন্যে রাসূল (ﷺ) সাহাবীদেরকে এ ধরনের বাইয়াত করিয়েছেন।

২. মুসলিম শরিফের হাদীস "আওফ ইবনে মালেক আসজাঈ বলেছেন, আমাদের সাত বা আট বা নয়জন লোকের উপস্থিতিতে রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা কেন রাসূল (ﷺ) এর নিকট বাইয়াত হচ্ছো না? অথচ আমরা ইতিপূর্বে বাইয়াত গ্রহনের সময় তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আমরা বললাম আমরা তো আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা কেন রাসূল (ﷺ) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছ না? আমরা আবার বললাম আমরা তো আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কেন রাসূল (ﷺ) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছ না? বর্ণনা কারী বলেন এবার আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম, "আমরা তো ইতিপূর্বে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি এখন আবার আপনার কাছে কিসের বাইয়াত গ্রহণ করব।" রাসূল সাঃ বললেন, "এর উপর যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে, তিনি আরো একটি কথা বললেন চুপে চুপে তা হলো লোকের কাছে কোন কিছুর জন্যে হাত পাতবে না।" [সহীহ মুসলিম, জাকাতের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪ঃ কারো কাছে হাত পাতা অপছন্দনীয় হওয়া, হাদিস নং- ২২৭২] এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের হুকুম আহকাম

পালনের ব্যাপারে দৃঢ় থাকতে এবং তাকওয়া অর্জন করে মুত্তাকী হতে বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে।

৩. সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহর (ﷺ) কাছে বৃক্ষের নিচে বায়আত (বায়আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন: হে সালামা! তুমি বায়আত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ)! আমি তো প্রথমবার বায়আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন: দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর।

(সহীহ বুখারি, অধ্যায়: আহকাম, অনুচ্ছেদ নং: ৩০৪৮: যে ব্যক্তি দুইবার বায়াআত গ্রহণ করে, হাদিস নাম্বার: ৬৭১৫) মুসলিম শরিফের ইমারাহ অধ্যায়ে বায়আত সম্পর্কিত আরো অনেক হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. বর্ণিত আছে হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বায়আতে আকাবার রাতের উল্লেখ্য: হিজরতের পূর্বে হাজ্জের মওসুমে বিভিন্ন স্থান থেকে আসতো হাজীগণকে নবী করিম (ﷺ) ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এভাবে মক্কা শরিফের মীনা ময়দানের কাছে আকাবা নামক উপত্যকায় রাতের অন্ধকারে তৎকালীন ইয়াসরিবের তথা পবিত্র মদীনা শরিফের কিছু সংখ্যক লোকজন ইসলাম কবুল করে প্রিয় নবীর (ﷺ) হাতে বায়আত বা আনুগত্যের শপথ করেছিলেন। বায়আতে আকাবার প্রথম শপথে বারোজন সদস্য ছিলেন ও দ্বিতীয় শপথে দুইজন নারীসহ ৭৩ জন সদস্য ছিলেন, যাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাসুলের (ﷺ) আনুগত্য ও জানমাল হিফাজতের অঙ্গীকার করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে বায়আতে আকাবার গুরুত্ব অপরিসীম। বায়আতে আকাবার যে বারজন প্রতিনিধি হয়েছিলেন তাদের প্রতিনিধিগণের একজন ছিলেন।

নিশ্চয়ই রাসুলুলল্লাহ (ﷺ) বলছিলেন এবং তাঁর চারপাশে কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন, "তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ কর যে তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করবে না, আর তোমরা চুরি করবে না, জিনা ব্যভিচার করবে না, আর তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিরপরাধ কারো উপর অপবাদ দিবে না (মানুষের মাঝে প্রচার করার জন্য), নেককাজে তোমরা অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এই ওয়াদা পুরন করবে তার প্রতিদান আল্লাহ পাক দিবেন। আর দুনিয়াতে এর কোন একটিতে লিপ্ত হলে দুনিয়াতে এর শাস্তি হবে আর তা হবে কাফফারা, আর দুনিয়াতে এর কোন একটিতে লিপ্ত হলে আল্লাহ যদি তা গোপন রাখেন তবে তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, শাস্তিও দিতে পারেন ক্ষমাও করে দিতে পারেন। (উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন) আমরা এসব কথার উপর বায়াআত গ্রহণ করলাম। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-১, পরিচ্ছেদ-১১, হাদিস নং-১৭)

গত পর্বের আলোচনায়ই প্রমান হয়েছে যে, تزكية النفس বা অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জন করা কোরআন হাদিছ অনুযায়ী ফরজ। কাজেই অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য পীরের হাতে হাত রেখে তরিকত তাসাউফের স্কুলে ভর্তি হওয়াও ফরজ। কারণ পীর মুর্শিদ এই রাস্তা হেটে এসেছেন। তিনি জানেন এই রাস্তায় কীভাবে চলতে হয়। পীরের পথ নির্দেশনা ছাড়া অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জন সম্ভব না। শারীরিক রোগের জন্য আমরা যেমন ডাক্তারের কাছে যাই, মানসিক রোগের জন্য যাই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে, তেমনি অন্তরের বিমার সারানোর জন্য আমাদের যেতে হবে কামিল পীর মুর্শিদের কাছে যাঁরা নিজেরা অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছেন।

শুধু পুরুষগণ বায়আত হলেই হবে না নারীগণকেও পর্দার মধ্যে থেকে শরীয়তের গন্ডিতে থেকে বায়আত হতে হবে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে বায়আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু। [আল মুমতাহিনাহ্ - আয়াত নং-১২]

নবী করিমের (ﷺ) মাধ্যমে বায়আতের প্রচলন শুরু হয়। খোলাফায়ে রাশিদীনের সময়ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তাঁদের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। কিন্তু খোলাফায়ে রাশিদীনগণের পরে এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভুল লোকজনের কাছে চলে যায়। উল্লেখ্য যে বর্তমানে কিছু পথভ্রষ্ট লোক খিলাফত পূন:প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা আসলে জানে না যে, খিলাফত আল্লাহ প্রদান করেন। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে মানুষ হত্যা করে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা কাল কেয়ামত পর্যন্তও সম্ভব নয়। এই মর্মে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন শরিফে ফরমাচ্ছেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। [আন নূর -৫৫]

সুফিগণ হযরত আলী (রাদ্বীয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বায়আতের সিলসিলা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বীয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) এবং ইমাম হাসান আল বাসরীর (রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি) মাধ্যমে আজ পর্যন্ত জারী রেখেছেন যা ইমাম মাহদী (আ:) পর্যন্ত জারী থাকবে। ইমাম মাহদীর (আ:) মাধ্যমে আবার সত্যিকারের খেলাফত প্রতিষ্ঠা হবে তখন আর কোন পীর মুর্শিদের প্রয়োজন হবে না। কারণ ইমাম মাহদীই (আ:) হবেন ইসলামি রাষ্ট্রের শরীয়ত ও তরিকত উভয়জগতের খলিফা, পীর ও মুর্শিদ।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর উসিলা অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

[আল মায়েদাহ - ৩৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।

[আত তাওবাহ্ - ১১৯]

CamScanner

উপরোক্ত দুইখানা আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমান করে যে আল্লাহ পাককে পাওয়ার জন্য উসিলা অবলম্বন করতে হবে এবং সৎপথ প্রাপ্তগণের সাথী হতে হবে। যার পীর নাই পথপ্রদর্শন কারী নাই তাকে কোরআন শরিফে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে,

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শনকারী কোন ওলী পাবেন না। [আল কাহফ - ১৭]

ওলী ও মুর্শিদ শব্দ দুখানা স্পষ্টভাবে এখানে এসেছে।

পরিশেষে বলতে চাই যে, আমরা যদি বর্তমানে তরিকত তাসাউফের নামে যে দোকানদারী আর বানিজ্য চলতেছে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকি তাহলে সামনে আগানো সম্ভব না। বানিজ্য তো আজকাল সবকিছু নিয়েই হচ্ছে। মসজিদ-মাদ্রাসা, ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সবকিছুই আজ ব্যবসার পন্য। সর্বযুগে সর্ব জায়গায় কিছু লোক ছিল, আছে এবং থাকবে যারা ভাল জিনিসকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। এসব সুযোগসন্ধানী মানুষের কারণে হক্বপন্থার কাজ বন্ধ করা যাবে না।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেন পারেন এবং তুলেন: এখানে উম্মতকে বায়আত হতে কখন বলেছেন?

উত্তর: হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সকল আমল মান্য করা সুন্নাত। যে সবের উপরে বেশি তাকিদ দিয়েছেন সেগুলো ওয়াজিব। উনার

প্রতিটি কাজ করার পর উনার উপরে এটা দায়িত্ব ছিল না যে তিনি প্রতিবারই বলে দিবেন, আমি এটা করলাম তোমরাও এটা কর। বরং যেভাবে তিনি যা করেছেন ও অপরকে দিয়ে করিয়েছেন তাই আমাদের জন্য সুন্নাত এবং আমাদের আদর্শ ও করনীয়। এমনকি বাথরুমে যেভাবে বসেছেন, যেভাবে বিছানায় শুয়েছেন সেটাও বিনা বাক্য ব্যয়ে আমাদের জন্য সুন্নাত আমল, আর একটু তাকিদ দিলে বা জোর দিলে তো তা ওয়াজিব হয়ে যায়।

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। (সূরা নিসা, আয়াত নং-৫৯)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

(হে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৩১)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (হাশর, আয়াত নং-৭)

তোমাদের জন্য আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মানা আবশ্যক। (সহিহ হাদিস)

যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে যায় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। (সহিহ হাদিস)

উপরের এই আয়াত ও হাদিসগুলো জেনারেল স্টেটম্যান্ট যা প্রিয় নবীর (ﷺ) প্রায় সকল আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, একমাত্র যেসব সুন্নাতে আমাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা আসেনি। যেমন চারখানার বেশি বিয়ে করা, নবীজি (ﷺ) করেছেন আমরা পারব না। অনবরত রোজা রাখা যা নবীজি (ﷺ) করেছেন কিন্তু আমরা পারব না কারণ এসব ব্যাপারে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

কাজেই আমরা (আমার লেখা মুরিদ হওয়া এবং বায়আত হওয়ার অকাট্য দলিল-তাসাউফ ও তরিকত কি এবং পীর-মুরিদী কেন? - পর্ব-৩" নামক প্রবন্ধে) দেখেছি যে, সাহাবায়ে কেরামগণ জিহাদের বায়আত নেওয়ার পরও আবার বার বার তাকিদ দিয়ে নতুন করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাক্বওয়ার বায়আত নিয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে। এতে নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের যার যার অবস্থান থেকে যে পীর ও মুর্শিদকে আমাদের হক্বপন্থী, পরহেজগার ও আল্লাহওয়ালা মনে হয় তাঁর কাছেই বায়আত হওয়া আমাদের জন্য ওয়াজিব।

CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

ব্যক্তিগত আহবানে ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) বলে সমস্বরে আওয়াজ তোলা অথবা মিছিলে স্লোগান দেয়া

(বিদেশী লেখা থেকে অনূদিত)

এটা জায়েজ নয় কোন ব্যক্তির জন্য যে তার সামনে যখন কেউ আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে বিকৃত করবে আর সে নিরব থাকবে, বিশেষত যখন তার ক্ষমতা আছে রুখে দাঁড়ানোর। মুসলমানদেরকে সঠিক পথ না দেখিয়ে, তাদেরকে দ্বীন বিকৃত করে এরকম মানুষদের থেকে সতর্ক না করে ছেড়ে দেয়া জায়েজ নাই, বিশেষত যখন তার ক্ষমতা আছে।

এটা সেই আবশ্যক উপদেশের ক্যাটাগরিতে পড়বে যার সম্পর্কে হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। যদি কোন মানুষ সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা বন্ধ করে দেয়, যখন তা তার ওপর আবশ্যক, তাহলে সে গুনাহ করল। আহলে সুন্নাতের উলামাগণ, সেসব লোকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, যারা দ্বীনকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে।

এর অনেক প্রতিদান আছে তাদের জন্য। যদি এই আবশ্যক কাজটি কোন এলাকার সকল মানুষ যদি বাদ দিয়ে দিত তবে তারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য হারাত।

সতর্ক হোন! যদি কাউকে বলতে শুনেন ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) বলা জায়েজ নাই তবে তার কথাতে কান দিবেন না। জবাব দিন। তাকে অন্ধ সাহাবী আতাবির রা. হাদিসখানা শুনান। এটা ধর্মের পক্ষে আপনার একটা সেবা হবে।

CamScanner

আমরা এখন একগুচ্ছ দলিল দেব এটা প্রমাণ করতে যে ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) বলা সাহাবায়ে কেরাম, তাবিইন, মুজতাহিদ ইমামগণেরও আওলিয়াগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর এবং সুন্নি উলামা ও নেতৃত্বের সুন্নাত।

কুরআন মাজিদের আলোকেঃ

হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের নিয়তে আহ্বান করা কুরআন মাজিদে উল্লেখিত ফেরেশতা এবং উম্মাতের রুসুম রেওয়াজ উল্লেখের মাধ্যমে প্রমাণিত।

কুরআন মাজিদ অনেক জায়গায় হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যে এবং পরিস্থিতিতে ডেকেছে, যখন কোন বিষয়ে হুজুর রাসুলুল্লাহর (ﷺ) দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরী ছিল কোন সমস্যা সমাধানের জন্য অথবা কিছু বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনে। আহ্বান করার সেই বাক্যগুলো হচ্ছে, ইয়া আইয়্যুহাল মুজ্জাম্মিল, ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাসসিরু, ইয়া আয়্যিউহান নাবিয়্যু, ইয়া আইয়ুহার রাসুল ইত্যাদি।

ঠিক একইভাবে অন্যান্য সম্মানিত নবীগণ যাদেরকে ইয়া শব্দ দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে তারা হলেন, ইয়া মুসা, ইয়া ইসা, ইয়া ইয়াহিয়া, ইয়া দাউদ, ইয়া নুহ (আলাইহিমুস সালাম) ইত্যাদি।

হাদিস শরিফ থেকে স্বাক্ষ্যঃ

১. ইমাম তাবরানি রাহ. (ওফাত ৩৬০ হিঃ, ৯৭০ খ্রী) তার মু'জামে নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি বর্ণণা করেনঃ

أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له ، فكان عثمان لا يلتفت إليه ، ولا ينظر في حاجته ، فلقي

عثمان بن حنيف ، فشكا ذلك إليه ، فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضاة فتوضأ ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ، ثم قل : اللهم ، إني أسالك وأتوجه إليك بنبينا محمد ﷺ نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي ، وتذكر حاجتك ، ورح إلي حتى أروح معك ، فانطلق الرجل ، فصنع ما قال له عثمان ، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده ، فادخله على عثمان بن عفان ، فأجلسه معه على الطنفسة ، وقال : حاجتك ؟ فذكر حاجته ، فقضاها له ، ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ، وقال : ما كانت لك من حاجة ، فائتنا ، ثم إن الرجل خرج من عنده ، فلقي عثمان بن حنيف ، فقال : له جزاك الله خيرا ، ما كان ينظر في حاجتي ، ولا يلتفت إلي حتى كلمته في ، فقال عثمان بن حنيف : والله ، ما كلمته ولكن شهدت رسول الله ﷺ وأتاه ضرير ، فشكا عليه ذهاب بصره ، فقال : له النبي ﷺ : أفتصبر ؟ ، فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد ، وقد شق علي ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ائت الميضأة، فتوضأ ، ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهذه الدعوات قال عثمان بن حنيف : فوالله ، ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط

এক লোক খলিফাতুল মুসলিমীন আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান ইবনে আফফানের রা. দরবারে যেত কোন একটা প্রয়োজনে। কিন্তু ওসমান রা. তার দিকে তাকাতেন না। তার প্রয়োজনের দিকেও দৃষ্টি দিতেন না। অতঃপর ঐ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় অপর সাহাবী হযরত ওসমান বিন হানিফের রা. সাথে। ঐ ব্যক্তি ওসমান বিন হানিফের রা. কাছে এই বিষয়টি বললেন। অতঃপর ওসমান বিন হানিফ রা. ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ওজুখানায় যাও, ওজু কর, অতঃপর

মসজিদে যাও, দুই রাকায়াত নামাজ পড়, তারপর বল, "হে আল্লাহ! আমি আপনার দিকে মুখ করছি আমাদের নবী মুহাম্মদের (ﷺ) মাধ্যমে যিনি রহমতের নবী, ইয়া মুহাম্মাদ (ﷺ)! আমি আপনার মাধ্যমে আপনার প্রভূ আজ্জা ওয়া জাল্লার দিকে মুখ করছি, অতঃপর প্রয়োজনটি পূরণ করুন। এখন তুমি তোমার প্রয়োজনটি উল্লেখ কর। অতঃপর তুমি যাও আমিও তোমার সাথে যাব। ঐ লোকটি গেল, ওসমান ইবনে হানিফ রা. যা বলেছিলেন তা করল এবং খলিফা ওসমান ইবনে আফফানের রা. দরজার কাছে আসল।

দারোয়ান ঐ ব্যক্তিকে হাতে ধরে সরাসরি ওসমানের রা. কাছে নিয়ে গেল। তিনি অনেক সম্মান পেলেন, এবং খলিফা ঐ ব্যক্তিকে নিজের পাশে বসালেন, ধৈর্যের সাথে তার কথা শুনলেন এবং তার প্রয়োজন পুরণ করলেন এবং বললেন, তুমি আগে কেন তোমার প্রয়োজনের কথা বলনি? ভবিষ্যতে কিছু প্রয়োজন হলে সরাসরি আমার কাছে চলে আসবে।

হযরত ওসমানের রা. দরবার ত্যাগের পর ঐ ব্যক্তি ওসমান বিন হানিফ রা. কে ধন্যবাদ দিলেন, তার ব্যাপারে ওসমানের রা. কাছে সুপারিশ করার জন্য। যাই হোক ওসমান বিন হানিফ রা. বললেন, আমি আপনার ব্যাপারে ওসমানের রা. কাছে কিছুই বলিনি, কোন সুপারিশ করিনি।

ওসমান বিন হানিফ রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে এক অন্ধ ব্যক্তিকে (সাহাবী) এই দোয়া শেখাতে দেখেছি। অতঃপর অলৌকিকভাবে অন্ধ ব্যক্তির চোখ ভাল হয়ে গেল। অতঃপর সে আমাদের নিকট আসল এমনকি আমরা আমাদের আলোচনাও শেষ করতে পারলাম না। এমন মনে হলো যেন সে কখনো অন্ধ ছিলই না।

তথ্যসূত্র:

১. তিরমিজি, হাদিস নং, ৩৫৭৮,

CamScanner

২. ইবনু মাজাহ, হাদিস নং-১৩৮৫,
৩. মুসনাদ আহমদ ৪/১৩৮,
৪. বুখারি, তারিখুল কাবিরে, ৬/২১০,
৫. সহিহ ইবনে খোজায়মা, হাদিস নং-১২১৯
৬. মুজামুল কাবির, তাবরাবি, খন্ডঃ৭, পৃষ্ঠা ৪১০, হাদিস নং ৮২৩২
৭. মুজামুস সাগির, তাবরাবি, খন্ডঃ২, পৃষ্ঠা ১০৬, হাদিস নং ৫০
৮. মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, দারুল কুতুব, খন্ড: ২,পৃষ্ঠা, ২৭৯)

২. من طريق أبي صَالِحٍ ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ:

أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ :" ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مسْقِيُّونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ"، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

আবু সালিহ থেকে বর্ণিত, মালিক আদ দার রাহ.বলেন, যখন ওমরের রা. জমানাতে দুর্ভিক্ষ হলো (খড়া) এক ব্যক্তি হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কবর শরিফের কাছে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)!" আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন, তারা নিশ্চয়ই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে গেছে। অতঃপর হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ঐ ব্যক্তির স্বপ্নে আসলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে বলা হলো, তুমি ওমরের কাছে যাও, তাকে সালাম দাও এবং তাকে খবর দাও যে তোমরা অচিরেই বৃষ্টিপ্রাপ্ত হবে এবং তাকে বল তাকে আরো চতুর হতে হবে, তাকে আরো চতুর হতে হবে। ঐ ব্যক্তি ওমর রা. এর কাছে আসলেন এবং ঐ বিষয়ে অবহিত করলেন অতঃপ ওমর রা. কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আমার প্রভূ! আমার সামর্থ্যের বাহিরে যা আছে তা ছাড়া আমি কোন কিছু ত্যাগ করি না।

CamScanner

তথ্যসূত্রঃ

১. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, ৬/৩৫৬, হাদিস নং-৩২০০২,

২. ইমাম বুখারী সংক্ষেপে তার তারিখুল কাবিরে এনেছেন, ৭/৩০৪,

৩. ইমাম বাইহাকি, দালায়েলুন নুবুয়্যাহ, ৭/৪৭,

৪. ইবনু আসাকির, তারিখ, ৪৪/৩৪৫

প্রসঙ্গত: ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবাহ যিনি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আবু দাউদসহ আরো বহু বিখ্যাত মুহাদ্দিসের সরাসরি ওস্তাদ তাঁর বিখ্যাত হাদিসের কিতাব এই মুসান্নাফ। এতে আমাদের আকিদা ও হানাফি মাযহাবের আমলের বহু সহিহ ও হাসান হাদিস রয়েছে।

শায়খ আলবানি এই হাদিসখানার ওপরেও জুলুম করেছেন। যেমনটা তিনি আরো অনেক সহিহ হাদিসের ওপরে করেছেন।

তিনি বলেছেন, যেহেতু মালিক আদ দার মজহুল বা অপরিচিত তাই এই হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ ফতহুল বারিতে ইমাম ইবনে হাজার রাহ. মালিক আদ দারের রাহ. পরিচয় দিয়েছেন তিনি ওমরের রা. বায়তুল মালের উজির বলে, যেই লোক প্রিয় নবীজির (ﷺ) রউজা শরিফে গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া চেয়েছিলেন উনার নাম উল্লেখ করেছেন হযরত বিলাল ইবনে হারিস আল মুজনি রা. বলে। এই হাদিসের সনদের কেউই মজহুল বা অপরিচিত নন।

এক সনদে হাদিসখানা আ'মাশ রাহ. থেকে আন আনা দ্বারা তাদলিস হয়েছে। কিন্তু ইমাম আমাশ রাহ. দ্বিতীয় পর্যায়ের মুদাল্লিস ছিলেন তাই উনার আন আনাতে কোন সমস্যা নেই। উনার তাদলিস বর্ণনা গ্রহণযোগ্য এতে ইমামগণ একমত।

CamScanner

৩.حديث ابن عمر أنه خدرت رجله، فقيل له: ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبُها. قيل له: اذكر أحبَّ الناس إليك قال: يا محمد، فبسطها

ইমাম বুখারী রাহ. তার আদাবুল মুফরাদে একখানা হাদিস এনেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রা. পায়ে ঝিঝি ধরল তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনার পায়ে কী হয়েছে। তিনি বললেন, রগগুলো সব এক হয়ে গেছে (রগে টান পড়েছে), তখন তাকে বলা হলো, আপনার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ করুন। তিনি বললেন, ইয়া মুহাম্মাদ (ﷺ)!" অতঃপর পা বিছিয়ে দিলেন। (আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী, হাদিস নং: ৯৬৪ অথবা ৯৭৫ এখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন খেয়ানত করেছে। আদাবুল মুফরাদের মূল কয়েকটি আরবি নুসখাতে ইয়া মুহাম্মাদ বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদে ইয়া কেটে দিয়ে শুধু মুহাম্মদ বলা হয়েছে। এটা ইলমি আমানতের খেয়ানত)

৪. ইমাম নববী রাহ. তার বিখ্যাত সহিহ মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাতে এবং কিতাবুল আজকারেও বর্ণনা করেছেন, সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রা. সামনে কিছু মানুষ বসেছিলেন। হঠাৎ একজনের পায়ে ঝি ঝি ধরলে, একজন সাহাবী বললেন, আপনার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ করুন। তিনি বললেন, ইয়া মুহাম্মাদ (ﷺ)! সাথে সাথে ভাল হয়ে গেলেন। এরকম আরো বহু আসার সাহাবাগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। (আল আজকার, দারুল কিতাব আল আরাবি, বৈরুত লেবানন, পৃষ্ঠা নং-২৭১)

৫. আল্লামা শাহাবুদ্দিন খাফজি মিসরি রাহ. তার বিখ্যাত শিফা শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসিমুর রিয়াদে উল্লেখ করেন, এটা মদীনাবাসীদের একটা সাধারণ চর্চিত রীতি ছিল। মদীনাবাসীরা

বিপদে ও দুঃখ কষ্টে ইয়া মুহাম্মাদ বলে আহ্বান করতেন। (নাসিমুর রিয়াদ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা নং-৫৫)

৬. উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদাহ আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যখন জিবরিল আলাইহিস সালাম প্রথম ওহী নিয়ে আসলেন, গাছ-বৃক্ষ পাথর সকলেই বলতে লাগল আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ। (মাজমাউজ জাওয়াইদ, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-২৬০)

৭. মুসলিম শরিফের সহিহ হাদিসে এসেছে যে, হিজরতের দীর্ঘ হাদিসে বলা হচ্ছে, হযরত বারা ইবনে আজিব রা. বর্ণনা করেছেন, যখন হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে প্রবেশ করলেন তখন,

فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله

নারী পুরুষ সবাই ছাদের ওপরে ওঠে গেল, শিশু ও দাসদাদীরা রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে লাগল, ইয়া মুহাম্মাদ (ﷺ) ইয়া রাসুলাল্লাহ! (সহিহ মুসলিম, খন্ড, ১৯, পৃষ্ঠা নং-১১২, হাদিস নং ৭৭০৭)

রেজা গিয়েছিল নানাশ্বশুর বাড়ি বেড়াতে, খেয়ে এলো শিরকের ফতোয়া!

মানুষ প্রথমবার নানা শ্বশুরবাড়ি গেলে কতকিছু খায়! কোরমা, পোলাও, রোস্ট, বিরিয়ানি, ফিরনি, জর্দা কতকিছু খায়। আর আমাদের রেজা খেয়ে আসল শিরকের ফতোয়া। কীভাবে? সেই গল্পই আজ বলব ইন শা আল্লাহ।

CamScanner

আমাদের রেজাকে পাঠকের মনে আছে? যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে পড়ালেখা করত? যার বন্ধু রোজেনের সাথে একবার বিদয়াতে হাসানা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল? সেই রেজা এখন অনার্স মাস্টার্স পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক। কিছুদিন হলো বিয়েও করেছে। তার স্ত্রী জাহরা বেশ কিছুদিন থেকেই বায়না ধরেছে নানার বাড়ি বেড়াতে যাবে। জাহরার নানা-নানুর বয়স হয়েছে অনেক। কোনদিন কী হয়! তাই নানা-নানু বেঁচে থাকতেই সে রেজাকে তার নানাবাড়িটা দেখাতে চায়।

জাহরার নানাবাড়ি সিলেটের শ্রীমংগলে। পাহাড়ঘেরা ছায়া সুনিবীড় শান্ত সুন্দর পরিবেশ। শ্রীমংগলকে বলা হয় চা কন্যা। চারদিকে যতদূর দুচোখ যাবে শুধু চাবাগান আর চাবাগান। এই এলাকার যে কোন মানুষের ভোরবেলা ঘুম ভাংগে পাখির কলকাকলীতে।

এরকম নৈসর্গিক পরিবেশের মাঝেই নানাবাড়িতে জাহরার জীবনের বড় একটা অংশ কেটেছে। তাই ঢাকা শহরের ইট পাথরের দেয়ালে বন্দিনী জাহরা খুব বেশি মিস করে এই শ্রীমংগলকে। আমাদের প্রকৃতি হচ্ছে, আমরা নিজেরা যে জিনিস ভালবাসি আমাদের প্রিয়জনের সাথে সে জিনিস শেয়ার করতে চাই। জাহরা তাদের বিয়ের পর থেকে রেজাকে শ্রীমংগল দেখানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। রেজা আবার কোনদিন চা বাগান দেখেনি। তাই তারও খুব আগ্রহ নানাশ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার। কিন্তু ঢাকা শহরের ব্যস্ততার জীবন, ফুরসত কোথায় সময় করে ঘুরতে যাওয়ার।

রোজার ঈদের পর লম্বা একটা বন্ধ পেয়ে গেল তারা। এবার তারা চিন্তা করল, আর মিস করা যায় না। এই সুযোগে শ্রীমংগলে যেতেই হবে। যথাসময়ে রেজা পারাবত ট্রেনের দুটো টিকেটও যোগাড় করে ফেলল। রোজার ঈদের দুদিন পর তারা রওয়ানা দিল শ্রীমংগলের উদ্দেশ্যে। পারাবত ট্রেনটি খুবই আরামপ্রদ। রেজা এবং জাহরা দুজনের কাছেই শীতের সকালে খুব ভোরে অসাধারণ লাগছিল এই ট্রেন ভ্রমণ।

যাইহোক, সকাল ১১:৩০ মিনিটে তারা শ্রীমংগল স্টেশনে পৌঁছে গেল। জাহরার ছোটমামা রফিকুল কবির সাহেব তাদেরকে স্টেশন থেকে রিসিভ করে বাসায় নিয়ে গেলেন। বাসায় পৌঁছে জাহরার নানা-নানুকে সালাম ও কুশল বিনিময় করে তারা দুজনেই ফ্রেশ হয়ে নিল। এরই মাঝে জোহরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে, রেজা তার ছোট মামাশ্বশুর রফিক সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, মামা আপনাদের মসজিদটা কোনদিকে?"

রফিক সাহেব বললেন, বাবা দাঁড়াও একসাথে যাই, আমিও ওজু করে আসছি।

নামাজ পড়ে বাসায় ফেরার পর রেজা দেখল মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক ড্রইং রুমে বসে আছেন। রফিক সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি তোমার বড় মামাশ্বশুর ইংল্যান্ডে থাকেন, সম্প্রতি দেশে এসেছেন আমাদের সবাইকে নিয়ে ঈদ করবেন বলে।

রেজা মুখে আসসালামু আলাইকুম বলে নুয়ে পা ছুয়ে সালাম করতে গেল তারা লন্ডন ফেরত বড় মামাশ্বশুরকে। তখনই ঘটল বিপত্তি। লন্ডনফেরত মামাশ্বশুর জনাব শফিকুল কবির সাহেব শিরক! শিরক!" বলে চিৎকার করে ওঠলেন।

রেজা থতমত খেয়ে গেল। শফিক সাহেব বললেন, কী করছ বাবা? মাথা নুয়ানো তো শিরক। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নোয়ালেই শিরক হয়ে যায়।

রেজা প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ওঠে পা ছুয়ে সালাম করা বাদ দিয়ে সোজা হয়ে লন্ডনফেরত মামাশ্বশুরের সাথে মুসাফাহা (হ্যান্ডশেক) করল এবং সোফায় বসে গেল। শফিক সাহেবও বসলেন। কুশল বিনিময়ের পর রেজা তার মামাশ্বশুর শফিক সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, মামা যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

শফিক সাহেব বললেন, হ্যাঁ বাবা অবশ্যই।

CamScanner

রেজা বলল, মামা আপনি বলছিলেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নোয়ালেই শিরক হয়ে যায়। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নোয়ানো যাবে না। ঠিক?"

শফিক সাহেব বললেন, অবশ্যই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নোয়ালেই শিরক হয়ে যায়। তুমি তো আরবি শিক্ষিত আলীম মানুষ, তোমার তো তা অবশ্যই জানার কথা।

রেজা বলল, ক্ষমা করবেন মামা! তাই যদি হয় তবে (মায়াজাল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ) ১ লক্ষ ২৪ হাজার মতান্তরে ২ লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রাসুল সবাই তো শিরক করেছেন।

এই কথা শুনে শফিক সাহেবের চেহারা লাল হয়ে গেল। তার চেহারাতে স্পষ্ট ছাপ ফুটে ওঠল যে, তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে গেছেন। অনেকটা চিৎকার করে ওঠলেন, কীভাবে? কীভাবে?

রেজা বলল, "মামা কুরআন মাজিদের কোন তাফসির কি আপনি পড়েছেন?"

শফিক সাহেব বললেন, "হ্যাঁ পড়েছি।"

রেজা জিজ্ঞেস করল, "কোনটা?"

শফিক সাহেব জবাব দিলেন, তাফসিরে ইবনে কাসির। এটাই তো সবচাইতে নির্ভরযোগ্য তাফসির। তাই না?"

রেজা বলল, আলহামদুলিল্লাহ! মামা, তাহলে তো আমার কাজ খুবই সোজা হয়ে গেল। তাফসিরে ইবনে কাসিরে সূরা ইউসুফের ৪ ও ১০০ নং আয়াতের তাফসিরখানা একটু দেখবেন কি?"

রেজার ছোট মামাশ্বশুর রফিক সাহেব পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন, আমাদের বাসায়ই তো আছে তাফসিরে ইবনে কাসিরের বংগানুবাদ।

তিনি দ্রুত গিয়ে তাফসিরে ইবনে কাসিরের বংগানুবাদটি নিয়ে আসলেন।

CamScanner

রেজা বলল, মামা সূরা ইউসুফের ৪ ও ১০০ নং আয়াতের সরল অর্থটা আগে একটু পড়ুন।

রফিক সাহেব পড়তে লাগলেন,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

"যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সুর্য এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি।" (সুরা ইউসুফ, সুরা নং -১২, আয়াত নং-৪)

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"এবং তিনি (ইউসুফ আঃ) পিতা-মাতাকে (ইয়াকুব আ: ও তাঁর স্ত্রীকে) সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তার সামনে সেজদাবনত হল। তিনি বললেন: পিতা এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা ইউসুফ, সুরা নং ১২, আয়াত নং-১০০)

রেজা বলল, মামা! এই ৪ নং আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছোটেবেলা তাঁর বাবা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে বলছেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, ১১ টি তারকা ও চন্দ্র-সূর্য তাঁকে সেজদা করছে। এখানে স্পষ্ট সেজদা শব্দটি এসেছে। মামা! সেজদা কী জিনিস আমরা জানি তো?"

CamScanner

শফিক সাহেব বললেন, হ্যাঁ। আমরা মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে যা করে থাকি নামাজে সেটাই তো সেজদা।

রেজা বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই। অতঃপর ১০০ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিশরের খাদ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন এবং তাঁর ১১ ভাই ও মা-বাবা যখন ঘটনাক্রমে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন ও তাঁর পরিচয় পেয়ে গেলেন। তখন মিশরে তাঁর দরবারে তিনি তাঁর মা-বাবাকে সিংহাসনে তাঁর পাশে বসালেন। তখন তাঁর ১১ ভাই ও মা বাবা তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন। সাথে সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার সেই ছোটবেলায় দেখা স্বপ্ন যা আমার প্রভূ বাস্তবায়ন করেছেন।

রেজা শফিক সাহেব ও রফিক সাহেব উভয়ের দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, ঠিক তো মামা?

দুই ভাইই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

রেজা বলতে লাগল, মামা! এখন আপনি বলুন। একজন নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম, যার সম্মানিত পিতা আরেকজন নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম (যিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নাতি এবং ইসহাক আলাইহিস সালামের পুত্র)। এক নবী তাঁর স্ত্রী এবং ১১ পুত্রসহ আরেক নবীকে সেজদা করেছেন। তাঁরা কী শিরক করলেন না? নাউজুবিল্লাহ।

প্রশ্ন শোনে শফিক সাহেব ও রফিক সাহেব উভয়েই বিব্রতবোধ করতে লাগলেন।

রেজা বলতে লাগল, এখন আসুন তাফসিরে ইবনে কাসিরে যাই, সূরা ইউসুফের ১০০ নং আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনে কাসির একদম প্রথম জমানার তাফসির গ্রন্থ ইমাম ইবনে জারির আত তাবারির তাফসিরে তাবারির সূত্রে বর্ণনা করছেন, মুফাসসির সর্দার

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., তাবিঈ মুজাহিদ ও কাতাদাহ রা. এর বরাত দিয়ে বলছেন,

"তাদের শরীয়তে এটা বৈধ ছিল যে তারা বড়দের সালামের সাথে সাথে সেজদাও করতেন। এমনকি আদম আ: থেকে শুরু করে ঈসা আ: পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতের জন্য এটা জায়েজ ছিল।" (তাবারি ১৬/২৬৯) (১)

রেজা বলতে লাগল, "এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে সকল নবী রাসূলের উম্মতগণই তাদের নবীগণকে সালামের সাথে সাথে সম্মানসূচক সেজদা করতেন। আর কারো উদ্দেশ্যে সেজদা করতে হলে তার সামনে মাথা নোয়াতেই হবে। তাও কতটুকু নোয়াতে হবে? আমরা পা ছুয়ে সালাম করতে যতটুকু নোয়াই ততটুকু? না, অবশ্যই না। বরং একদম মাটিতে কপাল ঠেকাতে হবে। তার মানে কী মামা সকল নবী-রাসুল এবং উনাদের উম্মতরাই তথাকথিত শিরক করেছেন?"

প্রশ্ন শুনে শফিক সাহেব একদম চুপসে গেলেন। চুপসে গিয়ে বললেন, কিন্তু বাবা এটা তো আগের যুগের নবীগণের শরীয়ত। আমাদের নবীজির (ﷺ) শরীয়তে অর্থাৎ শরীয়তে মুহাম্মাদিতে তো তা নিষিদ্ধ।

রেজা বলল, ওকে মামা। আমি ঐদিকে যাচ্ছি না এখন। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে সেজদায়ে তাহিয়া বা সম্মানসূচক সেজদা কারো উদ্দেশ্যে করা নিষিদ্ধ আমাদের শরীয়তে। কিন্তু এটা শিরক কীভাবে হয়? নিষিদ্ধ ও শিরক কী একই কথা?"

রেজা বলতে লাগল, মামা আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি আহলে হাদিস নামক একটা বাতিল মতবাদ দ্বারা আক্রান্ত। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আপনারা তো কুরআন ও হাদিস ছাড়া অন্যকিছু মানেন না বলেই জানি। আমাকে কুরআন মাজিদের আয়াত তো পাবেনই না এই সম্পর্কে, সহিহ হাদিসও লাগবে না, বরং একটা হাসান

CamScanner

কিংবা দইফ হাদিস দেখান তো যেখানে বলা আছে, "কোন মানুষ অপর মানুষের সামনে মাথা নোয়ালেই শিরক হয়ে যায়।"

শফিক সাহেব নেতিবাচক মাথা নাড়লেন, তার অর্থ এরকম কোন হাদিস নেই।

রেজা বলতে লাগল, মামা! শিরক মানে আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরিক করা। অন্য কারো ইবাদাত করা। কাউকে ইলাহ বা উপাস্য মনে করা। আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মনে করা। এটা নিয়তের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। আমি যখন নামাজ পড়ি তখন আল্লাহর ইবাদাত করি। আমার নিয়ত তখন ইবাদাতের। সেজদা যখন দিই তা ইবাদাতের সেজদা। আর যখন মুরুব্বি, মা-বাবা, ওস্তাজ-মাশায়েখের পা ছুয়ার জন্য অথবা পায়ে চুমু দেয়ার জন্য মাথা নত করি, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে সম্মান করা, তাজিম। দুটোর মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য। মামা! আমরা আমাদের মা, স্ত্রী ও সন্তানের কপালে চুমু দেই। তিনটার উদ্দেশ্য কী এক? কোনদিনও না। একই কাজ, কিন্তু উদ্দেশ্য তিন রকম। মাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা থেকে কপালে চুমু দিলাম, স্ত্রীকে ভালবেসে চুমু দিলাম, আর সন্তানকে স্নেহ করে চুমু দিলাম। পুরো বিষয়টিই অন্তরের নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। যে কারণে বুখারী শরিফে এত হাজার হাদিস রেখে প্রথম হাদিসখানাই আনা হয়েছে যে, প্রত্যেক আমলের কর্মফল নির্ভর করে তার নিয়তের ওপর।

একটু দম নিয়ে রেজা আবার শুরু করল, মামা! নিষিদ্ধ আর শিরকের মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য। নিষিদ্ধ কোন কিছু করলে কবিরা গুনাহ হয়, আর কেউ শিরক করলে আল্লাহ বলছেন কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

রেজা আরো যোগ করল, আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এখানে বুঝা দরকার। কোন একটা আমল এক নবীর সময়ে যা জায়েজ তা অপর নবীর সময়ে নাজায়েজ হতে পারে। যেমন,

CamScanner

ইয়াকুবের আঃ শরীয়তে আপন দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা জায়েজ ছিল, যা আমাদের ধর্মে সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিরকের হুকুম সকল ধর্মে এক। আদম আলাইহিস সালামের সময় যা শিরক তা পরবর্তী সকল নবীর সময়ই শিরক ছিল এবং আজীবন থাকবে। কারণ শিরক আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহিদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। আল্লাহর একত্ববাদের যেমন কোন পরিবর্তন নেই, ঠিক তেমনি শিরকের হুকুমও কোন নবীজির (ﷺ) জমানাতেই পরিবর্তন হয় নাই।

এতক্ষণ পর হঠাৎ করে শফিক সাহেব মনে হলো নতুন আরেকটা সূত্র পেয়েছেন। বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। মানলাম, কারো সামনে মাথা নত করা শিরক না। কিন্তু আমাদের নবীজির (ﷺ) শরীয়তে তো কারো সামনে মাথা নোয়ানোর কোন দলিল নেই?"

রেজা বলল, আছে, মামা। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহর হদিসের কিতাবেই আছে। শুধুমাত্র তিনটি হাদিস এখানে উল্লেখ করছি।

১. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রা. হতে অনেক লম্বা একখানা হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলছেন, একবার দুজন ইহুদী ব্যক্তি প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে আসল এবং নয়টি স্পষ্ট নির্দেশনা কী কী তা জিজ্ঞেস করল। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারা উভয়েই হুজুর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হস্তপদ মুবারক চুম্বন করল। অতঃপর উভয়েই বলল, আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি নবী। (২)

এখানে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পদচুম্বনে কোন বাধা দেন নাই।

২. হযরত জারে' রা. হতে বর্ণিত, যিনি ওয়াফাদে আব্দুল কায়েসের একজন সদস্য ছিলেন, তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনা শরিফে

CamScanner

আগমন করলাম। আমরা তাড়াহুড়ো করে সওয়ারী থেকে নেমে গেলাম। অতঃপর হুজুর নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হস্ত পদ মোবারক চুম্বন করলাম। (৩)

৩. ইমাম বোখারির রাহ. আদাবুল মুফরাদ কিতাবে এসেছে যে, হযরত আলী রা. তাঁর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্তালিবের রা. পদচুম্বন করেছেন। (৪)

একদমে রেজা ওপরের হাদিস তিনখানা বলে কক্ষের চারপাশে তাকাল। তাকিয়ে দেখল আলাপের কোন এক ফাঁকে রুমে জাহরাও চলে এসেছে সে বুঝতেও পারেনি এবং স্বামীর বিজয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছে।

রেজা উপসংহার টানার মত করে বলল, মামা! আমাদের আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, কারো সামনে সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা নত হলেই শিরক হয় না। বরং কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে মাথা নত করলেই কেবল শিরক হবে। আর মা-বাবা, ওস্তাজ-মাশাইখ ও মুরুব্বির হাতে পায়ে চুমু দেয়া সুন্নাহ। আর হস্তপদ চুম্বন করলে তো মাথা নোয়াতেই হবে। এটা তো আর সম্ভব না যে কেউ তার মুরুব্বি বা সম্মানিত কাউকে বলবে যে, আমি আপনার পদচুম্বন করতে চাই, কিন্তু আমার মাথা যেন নত না হয় সেজন্য আপনি আপনার পাগুলো ওপরে উচিয়ে ধরুন আমি চুমু দেব।

রেজার এই কথা বলার সাথে সাথে সবাই হু হু করে হেসে ওঠল। পর্দার অন্তরাল থেকে জাহরার লন্ডনপ্রবাসী বড়মামীর গলার আওয়াজ শোনা গেল, আপনারা সবাই খেতে আসুন। দুপুরের খাবারের সময় গড়িয়ে আসরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. আরবি তথ্যসূত্রঃ তাফসিরে ইবনে কাসির, ছাপাঃ দারুল হাদিস কায়রো, খন্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং- ৬১০।

CamScanner

বাংলা অনুবাদ তথ্যসূত্র: তাফসিরে ইবনে কাসির, ১২ তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২২১। অনুবাদ: ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, তাফসির পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা।

২. তিরমিজি, হাদিস নং- ২৭৩৩, নাসাই, হাদিস নং-৪০৭৮, ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ৩৭০৫, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি রাহ. এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন, তালখিসুল হাবিরে, (৫/২৪০), ইমাম নববী আল মাজমু কিতাবে (৪/৬৪০) একে সহিহ বলেছেন।

৩. সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫২২৭, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন ফতহুল বারিতে (১১/৫৭)।

৪. আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বোখারি রাহ., হাদিস নং-৯৭৫।

এরপরও কী বিশ্বাস করবে না অবিশ্বাসীরা?

কেয়ামতের আলামতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) পষ্টভাবে হাদিস শরিফে ঘোষণা করছেন,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

"আমার উম্মতের কিছু মানুষ মদপান করবে। একে অন্য নামে নামকরণ করবে। তারা সংগীত করবে তাদের মাথার ওপরে বাদ্যযন্ত্র রেখে আর থাকবে গায়িকা। আল্লাহ তাদেরসহ ভূমিধস করে দিবেন। তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করে দিবেন। - সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং - ৪০২০।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! শুধুমাত্র একটা বিষয়ের দিকে ফোকাস করতে অনুরোধ করছি। শেষ জমানায় মাথার ওপরে বাদ্যযন্ত্র থাকবে মানে

CamScanner

কী? খেয়ে বসতে ওঠতে ঘুমাতে এখন হ্যাডফোন আমাদের ইয়াং জেনারেশনের কানে গোজা থাকে। এটা আর কিছুই নয়, প্রিয় নবী (ﷺ) বর্ণিত কেয়ামতের একখানা আলামত যা সত্যে পরিণত হয়েছে।

এরপরও কী বিশ্বাস করবে না অবিশ্বাসীরা?

দাওয়াতের হিকমত

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ আসলাম

এটা দয়া করে পড়ুন, কারণ এটা দাওয়াতের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে আমাদের অপর মুসলিমকে সাহায্য করা উচিত যারা নিজেদের আমল শোধরাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

একদিন শায়খ হাবিব আহমদ আফ্রিকার একটি গ্রামে গেলেন এবং সেখানকার মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। গ্রামের সর্দার বললেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন কিন্তু নামাজ পড়তে পারবেন না। শায়খ হাবিব আহমদ বললেন, আপনি বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আপনাকে নামাজ নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না। সেই সর্দার ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এর কিছুদিন পরেই ঈদের দিন আসলে শায়খ হাবিব আহমদ ঐ সর্দারকে বললেন, মাত্র দুই রাকাত নামাজ এটা আপনি আদায় করতেই পারেন পুরো গ্রামবাসীর সাথে। তিনি আরো বুঝালেন, মাত্র দুই রাকাত নামাজ, তারপর আপনি বিশ্রাম করতে পারেন, খাওয়া দাওয়া করতে পারেন, সামাজিকতা করতে পারেন এবং মানুষজনের সাথে খোশগল্প করতে পারেন। সর্দার আসলেন এবং সবাই তাকে স্বাগতম জানাল। তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়লেন এবং বাকি সারাদিন আরাম- আয়েশ করলেন।

CamScanner

এর কিছু দিন পরেই শায়খ ঐ সর্দারকে জুমুয়ার নামাজের আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন এটাও ঐ ঈদের নামাজের মতই খুবই সহজ এবং সুন্দর। সর্দার জুমুয়াতে আসলেন এবং তার ভাল লাগল জুমুয়া পড়ে। তারপর থেকে প্রতিটি জুমুয়াতেই তিনি আসতে লাগলেন।

এক মাস এভাবে যাওয়ার পর শায়খ ঐ সর্দারকে মাগরিবের নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন এটা মাত্র ৩ রাকাআত। জুমুয়া ও ঈদ থেকে মাত্র এক রাকাআত বেশি। সর্দার মাগরিবের নামাজ পড়লেন এবং এর পরবর্তী মাগরিবের নামাজ গুলোতেও হাজির হতে লাগলেন।

এভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই সর্দার ৫ ওয়াক্ত নামাজ জায়াতের সাথে আদায় করতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ। শায়খের হিকমতের দিকে লক্ষ্য করুন। এটা ছিল শায়খ হাবিব আহমদের দাওয়াত এবং এভাবে তার মাধ্যমে শুধুমাত্র আফ্রিকাতেই ৩ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা ছিল হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) র তরিকা।

শিক্ষা: সবার জন্য নম্র ও সহজ হোন। মানুষের ঘাড়ের ওপরে দ্বীনকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন না। আস্তে আস্তে শুরু করুন। যদি কোন বোন হিজাব মেইন্টেইন করতে অনিচ্ছুক হন তবে তাকে সাহায্য করুন। তিনি আপনার বোন। তাকে লজ্জা দেবেন না, তাচ্ছিল্য করবেন না এবং এমন দাবি করবেন না যে এক্ষুনি আপনাকে নিকাব পড়া শুরু করে দিতে হবে। যদি কোন ভাই শুধুমাত্র জুমুয়া ও ঈদ নামাজ পড়ে তবে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন যে সে কমপক্ষে জুমুয়া ও ঈদের নামাজ তো আদায় করছে।

আপনার কী ইচ্ছা যে সে এতটুকুও না করুক? তাদের কোন আমলকেই ছোট করে দেখবেন না এবং তাদেরকে মুনাফিক ডাকা শুরু করে দেবেন না। মানুষ কুরআন- হাদিস স্টাডি শুরু করার সাথেই সাথেই তাকে টিভি ভেংগে ফেলে দিতে বলবেন না,

CamScanner

টেবলেট, লেপটপ, আই ফোন ইত্যাদি ডাস্টবিনে ফেলে দিতে বলবেন না। রিলাক্স।

মানুষ যদি শুধুমাত্র রামাদানে ইবাদাত করে এবং এই মাস গেলেই আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়, তবে তাদের হাত আঁকড়ে ধরুন, তাদেরকে সাহায্য করুন। এমন কোন ভাব করবেন না যে আপনি তাদের চাইতে অনেক বেশি ধার্মিক এবং তারা ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। ইবলিস ততদিন পর্যন্ত ফেরেশতাদের সর্দার ছিল যতদিন না সে একজন মানুষকে তাচ্ছিল্য করা শুরু করে এবং দেখুন তা তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে।

যারা বলেন জিকিরের মাজলিস বলতে জ্ঞানচর্চার মাজলিসকেই বুঝানো হয়েছে তাদের জন্য

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ :" كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ ، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ ، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ ، فَهُمْ أَفْضَلُ ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا" ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমা হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মসজিদে দুটো মজলিসের পাশ দিয়ে গমন করলেন। অতঃপর বললেন, দুটো মজলিগণ কল্যাণের ওপরে আছে। একে অপরের চেয়ে উত্তম। তাদের একটি মজলিস আল্লাহকে ডাকছে, তার প্রতি মানুষকে উৎসাহীত করছে, অতঃপর আল্লাহ যদি চান তাদেরকে দান করবেন। যদি চান দান করা থেকে বিরত থাকবেন। আর এরা ইলম ও ফিকহের চর্চায় রত আছে। অজ্ঞদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, তারা

উত্তম। আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.) বললেন, অতঃপর তিনি তাদের সাথে বসে গেলেন।" (তথ্যসূত্রঃ সুনান আদ দারেমি, জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদার পরিচ্ছেদ, হাদিস নং-৩৫৩)

হাদিসের মান সহিহ।

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, জিকিরের মাহফিল ও জ্ঞানচর্চার মাহফিল আলাদা বিষয়। দুটোই উত্তম এবং দুটোই প্রিয় নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগে আলাদা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হত।

নির্দিষ্ট একটি মাযহাবেরই অনুসরণ কেন করতে হবে?

চার মাযহাবই যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমি একেক আমলের ক্ষেত্রে একেক মাযহাবের অনুসরণ কেন করতে পারব না, সকল আমলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবেরই অনুসরণ কেন করতে হবে?

চার মাযহাবই হক্ব, আমাদেরকে চার মাযহাব মানতে হবে। চার মাযহাবের চার ইমাম যথা ইমামে আজম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রত্যেকেই মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব (স্বাধীন আইনবেত্তা) ছিলেন। এছাড়াও আরো অনেক মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ইমাম ছিলেন, যাদের মাযহাব পরবর্তীতে বিলীন হয়ে গেছে তাঁদের অনুসারীদের অবহেলা ও লিপিবদ্ধ না করে রাখার কারণে।

ইজতিহাদ কি? মুজতাহিদ কে?

بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية

ইজতিহাদ হচ্ছে, শরীয়তের ধারণাগত (অকাট্য নয়) কোন আমলি (আকিদার কোন বিষয়ে নয়) বিষয়ে শরীয়তের বিস্তারিত দলিল আদিল্লাহ ঘেটে সমাধান বের করতে একজন ফকিহের (ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদ) প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলে। এই কাজ যিনি করেন তিনিই মুজতাহিদ।

মুজতাহিদ মূলত ২ প্রকার:

১. মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব (স্বাধীন আইনবেত্তা) : যিনি কুরআন শরিফ, প্রিয় নবীজির (ﷺ) সুন্নাহ, সাহাবাগণের কথাগুলো সম্পর্কে এবং ইসলামি শরীয়তের জ্ঞানের আরো যত বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা আছে সেসব সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখেন এবং ইজতিহাদ করে শরীয়তের হুকুম আহকামগুলোর সমাধান দিয়ে গেছেন। যিনি নিজে ফিকহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্রের কিছু উসুল (মৌলিক নীতিমালা) দিয়ে গেছেন।

২. মুজতাহিদ মুক্বাইয়াদ ফিল মাযহাব (মাযহাবের অধীন আইনবেত্তা) : যিনি কুরআন শরিফ, প্রিয় নবীজির (ﷺ) সুন্নাহ, সাহাবাগণের কথাগুলো সম্পর্কে এবং ইসলামি শরীয়তের জ্ঞানের আরো যত বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা আছে সেসব সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখেন এবং ইজতিহাদ করে শরীয়তের হুকুম আহকামগুলোর সমাধান দিতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজে ফিকহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্রের উসুল (মৌলিক নীতিমালা) দেন নাই, বরং পূর্ববর্তী কোন একজন মুজতাহিদ মুত্বলাকের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে শরীয়তের জন্নী বা ধারণাগত (ক্বাতয়ী বা অকাট্য নয়) কোন আমলি (আকিদার কোন বিষয়ে নয়) বিষয়ের সমাধান দিয়ে থাকেন।

মুজতাহিদ মুত্বলাক (স্বাধীন আইনবেত্তা) আর আসবেন না এ বিষয়ে এই উম্মতের ইজমা আছে। কারণ নতুন করে কোন মাযহাব করার কোন সুযোগ নেই, তা ফিতনার দিকে নিয়ে যাবে উম্মতকে। তবে মুজতাহিদ মুক্বাইয়াদ ফিল মাযহাব (মাযহাবের অধীন আইনবেত্তা)

কাল কেয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবেন। কারণ নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে কেয়ামত পর্যন্তই আসতে থাকবে, যেগুলো চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের উসুল বা মৌলিক নীতিমালাসমূহ অনুসারে সমাধান দিতে হবে।

মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ও মুজতাহিদ মুক্বাইয়াদ ছাড়া আর আমরা বাকি যারা আছি আমরা সবাই মুক্বাল্লিদ (কোন নির্দিষ্ট এক মাযহাবের ইসলামি আইনশাস্ত্রের অনুসরণকারী)।

এখন প্রশ্ন আসে: মুক্বাল্লিদের ক্ষেত্রে চার মাযহাবই যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমি একেক আমলের ক্ষেত্রে একেক মাযহাবের অনুসরণ কেন করতে পারব না, সকল আমলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবেরই অনুসরণ কেন করতে হবে?

তার উত্তর হচ্ছে: আমরা মুক্বাল্লিদরা একসাথে চার মাযহাবের অনুসরণ করতে পারব না, এতে বিশাল বড় সমস্যা আছে। কারণ প্রতিটি মাযহাবের মৌলিক নীতি বা উসুলে ফিকহ অনুসারে, শরীয়তের হুকুম আহকামের কিছু কিছু বিষয়ে কিছু রুখসত বা ছাড় আছে, যেমন হজ্জে তাওয়াফে বিদা না করলেও হজ্জ আদায় হয়, এটা মালিকি মাযহাবের মত। শাফিয়ি মাযহাব মতে দাড়ি রাখা সুন্নাহ, না রাখলে গুনাহগার হয় না। কোন কোন মাযহাবে জামাতে নামাজ আদায় ও ঈদের নামাজ সুন্নাহ বা ফরজে কেফায়া, প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক নয়। হানাফি মাযহাব মতে জুমুয়ার নামাজ শুধু শহরবাসীর জন্য ফরজ।

কোন কোন মাযহাব মতে পরিধেয় স্বর্নালঙ্কারের জাকাত ফরজ না, সব্জি ও ফলমূলের জাকাত দেয়া ফরজ না। কোন কোন মাযহাবে হজ্জের সময় ওমরা করা আবশ্যক না। কোন কোন মাযহাবে পাগল ও শিশুদের সম্পদ থেকে জাকাত আদায় আবশ্যক নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিভিন্ন মাযহাবের মৌলিক নীতি অনুসারে এরকম ছাড়ের শত শত উদাহরন দিতে পারব। ভিন্ন ভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন

মাযহাবের এই ছাড়গুলো খোঁজে খোঁজে যদি কেউ সুযোগ নিতে চায়, তবে সে হবে দুনিয়ার নিকৃষ্ট সুবিধাবাদী মুসলমান। তাই সাধারন মানুষের জন্য সকল আমলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসরণের বিকল্প নেই, কিন্তু চার মাযহাবের আমলকেই হক্ব মানতে হবে। এর ওপরেই উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত হয়েছে।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (ﷺ) অধিক অবগত আছেন।

"মাযহাবি মতপার্থক্য" হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) জমানাতেও ছিল

মূল: সায়্যিদ হাসান আহমদ মুহাম্মদ আল ক্বাফ আল হাশেমী (মা জি আ) - মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ, হেজায, আল-আরব।

শায়খের সাথে আলাপ হচ্ছিল মাযহাব (শরীয়তের হুকুম আহকাম মেনে চলার পথ ও মত) নিয়ে। এক ভাই প্রশ্ন করলেন, ইয়া সায়্যিদি! হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) জমানাতেও কি মাযহাব ছিল?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিল।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে?

তিনি বললেন, ধর একজন সাহাবী ইয়েমেন থেকে আসলেন, এক বছর পর্যন্ত তিনি নবী করিমের (ﷺ) সংস্পর্শে থাকলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সায়্যিদুনান নবী (ﷺ) নিমের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করছেন। এক বছর পর ঐ সাহাবী নিজ দেশ ইয়েমেনে ফিরে গেলেন এবং ঘোষনা করে দিলেন যে, নিমের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

এর পরবর্তী বছর অপর একজন সাহাবী নবী করিমের (ﷺ) সাহচর্য্য নিলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন যে, নবী করীম (ﷺ) জয়তুনের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করছেন। মনে করুন ঐ সাহাবীকে প্রিয়

নবীজি (ﷺ) বাহরাইনের গভর্ণর করে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ সাহাবী গিয়ে সবার কাছে বলতে লাগলেন, জয়তুনের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা সুন্নাহ।

এর পরবর্তী বছর আরেকজন সাহাবী সায়্যিদুনান নবীর (ﷺ) সাহচর্যে আসলেন এবং দেখতে পেলেন যে, নবীজি (ﷺ) খেজুরের ডালের খন্ডাংশ দিয়ে মিসওয়াক করছেন। তিনিও এক বছর পর অন্য আরেক দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে চলে গেলেন এবং গিয়ে সেখানে প্রচার করতে লাগলেন, খেজুরের ডালের খন্ডাংশ দিয়ে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

এখন হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) এই তিনজন সাহাবী তিন রকম সুন্নাহ বর্ণনা করছেন মানুষের কাছে। তাঁদের কাউকে কি দুনিয়ার কোন মানুষ ভুল বলতে পারবে? কস্মিনকালেও নয়। এভাবেই মাযহাবের বুনিয়াদ প্রিয় নবীর (ﷺ) জমানাতেই গড়ে ওঠে। তবে মনে রাখতে হবে, আকিদার উসূল এবং শরীয়তের ফরজ হুকুম-আহকামের ব্যাপারে মাযহাবের চার ইমামের কারো সাথে কারো কোন বিরোধ নেই। আর মাযহাব আরো অনেকগুলো ছিল। ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং ইমাম লাইস ইবনে সা'দ রাহ. সহ আরো অনেকের মাযহাব ছিল।

কিন্তু চার মাযহাব ভিন্ন বাকি এই মাযহাবগুলোর উসূল ও বিস্তারিত ফিকাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং তাঁদের পরবর্তী সাগরেদদের অবহেলার কারণেও এই মাযহাবগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। চারটি মাযহাব মেজরিটি মুসলমানদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং প্রথম যুগের মুজতাহিদ ফোকাহা আয়েম্মা ও আম মুসলমানদের মাঝে এই চার মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত, যা মানা ওয়াজিব এবং যা ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় সোর্স) হয়। এই ইজমার অন্যথা করা বিশাল বড় একটা ফিতনা।

CamScanner

অনুসরণ কেন চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

এটা একদম প্রকাশ্য বিষয় যে, সাহাবাগণ ও তাবেয়িনগণ থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী এই উম্মতের মুজতাহিদের (সরাসরি কুরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে শরীয়তের হুকুম বের করতে সমর্থ্য দ্বীনের জ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জনকারী আলীমে দ্বীন ফকিহ) সংখ্যা অসংখ্য। তাহলে এই উম্মত শুধুমাত্র চারটি মাযহাবের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? ইমাম ইবনে রজব হাম্বলীর রাহ. কাছ থেকে এই প্রশ্নের জবাব শুনব। তিনি তাঁর রিসালা আর রাদ্দু আলা মানিত্তাবাআ' গাইরাল মাজাহিবিল আরবাআ'র (চার মাযহাবের বাহিরে যে অন্য মাযহাবের অনুসরণ করে তার অসাড়তা) ৩৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন, যদি বলা হয় যে, হ্যাঁ, আমরা সাধারণ মানুষের জন্য ইজতেহাদ (সরাসরি কুরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে শরীয়তের হুকুম বের করা) করার রাস্তা বন্ধ করার পক্ষপাতি (অর্থাৎ সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে মাযহাবের অনুসরণেরই পক্ষপাতি), কারণ এর অন্যথা অনেক বড় বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিবে। কিন্তু আমরা ঐ সমস্ত বিখ্যাত ইমামগণ (চার মাযহাবের ঈমানগণ) ছাড়া বাকি মুজতাহিদ (সরাসরি কুরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে শরীয়তের হুকুম বের করতে সমর্থ্য) ইমামগণের অনুসরনে বাঁধা দিতে পারি না যাদের অনুসরণ করা হতো।

জবাব হচ্ছেঃ আমাদেরকে এই বাঁধা দেয়ার কারণ হচ্ছে, ঐ সমস্ত বিখ্যাত ইমামগণ (চার মাযহাবের ঈমানগণ) ছাড়া বাকিদের মাযহাবগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। এমনও হয়েছে যে, যা তাঁরা বলেননি তা তাদের দিকে যুক্ত করা হয়েছে, এমন কিছু তাদের থেকে নেয়া হয়েছে যা তারা আসলে বুঝাতে চান নি। তাঁদের মাযহাবগুলোর জন্য এমন কেউ দাঁড়াননি যিনি এগুলোর প্রতিরোধ করবেন অথবা যে অসংলগ্ন বিষয়গুলো প্রবেশ করেছে সেগুলোর সমাধান দিবেন, শুধুমাত্র ঐ সমস্ত বিখ্যাত ইমামগণের (চার মাযহাবের ঈমানগণ) মাযহাবসমূহ ব্যতিত।

আসলে ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহ. যা বুঝাতে চেয়েছেন তা খুবই স্পষ্ট। কারণ সাহাবাগণের মাযহাব বুঝাও কারো জন্য সম্ভব নয়। যদিও তা হয় বড় বড় কোন বিষয়ে। যেমন নামাজ যা ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ, এটা কোন সময়ই সম্ভব নয় যে, এককভাবে শুধু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বা অন্য কোন সাহাবার আমল থেকে এটা পার্থক্য করা যে কোন নামাজটি ফরজ আর কোনটি সুন্নাহ।

এই কারণে অর্থাৎ তাঁদের মাযহাবসমূহের সংরক্ষনের অভাবে, আমরা দেখতে পাই যে, অনেক বড় বড় ইমামগণ নির্দিষ্ট কোন একজন সাহাবীর অনুসরণও নিষেধ করেছেন। অনেকে এর উপর ইজমাও বর্ণনা করেছেন। ইমামুল হারামাইন আল জুয়ুনী রাহ. (৪১৭ হি:-৪৭৮ হি:) তাঁর আল বুরহান কিতাবে (২/৭৪৪) বলেন, মুহাক্কিক উলামাগণ এই বিষয়ে একমত যে, সাধারন মানুষের জন্য কোন নির্দিষ্ট একজন সাহাবীর অনুসরণ করাও জায়েজ নেই। বরং তাদের জন্য সে সকল ইমামগণের অনুসরণ জরুরী যারা রিসার্চ করেছেন, চিন্তাভাবনা করেছেন, সময় ব্যয় করেছেন, সবকিছু আলাদা আলাদা অধ্যায়ে-পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন এবং মাসআলাগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তীদের মাযহাবের কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন। কারণ যদিও তারা অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন এবং তারা উম্মতের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় কিন্তু তাঁরা তাঁদের ইজতিহাদের তরিকা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেননি, তাঁদের গবেষণার তরিকা, বিশ্লেষণ, মতানৈক্য ও তাঁদের কথাগুলো সংরক্ষণ স্পষ্ট করে যান নি। তৎপরবর্তী ফিকহের আয়েম্মাগণ যারা এসেছেন তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মাযহাবগুলো নিয়ে যথেষ্ট রিসার্চ করেছেন, তাই একজন সাধারন মানুষের জন্য ঐ সমস্ত রিসার্চার ইমামগণের অনুসরণই যথেষ্ট।

CamScanner

বিষয়টি ইমাম ও মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহের কথায় আরো স্পষ্ট হয়, ইমাম ইবনু হাজর হায়তামী রাহঃ তাঁর বিখ্যাত ফতোয়া আল ফিক্বহিয়্যাহ আল কুবরায় (৮/৩৪০) বর্ণনা করেন, ইমাম ইবনুস সালাহ কঠোরভাবে বলেছেন তাঁর ফতোয়ার কিতাবে, যা ইমামুল হারামাইন আল জুয়ুনীও রাহ. বলে গেছেন, তিনি আরো বলেছেন, এমনকি তাবিয়িনগণের কাউকেও এককভাবে অনুসরণ করা যাবে না। আর যার মাযহাব লিপিবদ্ধ হয়নি তাঁর মাযহাবও অনুসরণ করা যাবে না। একমাত্র যার মাযহাব লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তার প্রসার হয়েছে তাঁদের মাযহাবই অনুসরণ করা যাবে, কারণ তাঁদের জেনারেল স্টেটম্যান্ট (মুত্বলাক্ব) কোনটি ও কন্ডিশনাল স্টেটম্যান্ট (মুক্বাইয়াদ) কোনটি তা নির্দিষ্ট হয়েছে। যা বাকিদের বিপরীত, হয়ত শুধুমাত্র তাঁদের ফতোয়াই সবার কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তা হতে পারে অসম্পূর্ণ, আম, খাস, মুত্বলাক, মুক্বাইয়াদ যা আরো বিস্তারিত আলাপ হলে তার বিপরীতটা বুঝা যায়, অর্থাৎ ফতোয়া প্রদানকারীর ফতোয়াটি বিস্তারিত আলাপ হলে বরং ফতোয়ার বিপরীত দিকটি সামনে চলে আসে। তাই যেহেতু তাঁদের মাযহাবের মূলে পৌঁছানো অসম্ভব তাদের মাযহাবের অনুকরণও নিষিদ্ধ।

ইমামগণের কথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, চার মাযহাবের বাহিরে অন্য মাযহাব অনুসরণ করা জায়েজ নেই। এর কারণ হলো তাদের মাযহাবের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সমস্যা থাকা। যদি এই সমস্যাটা আমরা উৎড়াতে পারি তবে মুজতাহিদ সাহাবাগণ ও তৎপরবর্তীগণের অনুকরণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে জায়েজ আছে। কিন্তু বিচার আচার ও ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে মাযহাবের অনুসরনেই চলতে হবে। এটা স্পষ্ট একটি স্বীকৃত বিষয় যার ওপরে উম্মতের মাঝে বাস্তবে তাদের কর্মের দ্বারা ইজমা হয়েছে। সকল মুসলিম দেশ তাদের আচার বিচারের ব্যাপারে চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের অনুকরণ করে এবং ফতোয়ার ক্ষেত্রেও চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করে।

ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষিত মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি একটি বিনীত অনুরোধ!

আমার প্রিয় ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষিত ভাই ও বোনেরা! হানাফি মাযহাব তৎকালীন সময়ের যুগশ্রেষ্ঠ ৪০ জন ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির আলীমে দ্বীনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল, কোন একক ব্যক্তির মত নয়। এই চল্লিশজনের অনেকেই আবার হাফিজুল হাদিস ছিলেন! হাফিজুল হাদিস কি জিনিস, তা কি আপনারা জানেন? যার লক্ষ লক্ষ হাদিস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ থাকে তাঁকে হাফিজুল হাদিস বলা হয়।

তাই যদি আপনি না জানেন তবে কুরআন মজীদ বলছে,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর"। (২১:৭)

সেহেতু হানাফি মাযহাবের কোন আমলের কুরআন-সুন্নাহগত দলিল যদি আপনি খুঁজে না পান তবে এটা মনে করবেন না যে, হানাফি মাযহাবের কোন আমল কুরআন-হাদিসের বাহিরে। বরং এটা মনে করবেন যে, আপনি ঐ দলিল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন নি। কাজেই যিনি জানেন তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। আবার এটাও হতে পারে, আদৌ আপনি যাকে জানে মনে করে জিজ্ঞেস করছেন, তিনিও দলিল না জেনেই শুধু তাক্বলিদ করছেন। তাই সঠিক লোককে জিজ্ঞেস করুন ও জেনে নিন।

তবে আপনাকে এতটুকু গ্যারান্টি দিচ্ছি, হানাফি মাযহাবের আমলগুলো হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামগণের আমলের বাহিরে না।

আর যদি বলেন যে, বুখারী শরিফে আমাদের মাযহাবের আমলগুলোর দলিল নেই কেন? তবে বলব, ভাই আপনি বুখারী শরিফের পুরো নামটি আগে জেনে নিন, এই নামের মধ্যেই আপনার

CamScanner

প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি বুখারী শরিফের পুরো নাম হচ্ছে:

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه

"আল জামি' আল-মুসনাদ আস সহিহ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি (ﷺ) ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি"

আপনি এখন বলবেন, বাপরে! এত বড় নাম? আমি তো সারাজীবন শুধু শুনলাম "সহিহ বুখারী"।

হুঁ! হাদিস নিয়ে অল্প বিস্তর যারা পড়ালেখা করেছেন তারা জানেন বুখারীর পুরো নাম। এখানে 'আল-মুখতাসার' একটি শব্দ আছে। যার অর্থ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য ছিল সহিহ হাদিসগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর কিতাবে সংরক্ষন করবেন। তাই সকল সহিহ হাদিস বুখারীতে সীমাবদ্ধ নেই। সহিহ হাদিস শুধু বুখারী-মুসলিমেই আছে এটা মনে করা একটা মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

ইমাম বুখারী রাহ. স্পষ্ট বলে গেছেন যে,

قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح؛ (سير أعلام النبلاء جـ ١٢ صـ ٤١٥).

"আমার এক লক্ষ সহিহ হাদিস ও দুই লক্ষ দ্বয়িফ হাদিস মুখস্থ আছে।" (তথ্যসূত্র: সিয়ারুল আ'লাম ওয়ান নুবালা, ইমাম জাহাবি, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা: ৪১৫)

তাহলে বুখারীতে আসা ৭০০০ এর চেয়ে কিছু বেশি সহিহ হাদিসের পর ইমাম বুখারীর মুখস্থ করা বাকি ৯৩,০০০ সহিহ হাদিস কোথায় গেল? বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাব মিলিয়েও ১২,০০০ এর বেশি সহিহ হাদিস হয় না, তো ইমাম বুখারীর মুখস্থ করা বাকি ৮৮,০০০ সহিহ হাদিস কোথায় গেল?

CamScanner

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! হাদিসের কিতাব আছে ১৫০ এরও বেশি। হাদিস দ্বয়িফ কি সহিহ তার উপরে হুকুম কিতাব দেখে দেয়া হয় না। বরং নির্দিষ্ট এক এক খানা হাদিসের বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য কি না তার উপরে নির্ভর করে।

তাই হানাফি মাযহাবের আমলের স্বপক্ষের দলিলগুলো হয়ত বুখারী-মুসলিমে না এসে, তিরমিজি নয়ত আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, মুআ'ত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে বাজ্জার, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, মুসনাদ আল হুমাইদি, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, মুসতাদরাকুল হাকিম, বাইহাকী, তাবরানি, সহিহ ইবনে হিব্বান, আল-জামিউস সগীর, কানজুল উম্মাল এছাড়াও আরো অসংখ্য হাদিসের কিতাবসমূহের কোন কিতাবে এসেছে হাসান বা সহিহ সনদে। যা আপনার অগোচরে আছে, যা আপনার কাছে যিনি তথাকথিত সহিহ দ্বীন পৌঁছে দিচ্ছেন বলে আপনার মনে হচ্ছে তারও অগোচরে আছে। কারণ তার দৌড় বুখারী-মুসলিমের বাহিরে নয়।

তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা! হানাফি মাযহাব বা শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলিসহ অন্য কোন ফিকহি মাযহাবের দিকে আঙুল তোলার আগে জানুন, না জানলে যারা জানেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (২১:৭)

আমি মাযহাব মানি না- বলাটা অহংকার ও দাম্ভিকতার লক্ষণ

যারা মাযহাব মানা ও না মানা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি-

কুরআন-হাদিস, তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা, আরবি ভাষা, উসুল, ফিকহ, উলুমুল হাদিস, উলুমুল কুরআন, বালাগাত, ফাসাহাত, মানতিক, ইলমুল জরহে ওয়াত তাদিল, কিতাবুর রিজাল ইত্যাদি সম্পর্কে যার সম্যক জ্ঞান নেই, আপনাকে বলছিঃ মাযহাব মানতে হবে না আপনাকে। রামাদান মাস যেহেতু হাতের কাছের উদাহরণই দিচ্ছি, রোজা অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেয়া, ইন্সুলিন নেয়া, চোখে ও নাকে ড্রপ দেয়া, রক্ত দেয়া ইত্যাদি মাসয়ালার সমাধান আপনি দিয়ে দিন। কারো সাহায্য নিবেন না, গুগল-ইউটিউবের সাহায্য নিবেন না। কুরআন-হাদিস গবেষণা করে সমাধান দিন। যদি আপনি নিজে সমাধান না দিতে পেরে কোন মোল্লার দারস্থ হন, বা গুগল-ইউটিউবের দারস্থ হন তার মানে আপনি ঐ মোল্লার রায় অনুযায়ী আমল করছেন, গুগল ইউটিউবকে শায়খ মানছেন। অথচ ৪ জন শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ইমামের আমল ও রায় মানতে আপনার আত্মসম্মানে লাগে, যারা সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে শরীয়তের মাসয়ালা-মাসাইলগুলোর সমাধান দিয়ে গেছেন, কিন্তু মসজিদের কামিল/দওরা পাশ মৌলভি ইমাম সাহেবের রায় মানতে আপনার বিবেকে বাধে না। আজব। মসজিদের ইমামের মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) হতে আপনার আপত্তি নেই, কিন্তু অতুলনীয় জ্ঞানসম্পন্ন ৪ মুজতাহিদ ইমামের মুকাল্লিদ হতে আপনার আপত্তি?

এটা কি এক ধরনের মিথ্যা অহমিকা নয়?

চার মাযহাবের চার ইমাম কী ছিলেন, কী ছিল তাদের যোগ্যতা কখনো কি জানার চেষ্টা করেছেন?

প্রিয় ভাইয়েরা. মাযহাব মানা না মানা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে নিজের যোগ্যতা যাচাই করা উচিত।

CamScanner

হাদিস সহিহ হলেই কী আমলযোগ্য? ইমাম আ'লা হজরতের দৃষ্টিকোণ

ইমাম আবু হানিফার রাহ. দিকে সম্পর্কযুক্ত একটি কওল 'হাদীস সহীহ হলেই তা আমার মাযহাব' এর জবাব দিতে গিয়ে ইমাম আ'লা হযরত রাহ. "আল ফাদলুল মাওহাবি ফি মা'না ইযা সাহহাল হাদিস ফাহুয়া মাযহাবি" তে বিস্তারিত লিখেছেন। সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি। উলুমুল হাদিসের পরিভাষায় সহিহ হওয়া এক বিষয়, আর মুজতাহিদ ইমামের কাছে আমলযোগ্য হওয়া অন্য বিষয়। একটা হাদিস সনদ অনুযায়ী দইফ হতে পারে কিন্তু মুজতাহিদ ইমামগণের নিকট তা আমলযোগ্য, এমন অন্য কিছু কারণ আছে যা এই হাদিসকে শক্তিশালী করে এবং আমলযোগ্য করে। উদাহরণস্বরূপ ইমাম তিরমিজি তাঁর একখানা হাদিস এনেছেন, যদি কোন ব্যক্তি ওজর ছাড়াই দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্র করে তবে সে কবিরাহ গোনাহের দরজাসমূহের একটা দরজাতে উপনীত হল। অতঃপর ইমাম তিরমিজি বলছেন, এই (রাবিদের একজন) হানাশ হাদিস বিশারদগণের কাছে দুর্বল বর্ণনাকারী, কিন্তু এই হাদিসের উপরই আমল হচ্ছে।

আবার কখনো এমনও হতে পারে যে, একটি হাদিস সহিহ কিন্তু এর ওপর মুজতাহিদ আমল করছেন না-

১. হাদিসখানা অকাট্য না হওয়ার কারণে অথবা অপর আরেকটি হাদিস এর বিপরীতে এসেছে যা ঐ মুজতাহিদ ইমামের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। অথবা ঐ হাদিসখানা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং উভয় হাদিসের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য দিতে গেলে প্রথমোক্ত হাদিসখানার বাহ্যিক অর্থ অন্যরকম হয়ে যায়।

২. অথবা ঐ হাদিসখানা এবং তার বিপরীতের হাদিসখানা একই দরজার কিন্তু কোনটা নাসিখ কোনটা মানসুখ সেই ইতিহাস জানা যায় না।

CamScanner

৩. অথবা নির্দিষ্ট কোন কারণে ঐ হাদিসখানার বিপরীতে আমল চালু আছে অথবা ঐ হাদিসে এমন কোন বিষয় লুকিয়ে আছে যা মুজতাহিদ ইমাম ছাড়া জানা সম্ভব না।

যেমন ওমর ফারুক রা. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের রা. কথানুযায়ী শরীর নাপাক অবস্থায় তায়াম্মুম করেন নাই যা সহিহ মুসলিমে এসেছে। ঠিক একইভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত "আগুনে রান্না করা কোন কিছু খেলেই ওজু করতে হবে" এই হাদিসানুযায়ী আমল করেন নাই। আমি কি গরম পানি খেলেও ওজু করব? বলেছেন যা তিরমিজির রেওয়ায়াতে এসেছে। ঠিক তেমনি আমির মুওয়াবিয়া রা. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত "প্রিয় নবীজি (ﷺ) এই দুটো রুকন স্পর্শ করেন নাই" এই হাদিসের ওপর আমল করেন নাই, বরং বলেছেন পুরো কাবাই স্পর্শযোগ্য। ঠিক একইভাবে জমহুর সাহাবা "উটের গোশত খেলে ওজু করতে হয়" এই হাদিসের ওপর আমল করেন নাই, যদিও হাদিসখানা সহিহ। ইমাম মালিকের রাহ. কাছে তো মদিনা শরিফের আমল হাদিসের চেয়েও অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল।

যারা "হাদীস সহীহ হলেই তা আমার মাযহাব" একথাটির অপপ্রয়োগ করেন তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা প্রসিদ্ধ মতভেদপূর্ণ মাসায়েলের ক্ষেত্রেই একথাটি ব্যবহার করেন। অথচ এসব ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসগুলো ইমামদের নিকট পৌঁছার পরই তাঁরা বিপরীত মত দিয়েছেন যুক্তিসঙ্গত কারণে।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. এ কথা বলেছেন এর কোন অবিচ্ছিন্ন সহীহ সনদ তারা দেখাতে পারবেন কি? এই কথা দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা যায়, কিংবা তাদের মতলব চরিতার্থ হয় বলেই কি সনদের প্রয়োজন নেই? তবে এ কথাটি ইমাম শাফেয়ী বলেছেন বলে প্রমাণিত আছে।

CamScanner

আর যদি ধরেও নিই যে, এই কথাটি ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেছেন, তবে আমরা বলব 'সহীহ' এ শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। যে পরিভাষা আল্লাহ বা রাসূল (ﷺ) নির্ধারিত পরিভাষা নয়। বরং অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসদের নির্ধারণ করা পরিভাষা। যা পূর্ববর্তী ইমামগণের পরিভাষায় এক অর্থ ছিল। আর পরবর্তী ইমামগণের পরিভাষায় ভিন্ন। অর্থাৎ বর্তমানে সনদের রাবিগণ শক্তিশালী হলে সেটিকেই সহিহ বলা হয়।

আর পূর্ববর্তী ইমামগণের পরিভাষায় সহীহ বলা হতো, যে বিষয়টির আমল উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছে তথা যে বিষয়ের উপর উম্মতের উলামা ফুক্বাহাগণ আমল শুরু করে দিয়েছেন তা'ই সহীহ। যেহেতু ইমাম আবু হানীফা রহ: পূর্ববর্তী ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাঁর 'সহীহ' বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যার উপর আমল উম্মতের মুহাদ্দিস, উলামাগণ জারি রেখেছেন তাই সহীহ। অর্থাৎ যে হাদীসের উপর আমল জারি হয়ে 'সহীহ' বলে স্বীকৃতি পেল, সেটিই তার মাযহাব।

উসূলে ফিকহে ইমাম আ'লা হজরতের রাহ. যুগান্তকারী অবদান

পবিত্র হাদিস শরিফে সহীহ সনদে এসেছে যে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক প্রতি শতাব্দীর শেষে এই উম্মতের জন্য এমন কাউকে প্রেরন করেন, যিনি

CamScanner

তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সংস্কার করেন। (তথ্যসূত্রঃ সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪২৯১)

উপরোক্ত হাদিসখানার বিশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামগণের মধ্যে বিতর্ক নাই বললেই চলে। কাজেই একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ বা দ্বীনের সংস্কারক পাঠান যিনি ইসলামকে সংস্কার করেন এবং দ্বীনকে পূনর্জীবন দান করেন।

তারই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর প্রদেশের বেরেলী শরিফে আগমন করেন চতুর্দশ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমাদ রেজা খান ফাজিলে বেরেলভী রাহ. (ওফাত ১৯২১ খ্রীঃ, ১৩৪০ হিজরী সন)। তাঁর যুগে ওয়াহাবি ও লা-মাযহাবি মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওলী-আউলিয়াগণের পদধুলি ধন্য, সুন্নী ও সুফিগণের ঐতিহ্যমন্ডিত ভারতীয় উপমহাদেশে সৌদি আরব থেকে আমদানীকৃত ওয়াহাবি মতবাদ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। আলা হযরত তাঁর ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের দলিল ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে ওয়াহাবি মতবাদকে খন্ডন করে বাতিল প্রমান করেন। মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াহাবি মতবাদ ততটা বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। তিনি কাদিয়ানী, দাহরিয়া ও শিয়া মতবাদের অসাড়তাও প্রমান করেন। তরিকত ও তাসাউফের মূল শিক্ষাও তিনি মানুষের কাছে তুলে ধরেন।

তবে আমরা শুধুমাত্র তাঁর আকিদাগত সংস্কার নিয়েই বেশি আলোচনা করি যা খুবই দু:খজনক। অথচ জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে এই মহামনীষীর বিচরন ছিল না। তাঁর তাজদীদের ক্ষেত্র অনেক সুদুরপ্রসারী। তেমনি উসুলে ফিকহেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। গত ১২০০ বছরে যে বিষয়ে সমাধান পাওয়া যায়নি তেমন একটি বিষয়ে সমাধান দিয়ে গেছেন আলা হযরত রাহ:। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইলম এক জিনিস আর হিকমত অন্য

জিনিস। ইলম হচ্ছে কোন কিছুর হুকুম সম্পর্কে জানা, আর হিকমত হচ্ছে কোনকিছু সম্পর্কে জেনে শরীয়তে এই জিনিসের অন্তর্ভুক্তির অথবা নিষেধাজ্ঞার পেছনের কারণ (মাকাসিদুস শারীয়াহ) থেকে শুরু করে এই কাজের আদ্যোপান্ত সব জানা এবং সেই জিনিস সমাজে প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা করা। একজন আলীম ততক্ষণ পর্যন্ত মুজাদ্দিদ হতে পারবেন না যতক্ষণ না তিনি হিকমতওয়ালা হবেন।

যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

এবং যাকে প্রজ্ঞা (হিকমত) দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। (আল-কুরআন, ২:২৬৯)

আলা হযরত রাহ. ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলীমে দ্বীন যা তাঁকে চতুর্দশ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদে পরিনত করে। আল্লাহ যাদের দ্বারা তাঁর দ্বীনকে পূনরুজ্জীবিত করেন তাঁদের পাঁচটি স্তর রয়েছে, ১. মুসলিহ ২. হাকিম ৩. মুজতাহিদ ৪. মুজাদ্দিদ এবং ৫. মুফহিম (প্রথমোক্ত এই চার স্তরের সকল গুণ যার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়ে যায় তিনি হয়ে যান মুফহিম) আর আলা হযরত উসুলে ফিকহ (Principles of Islamic Law & Jurisprudence) এবং ফিকহের (Islamic Law & Jurisprudence) ক্ষেত্রে তাহকিক, তাখরিজ, তাত্ত্বিক যেকোন দৃষ্টিকোণ থেকে যেই কাজ করেছেন তা গত ৫-৬ শতাব্দীতে হয় নাই।

আলোচনা করতে গেলে তা বিশাল লম্বা আলোচনা যা একটি ডক্টরেটের থিসিসেও পুরোপুরি আসবে না। তবে উসূলে ফিকহে তাঁর নির্দিষ্ট একটি বিশাল অবদানের কথাই শুধু আজ আলোচনা করব। উসুলে ফিকহে আহকামে খামছা, সাবআহ ও তিসআর একটি ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। এই আহকামে খামছা আসলে কি জিনিস? তা হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের যত হুকুম আহকাম আছে সেগুলোকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরুহ, মোবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে ভাগ

CamScanner

করা। কোন আমলটির হুকুম কি তার শ্রেণী বিভাগগুলোই হচ্ছে এই আহকামে খামছা/সাবআহ/তিসআ। উসুলে ফিকহের বড় বড় কিতাবগুলোতে এই আলোচনা এসেছে। মুসাল্লামুস সুবুতের মত পুরাতন উসূলে ফিকহের কিতাবগুলোতে এগুলোকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা: ১. ওয়াজিব, ২. সুন্নাত বা মানদুব ৩. হারাম ৪. মাকরুহ এবং ৫. মুবাহ। অতঃপর ফুসুলে বাদায়ি ও মিরকাতুল উসুলসহ মধ্যযুগের কিছু কিতাবে আরো দুটো স্তর যোগ করা হয়েছে, ১. ফরজ, ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নাত ৪. মুস্তাহাব ৫. হারাম ৬. মাকরুহ এবং ৭. মুবাহ। অতঃপর উসুলে ফিকহের যখন আরো ডেভলপমেন্ট হলো তখন উসুলবিদগণ ৭ থেকে সেটাকে ৯ তে উন্নীত করেন। জায়েজ কাজগুলোর জন্য পাঁচটি স্তর:

আদেশসূচক	নিষেধসূচক
১. ফরজ	১. হারাম
২. ওয়াজিব	২. মাকরুহে তাহরিমি
৩. সুন্নাতে মুআক্কাদা	*
৪. সুন্নাতে জায়েদা	৩. মাকরুহে তানজিহী
৫. মুস্তাহাব বা নফল।	*
৬. মুবাহ	৪. মুবাহ

ফরজের বিপরীতে হারাম, ওয়াজিবের বিপরীতে মাকরুহে তাহরিমী, সুন্নাতে জায়েদার বিপরীতে মাকরুহে তানজিহি। লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, এই নয় আহকামের মধ্যে আদেশসূচক ও নিষেধসূচক স্তরগুলোর একটি অপরটির বিপরীতে এসেছে। আর মুবাহ আদেশসূচক ও নিষেধসূচকের মধ্যে কমন হুকুম যাতে গুনাহও নেই সওয়াবও নেই। কিন্তু সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফল বা মুস্তাহাবের বিপরীতে নিষেধসূচক কোন হুকুমের স্তর পাওয়া যায় না। ইসলামের ইতিহাস ঘাটলে আপনি এই ৯ স্তরের বেশি হুকুম পাবেন না।

আমি যখন উসুলে ফিকহ ও ফিকহের কিতাবে এই বিষয়টি লক্ষ্য করলাম তখন আমার কাছে এটি খুব হয়রানের বিষয় মনে হলো।

CamScanner

আদেশসূচক কাজের ৫টি স্তরই আছে অথচ এর বিপরীতে নিষেধসূচক কাজের স্তর মাত্র ৩টি যা অপূর্নাঙ্গ একটি বিষয়। কথা যখন হচ্ছে ইসলামি শরীয়ত নিয়ে সেখানে এই অপূর্নতা কীভাবে থাকে!

নতুন পুরাতন কোন কিতাবে এই বিষয়ের একাডেমিক ডিসিপ্লিনারী সমাধান নেই। অবশেষে আমি আলা হযরত আজীমুল বারাকাত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরেলভীর রাহ. বিখ্যাত কিতাব ফাতাওয়ায়ে রেজভিয়ার ভূমিকা বা ১ম খন্ড হাতে নিলাম এবং উনার একটি ছোট রিসালা পেলাম "মাসসুল ইয়াদাইন ফিস সুন্নাতি ওয়াল মুসতাহাব্বি ওয়াল মাকরুহাইন" নামে, সেখানে দেখলাম যে তিনি বলছেন, আহ্কামে শরীয়তকে এই নয়টি মাত্র স্তরে সীমাবদ্ধ করে ফেললে তা পরিপূর্ন হয় না। আদেশসূচক ৫টি স্তরের বিপরীতে নিষেধসূচক ৫টি স্তর আসে না। তাই তিনি আরো দুটো নতুন স্তরের হুকুম নিয়ে আসেন। এই নতুন দুটো স্তরের ধারণা ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন কিতাবাদিতে হয়ত উল্লেখ ছিল অগোছালোভাবে, কিন্তু কোন উসুলে ফিকহের কিতাবে স্পষ্টভাবে আভিধানিক ডিসিপ্লিনারী টার্মিনোলোজি হিসেবে আসে নাই, যা তিনি নিয়ে আসেন এবং বলেন,

আদেশসূচক	নিষেধসূচক
১. ফরজ	১. হারাম
২. ওয়াজিব	২. মাকরুহে তাহরিমি
৩. সুন্নাতে মুআক্কাদা	৩. ইসাআত
৪. সুন্নাতে জায়েদা	৪. মাকরুহে তানজিহী
৫. মুস্তাহাব বা নফল	৫. খেলাফে আওলা
৬. মুবাহ	৬. মুবাহ

সুন্নাতে মুআক্কাদার বিপরীতে ইসাআত (মন্দ কাজ) এবং মুস্তাহাব বা নফলের বিপরীতে খেলাফে আওলা (দুটো ভাল আমলের মধ্যে অধিক পছন্দনীয় কাজের বিপরীত আমল করা) এই দুটো আভিধানিক শ্রেণিবিন্যাস এভাবেই ইসলামি আহকামে শরীয়তের

CamScanner

স্তরগুলোকে আদেশ ও নিষেধসূচক কাজে উভয়পক্ষে সমান করে। এভাবেই আলা হযরত উসুলে ফিকহ শাস্ত্রেও তাঁর তাজদিদ বা সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেন।

(শায়খুল ইসলাম আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদেরি (মা জি আ) র লেকচার অবলম্বনে।

ইতিবাচক হোন, নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ বদলান, নিন্দুকের কথায় কান দিবেন না!

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ আসলাম

(হে নারী!) আপনার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল এবং লোকজন তারপর থেকে আপনার দিকে অন্যদৃষ্টিতে তাকায়। আপনার বয়স ২৫ এর বেশি তাই লোকজন মনে করে আপনার যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে। আপনি একজন বিধবা তাই কেউ মনে করে না যে আপনি আর কারো উপযুক্ত আছেন। আপনার বিয়ে হচ্ছে না, মানুষ মনে করে আপনার কোন সমস্যা আছে নিশ্চয়। আপনি সম্পূর্ণ একা একা একটা সন্তানকে মানুষ করছেন, কেউ এই ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপও করে না।

হযরত রাবেয়া বসরী (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কোন সময় বিয়ে করেননি, এবং তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওলিদের একজন বিবেচনা করা হয়। হযরত মরিয়াম আলাইহাস সালাম কোনসময় বিয়ে করেন নি, অথচ তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ৪ মহিয়সী নারীদের একজন। ঈসা আলাইহিস সালাম বিয়ে করেননি, এভাবেই তাকে বেহেশতে উঠিয়ে নেয়া হয়, তিনি একজন নবী ছিলেন।

হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাম একা একা শিশু নবী হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে অনাবাদি জনমানবহীন মরুভূমিতে বড় করেন, আল্লাহর আদেশে। হযরত আমিনা রা. উনার স্বামী

হারান আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) দুনিয়াতে আসার আগেই। হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা. প্রিয় নবীজির (ﷺ) স্ত্রী হওয়ার আগে প্রথমে ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা, পরে আবার বিবাহের পর বিধবা হন। আগের দুই বিয়ে থেকে দুজন সন্তান ছিলো তাঁর, এবং উনার ৪০ বছর বয়স ছিল যখন তিনি নবী করিম (ﷺ) এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকার রা. কোন সন্তানই ছিলো না, হযরত আসিয়া আলাইহাস সালামের বিবাহ হয়েছিল দুনিয়ার সবচাইতে বড় জালিম শাসক ফিরআউনের সাথে! আমাদের সমাজ মানুষের দিকে হেয় দৃষ্টি নিয়ে তাকায় এবং যা ইচ্ছা তা মন্তব্য করে। অথচ এটা আজব বিষয় যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু মহিয়ান মানব ও মহিয়ষী নারী যারা আমাদের আদর্শ, তারা এরকম ভয়ানক সমস্যাসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে ওঠে এসেছেন।

কখনো হীনমন্যতায় ভোগবেন না, অথবা নিজেকে গুরুত্বহীন মনে করবেন না। মানুষের মতামতের দিকে কান দিবেন না এবং তাদের অর্থহীন কথাগুলো শুনবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দিষ্টকৃত তাকদিরের ওপর ভরসা রাখুন। মাথা উঁচু করে দাড়ান এবং যা কিছু আছে তার জন্য শুকরিয়া আদায় করুন।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

আমরা গত পর্বে কমবেশি আলোচনা করেছি যে, একজন মানুষের অপর মানুষের উপর কি কি অধিকার আছে ও এক মুমিনের অপর মুমিন ভাইয়ের উপর কি কি অধিকার আছে এবং এই পারস্পরিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুমিনের কি কি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা উচিৎ। এই পর্বে আমরা এরকমই আরো কিছু বৈশিষ্ট বা গুণ নিয়ে ইন শা আল্লাহ আলোচনা করব যেগুলো একজন মুসলমানের অবশ্যই থাকা উচিত।

CamScanner

বিদায় হজ্জের ভাষনে হুজুর নবী করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন,

ألا أخبركم بالمؤمن: مَن أمِنه الناس على أموالهم وأنفسهم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده

"আমি কি তোমাদেরকে বলব না কে সেই প্রকৃত মুমিন! প্রকৃত মুমিন সেই যাকে মানুষ তার সম্পদ ও নিজের প্রাণের ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও নিরাপদ মনে করে। প্রকৃত মুসলিম সেই যার হাত ও জিহবা থেকে সকল মানুষ নিরাপদে আছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে এই হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন। আবার বুখারী ও মুসলিম শরিফে এই হাদিসখানা এভাবে এসেছে,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

"প্রকৃত মুসলিম সেই যার হাত ও জিহবা থেকে সকল মুসলমান নিরাপদে আছে।"

হাদিস শরিফের এক জায়গায় প্রকৃত মুমিনকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ ঘোষনা করা হয়েছে। আবার অপর হাদিসে প্রকৃত মুমিনকে সকল মুসলমানের জন্য তার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ ঘোষনা করা হয়েছে। মূলত: দুই হাদিসের উদ্দেশ্য একই আর তা হল সত্যিকারের মুমিন হতে হলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পরিবার-পরিজন ও পরিবারের বাহিরের সকল মানুষ তার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ এবং শান্তিতে থাকতে হবে। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যারা বাহিরের লোকের জন্য খুবই ভাল, সভ্য-ভদ্র ও নিরাপদ। কিন্তু ঘরের সদস্যগণের কাছে সে মূর্ত ত্রাস। কোন সময় সে তার মা-বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, কোন সময় বা তার ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এমন হলে হবে না। বরং ঘরে বাহিরে সব জায়গায় আমাদের সবাইকে শান্তি ও নিরাপত্তার মূর্ত প্রতীক হতে হবে।

আবার উল্টোটাও দেখা যায়, পরিবারের সদস্যদের জন্য আমরা খুবই ভাল এবং মঙ্গলকামী-হিতাকাঙ্খী, কিন্তু বাহিরের মানুষের জন্য আমাদের ভাষা-ব্যবহার হয় খুব রুক্ষ। ঘরে বা অফিসে-কর্মস্থলে যারা আমাদের সাহায্য করে তাদের সাথে আমরা দুর্ব্যবহার করি, অফিস বা কর্মস্থলের নিম্নপদস্থ মানুষজনের সাথে খারাপ ব্যবহার করি, যা খুবই খারাপ বিষয়। ইসলামি আখলাকের সম্পূর্ণ বিপরীত এগুলো। আবার আমাদের অনেকেই আমরা রিক্সাওয়ালা, সি এন জি ওয়ালা এবং দিনমজুর শ্রেণির মানুষের সাথেও দুর্ব্যবহার করি এবং নিজের আমিত্ব তাদের সাথে জাহির করি, যা খুবই অনাকাঙ্খিত এবং গর্হিত ব্যাপার। আমাদেরকে ঘরে বাহিরে শান্তি, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।

হাদিস শরিফে এমনও বলা হয়েছে,

تَبَسُّمُكَ في وَجْه أَخِيكَ لكَ صدقة

"তোমার অপর ভাইয়ের দিকে হেসে তাকালেও তা তোমার জন্য সদকাহ হিসেবে পরিগনিত হয়। (তিরমিজী শরিফ)

গুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঘরে বাহিরে এরকম সুন্দর আখলাক প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দিন। আমিন।

সমালোচনা ও জবাবদিহিতা: ফারুকে আজম হযরত ওমর রা.

কেউ যদি আমার সমালোচনা করে তবে এর মানে এই নয় যে, সে আমার শত্রু এবং অনিষ্টকারী। কেউ যদি আমার প্রাণের কোন রাজনৈতিক দল বা মতবাদের সমালোচনা করে তবে এর মানে এই নয় যে, সে ঐ রাজনৈতিক দল বা মতবাদের শত্রু ও অনিষ্টকারী। সমালোচনা ও গালাগালি দুটো ভিন্ন জিনিস। সমালোচনা পজিটিভ

আর গালাগালি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ একটি জিনিস। আমরা আমাদের মত ও কর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠি। এ থেকে শিক্ষা নিতে চাই না এবং এ থেকে নিজেদেরকে শোধরাতেও চাই না।

গঠনমূলক সমালোচনা শুনতে হবে এবং সেই মোতাবেক আমাদের নিজেদেরকে ও দল বা মতবাদকে শোধরে নিতে হবে। জনগণের সমালোচনা শোনা, জনগণকে জবাবদিহিতা দেয়া গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। একজন মানুষ একটা দলকে ভালবেসে আত্মসমালোচনাও করতে পারে। একে শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাত দিয়ে ঐ লোককে হেনস্থা ও অপমান করে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আসলে সে মুহূর্তেই গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়।

গঠনমূলক সমালোচনা শোনা ও জবাবদিহিতা দেয়া কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক রা. থেকে শিখুন। যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. পরবর্তী খলিফা হিসেবে ওমর ফারুকের রা. নাম প্রস্তাব করেছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কারণ ওমর ফারুক রা. খুব রাগী মানুষ ছিলেন। কিন্তু ওমর ফারুক রা. তাঁর শাসনামলে প্রমান করেছেন যে তিনি ন্যায়ের প্রতীক এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকের রা. সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক ছিল।

সাধারন একজন মুসল্লী জুমআর দিনে খুতবা থামিয়ে দিয়ে জানতে চেয়েছে যে ওমরের রা. এত লম্বা জুব্বা কোথা থেকে আসল! তিনি সুন্দরভাবে সেই জবাব দিয়েছেন এবং একটুও রাগ করেন নি। তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন, রাষ্ট্রীয় সাহায্যবাবদ প্রাপ্ত আমার অংশের কাপড়ও আমার দীর্ঘদেহী পিতাকে দিয়ে দিয়েছি।

হযরত ওমর রা. তাঁর শাসনামলে মোহরের পরিমাণ নির্ধারন করে দিতে চাইলে একজন মহিলা সাহাবী বলে ওঠলেন, হে আমিরুল

CamScanner

মুমিনীন মোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট সাব্যস্ত করার অধিকার আপনার নাই, কারণ কুরআন শরিফে এসেছে,

وَاٰتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক। (সূরা নিসা, সূরা নং ৪, আয়াত নং-২০)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক স্ত্রীদেরকে কিনতার বা অজস্র সম্পদও মোহরানা হিসেবে দেয়া জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত ওমর রা: সাথে সাথে ভুল স্বীকার করে বললেন,

اصابت المراة وأخطأ عمر

ওমর ভুল করেছে এবং মহিলাটি সঠিক।

নিজের ভুল স্বীকার না করার যে সংস্কৃতি আমাদের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় জীবনে চালু আছে তাদের এই ঘটনা থেকে অবশ্যই শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন।

আজকের যুগে পশ্চিমা বিশ্বে ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যান রাষ্ট্রের যে মডেল দেখেন তা হযরত ওমরের রা: ব্রেইন চাইল্ড। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম বৃদ্ধভাতা, এতিমভাতা, পঙ্গুভাতা, বিধবা ভাতা, বিয়ের জন্য সাহায্য, বেকারভাতা এই সিস্টেমগুলো চালু করেন। নিজে কাঁধে করে বহন করে আটার বস্তা সাধারন অভাবগ্রস্থ নাগরিকের ঘরে পৌঁছিয়ে দেন। জেরুজালেম বা বায়তুল মোকাদ্দাসের নেতৃবৃন্দ যখন শর্ত দেন যে, খলিফা ওমর সেখানে নিজে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের চাবি মুসলমানদের হাতে তুলে দেবেন বিনা যুদ্ধে, তখন হযরত ওমর রা. তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে উটের পৃষ্ঠে চড়ে রওয়ানা দেন। যত সময় ভৃত্য উটের রশি টানেন ঠিক তত সময় ওমরও নিচে নেমে তপ্ত বালুকাতে উটের রশি টানেন। মলিন ও তালি দেয়া কাপড়ে এবং ঘর্মাক্ত শরীরে ভৃত্যকে উটের পিঠে বসিয়ে রশি টেনে টেনে যখন জেরুজালেম নগরীতে পৌঁছেন

তখন ন্যায়পরায়নতা ও শাসকের সুশাসনের এক ইতিহাস বিখ্যাত নজীর কায়েম হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যায়ে।

এ থেকে কি আমাদের দেশের সাধারন জনগণ ও বিশেষ করে নেতৃবৃন্দের কিছু শেখার আছে?

"আশিকে রাসূল (ﷺ) আগে হতে হবে নাকি উম্মতে রাসূল (ﷺ) হতে হবে আগে?

অনুচ্ছেদ-১: প্রেক্ষাপট:

আমার এক কলিগ কদিন আগে আলাপকালে আমাকে বলতেছেন, আপনারা সুন্নীরা তো উম্মতে রাসূল হওয়ার আগে আশিকে রাসূল হয়ে যান! উম্মতে রাসূল হওয়ার আগে আশেকে রাসূল হলে হবে না। তার মতে প্রকৃত উম্মতে রাসূল সেই যে হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) অনুসরণ করে। অর্থাৎ আগে অনুসরণ পরে ভালোবাসা। আলোচনার এক পর্যায়ে সে বলল ইত্তেবা বা অনুসরণ-অনুকরণই হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) প্রতি ভালোবাসা, ভালোবাসা আলাদা কিছু নয়।

আমার সেই কলিগটি ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ, লম্বা দাড়ি আছে তার। নামাজ-রোজাসহ বাকি ইবাদাত বন্দেগীতেও সে খুবই পাবন্দ। অফিসে থাকলে তিনি কওমী, আহলে হাদিস ও সালাফি স্কলারদের ওয়াজ খুব বেশি বেশি শোনেন ইউটিউবে।

তো আমি পরে আরেক আলীমে দ্বীন ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, এই উম্মতে রাসূল ও আশিকে রাসূলকে আলাদা করে পরস্পরকে বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে দেয়ার যে কনসেপ্ট একটা চালু হয়েছে এটা আমার এই কলিগের আবিষ্কার নয় বরং এই বিষয়ে মৃত একজন সালাফী (!) স্কলারের একটা বইই আছে। উম্মতে রাসূল আগে না আশেকে রাসূল আগে। তখন আমার মাথায় আসল

যে, এটাই ঠিক হওয়ার কথা। আমার কলিগ ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ, প্রাইভেট কোম্পানীতে জব করে সে এই বিষয়ে কীভাবে জানবে যদি না তা অন্য কোন স্কলারের কাছ থেকে শুনে থাকে।

কেয়ামত খুব সন্নিকটে তাই এসব নতুন নতুন থিওরীতে এখন আর আশ্চর্যান্বিত হই না। মানুষকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ) ও তাঁর রাসূলের আহলে বায়তে আতহার-পরিবার পরিজন, তাঁর আজওয়াজে মোতাহহারাহ, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া আল্লাহগণ সহ পৃথিবীর সকল মানুষ সর্বোপরি সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন থেকে দূরে রাখতে আরো নতুন নতুন আলাদা আলাদা চমকপ্রদ থিওরী আবিষ্কার হবে। ঘৃনার বাজার চাঙ্গা হবে এবং ভালাবাসার বাজার ছোট হয়ে আসবে এবং ছোট করে দেয়ার জন্য এরকম আজীব ও গরীব থিওরী আবিষ্কার হবে এটাই স্বাভাবিক।

অনুচ্ছেদ-২: জবাব:

ইশক-ভালোবাসা কি?: আল্লাহর (ﷻ) প্রতি ভালোবাসা:

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান বা আকিদা অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস। আর সেই ঈমানের মূল হচ্ছে মুহাব্বাত, ইশক বা ভালোবাসা। কার প্রতি ঈমান আনতে হবে আর কাকে ভালোবাসতে হবে? আল্লাহ পাক (ﷻ) এবং তাঁর পেয়ারে হাবিব হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাঁদেরকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহ পাক (ﷻ) পবিত্র কুরআন শরিফে ফরমাচ্ছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ

"হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল

করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর (সূরা নিসা, সূরা নং-৪, আয়াত নং-১৩৬)

উপরোক্ত এই পবিত্র আয়াতখানা ভাল করে লক্ষ করুন। আল্লাহ পাক (ﷻ) এই আয়াতে বিশ্বাসীগণকে আবার বিশ্বাস করতে বলছেন। "হে ইমামনদারগণ তোমরা ঈমান আন"। বিশ্বাসী যে হয়ে গেছে তাকে কেন আবার বিশ্বাস করতে বলা হল? এর অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে একটি কারণ হচ্ছে যে, হে ঈমানদারগণ তোমরা যেভাবে তোমাদের মনগড়া মতবাদে আমি আল্লাহ (ﷻ) ও আমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছ তাতে হবে না। বরং তোমরা আমি আল্লাহ (ﷻ) যেভাবে চাই এবং আমার রাসূল (ﷺ) যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তোমরা ঈমান আনয়ন কর। এই আয়াতে পরিপূর্নভাবে ও সঠিকরুপে ঈমান আনার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

আর ঈমান আনার পর কি বলা হয়েছে? আল্লাহ পাক (ﷻ) বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা হয় প্রবল। (সূরা বাকারা-আয়াত নং-১৬৫)

ঈমান আনার পর আল্লাহ পাককে (ﷻ) ভালোবাসতে হবে। এই ইশক, মুহাব্বাত বা ভালোবাসা জিনিসটা কি? এর সংজ্ঞা কি?

ইমাম কুশাইরী ও শায়খুল আকবার মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি রাহিমাহুমুল্লাহর মত বড় বড় সুফি উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, মুহাব্বাত বা ইশকের কোন নির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ অর্থবহ সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়, কারণ এটা বাহ্যিক কোন কিছু নয় বরং এটি অন্তরের একটি বিশেষ অবস্থা।

যাই হোক মুফাসসিরিনে কেরামগণের অনেকেই অনেকভাবে এই মুহাব্বাত বা ইশককে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। যেগুলোর সারমর্ম অনেকটা এরকমঃ

ميل القلب و رغبة النفس لنيل أحد أو شيء لوجود الكمال فيه

"কারো প্রতি বা কোনকিছুর প্রতি অন্তরের ঝুঁকে যাওয়া বা কারো মধ্যে পরিপূর্নতা দেখে বা কোনকিছুর মধ্যে পরিপূর্নতা দেখে তা পাওয়ার আকাঙ্খা অন্তরে পোষণ করা। ইশক-মুহাব্বাতকে আমরা যত সুন্দর সংজ্ঞায়ই সংজ্ঞায়িত করি না কেন তা পরিপূর্ণ অর্থবহ হবে না, কারণ মুহাব্বাত বা ইশক কোন বাহ্যিক বিষয় নয় বরং তা অন্তরের একটা বিশেষ অবস্থার নাম।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে। (সূরা মায়েদা-আয়াত নং-৫৪)

এই আয়াত থেকেও আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, আল্লাহ পাকের (ﷻ) উপর শুধু ঈমান আনলেই হবে না বরং তাঁকে ভালোবাসতে হবে, ভালোবাসা হচ্ছে ঈমানের দাবি। ভালোবাসাহীন জাতি আল্লাহ পাকের কাছে প্রত্যাখ্যাত।

তবে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ের সবচাইতে প্রাসঙ্গিক যে আয়াতখানা পবিত্র কুরআন শরিফে এসেছে তা হলো,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(হে রাসূল আপনি) বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে

ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

(হে রাসূল আপনি) বলুন! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালোবাসেন না। (সূরা-আলে ইমরান, আয়াত নং-৩১-৩২)

উপরোক্ত আয়াত দুখানা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁকে ভালোবাসতে বলেছেন, কিন্তু অনুসরণ-অনুকরণ করতে বলেছেন তাঁর প্রিয় হাবিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ পাককে (ﷻ) আর তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অনুসরণ করতে তাঁর প্রিয় হাবিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে। দুখানা আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা আরো বুঝতে পারি যে ইত্বায়াত বা আনুগত্য আল্লাহ (ﷻ) ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ) উভয়েরই করতে হবে, কিন্তু ইত্তেবা বা অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর প্রিয় হাবিব রাসূলুল্লাহর (ﷺ)।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহর (ﷻ) প্রতি বান্দার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তাঁর প্রিয় রাসূলের (ﷺ) অনুসরণ।

অনুচ্ছেদ-৩: মূল প্রশ্নের জবাব:

হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) প্রতি ভালোবাসা ও ইশক:

গত পর্বে আমরা ঈমানের প্রধান ভিত্তি আল্লাহ পাকের (ﷻ) উপর বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও ইশক নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পর্বে আসুন আমরা দেখি যে, আল্লাহ পাক (ﷻ) তাঁর প্রিয়

CamScanner

হাবিব রাসূলে মোস্তফার (ﷺ) ভালোবাসার ব্যাপারে কি বলেছেন পবিত্র কুরআনে,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"(হে রাসূল আপনি) বলুন! তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (সূরা তওবা: সূরা নং-৯, আয়াত নং-২৪)

এই আয়াত অনুযায়ী পৃথিবীর যতকিছুকে আমরা ভালোবাসি সবকিছু থেকে আল্লাহ পাক (ﷻ) ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ) আমাদের জন্য যদি অধিক প্রিয় না হন, তবে আমাদের ঈমান ও আমল আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই আল্লাহ পাককে (ﷻ) যেভাবে ভালোবাসতে হবে তেমনি হুজুর নবী করিম (ﷺ) কেও আমাদের ভালোবাসতে হবে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ করেন,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ

"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের প্রাণের অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" (সূরা আহজাব-৩৩: আয়াত নং-০৬)

CamScanner

এই আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন যে, দুনিয়ার সকল মানুষ ও সকল সহায় সম্পদ থেকে রাসূলে কারিম (ﷺ) অধিক প্রিয় না হলে আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে না, আমরা মুমিনে হাক্বিকী হতে পারব না বরং আমাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় রাসূল (ﷺ) কে জানতে হবে।

যেমনটা বুখারী শরিফ ও মুসলিম শরিফে এসেছে,

والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين

হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন, "সেই মহান স্বত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেহ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তাদের কাছে তাদের নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হব!" (সহিহ বুখারী, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং-৮: রাসূল কে ভালোবাসা ইমানের অংশ, হাদিস নং-১৩-১৪)

অপক এক বর্ণনায় এই হাদিস খানার বাস্তব নমুনা হিসেবে এসেছে যে,

أن عمر ، رضي الله عنه ، قال : يا رسول الله ، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال :" لا يا عمر ، حتى أكون أحب إليك من نفسك" . فقال : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي . فقال :" الآن يا عمر. ٥

"একদিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম আপনি আমার নিকট সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় শুধু আমার নিজের প্রাণ ব্যতিত। হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে ওমর না। যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হব ততক্ষণ পর্যন্ত (তুমি ঈমানদার হতে পারবে না) তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু

তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আপনি আমার নিকট সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয় এমনকি আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে ওমর! এখন (তোমার ঈমান পরিপূর্ন হয়েছে)। (সহীহ বুখারী, শপথ ও মানত অধ্যায়, হাদিস নং-৬১৭৮)

প্রিয় ভাই-বোনেরা! যাদের সন্তান আছে তারা একটু চোখ দুটো বন্ধ করুন আর একদিকে আপনি আপনার সন্তানের চেহারাখানা মনে করুন এবং আপনি আপনার সন্তানকে কতটুকু ভালোবাসেন তা একটি কাল্পনিক পাল্লায় রাখুন, আর অপর দিকে আল্লাহ পাক (ﷻ) ও তাঁর প্রিয় রাসূলের (ﷺ) জন্য আপনার অন্তরে যতটুকু ভালোবাসা আছে তা আরেক পাল্লায় রাখুন এবং বলুন কোন পাল্লা ভারী হয়!

আমরা মুখে মুখে আল্লাহ পাক (ﷻ) ও তাঁর প্রিয় হাবিবের (ﷺ) ভালোবাসার বুলি আওড়াই। কিন্তু প্র্যাকটিকালী যখন আমাদের সেই ভালোবাসার পরীক্ষা দেয়ার সময় আসে তখন আমাদের অনেক বড় বড় কথিত আশেকে রাসূলের ভালোবাসাও টালমাটাল হয়ে যায়।

কল্পনা করুন যে, একটা নৌকা দিয়ে আপনি কোথাও যাচ্ছেন আপনার স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা, ভাইবোনকে সাথে নিয়ে। ঝড় আসলো, নৌকা ডুবে যাচ্ছে আর আপনার হাতের কাছে আছে একটা ছোট কাঠের টুকরো। সবাইকে আপনি বাঁচাতে পারবেন না। যে কোন একজনকে আপনি ঐ ছোট কাঠের টুকরোটিতে তুলে দিতে পারবেন। কাকে তুলে দেবেন? ঐখানে উপস্থিত আপনার বাবা-মা, ভাইবোন, স্ত্রী সন্তান কাকে বাঁচাবেন? নাকি নিজেকে বাঁচাবেন?

ঐ মুহূর্তে আপনার অন্তরে নিজের পরিবার-পরিজন ও আপন রক্তের জন্য যতটুকু ভালোবাসার উদয় হবে, তারচেয়েও বেশি ভালোবাসা আপনার অন্তরে সদা-সর্বদা আল্লাহ পাক (ﷻ) ও তাঁর প্রিয় রাসূলের (ﷺ) জন্য থাকতে হবে।

CamScanner

ঐ মুহূর্তে আপনার নিজের প্রাণ বাঁচানোর প্রতি যতটুকু টান আপনার হৃদয়ে অনুভব করবেন, তারচেয়েও বেশি ভালোবাসা আপনার হৃদয়ে সদা-সর্বদা আল্লাহ পাক (ﷻ) ও তাঁর প্রিয় রাসূলের (ﷺ) জন্য থাকতে হবে। তখনই কেবল আপনার ভালোবাসা আরেক ধাপ উপরে ওঠে ভালোবাসা থেকে ইশকে পরিনত হয়ে যাবে। তবেই কেবল আপনি সত্যিকারের আশেকে রাসূল ইনানদার হতে পারবেন। আর না হয় সবকিছু ফাঁকাবুলি।

প্রিয় পাঠক উপরে উদ্ধৃত কুরআন শরিফের আয়াতসমূহ ও হাদিসসমূহের আলোচনার আলোকে আশিকে রাসূল (ﷺ) হওয়ার প্রয়োজন আছে কি নেই? আমি বলি, যে আশিকে রাসূল (ﷺ) নয় সে আসলে ঈমানদারই নয়।

অনুচ্ছেদ-৪: জবাব

এই থিওরীর উদ্দেশ্য ও তার প্রতিকার:

যদি মূল কথা বলতে হয় তবে প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবেই উম্মতে রাসূল (ﷺ)। কেউ দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়ে হুজুর পাকের (ﷺ) উম্মতে ইজাবার অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন, আবার কেউবা হেদায়াতের দাওয়াতকে অস্বীকার করে শুধু উম্মতে দাওয়াহ হিসেবেই রয়ে গেছেন। কিন্তু আরব-আজম সকল মানুষ জন্মসূত্রেই প্রিয় নবীর (ﷺ) উম্মতে দাওয়াহ।

কিন্তু উম্মতে রাসূল (ﷺ) বলতে যদি বুঝানো হয় নবীজির খাঁটি উম্মত যিনি নবীজির আখলাক ও আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করেন শুধু, তবে আমি বলব এসব কথা আসলে ফিতনাহ। মানুষকে নবীজির (ﷺ) ভালোবাসা ও ইশক থেকে দূরে সরানোর জন্য এই থিওরির উৎপত্তি। আশেকে রাসূল (ﷺ) ও উম্মতে রাসূল (ﷺ) আলাদা করার অধিকার কোন মৌলভীকে কে দিয়েছে? যে আশেকে রাসূল (ﷺ) নয় সে কোনদিনও খাঁটি উম্মতে রাসূল (ﷺ) হতে পারে

না। আগের পর্বের আয়াতসমূহ ও হাদিসসমূহের আলোচনার পরে এ কথা আর বলার প্রয়াস রাখে না যে, খাঁটি উম্মতে রাসূল (ﷺ) হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হচ্ছে আশেকে রাসূল (ﷺ) হওয়া। কারণ আশেকে রাসূল (ﷺ) ছাড়া কারো ঈমানই পরিপূর্ন নয়।

এখন আসুন যারা এই আশেকে রাসূল (ﷺ) ও উম্মতে রাসূল (ﷺ) আলাদা আলাদা করার চেষ্টা করেছেন তারা কিসের ভিত্তিতে তা করেছেন সেটা জানি। আমাদের সমাজে যারা আশেকে রাসূল বা সুন্নী দাবি করেন তাদের অনেকের মধ্যে হুজুর রাসূলে পাকের (ﷺ) শরীয়তের অনুসরণ ও অনুকরনে অনেক কমতি আছে। এজন্য তারা বলেন যে আশেকে রাসূল (ﷺ) হওয়ার আগে উম্মতে রাসূল (ﷺ) হন। এই কথার অর্থ এরকম যে, নবীজিকে ভালোবাসার আগে তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করুন। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক! গত পর্বে আমাদের আলোচিত আয়াতসমূহ ও হাদিস সমূহ কি তাই বলে?

হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ ؛ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর নবী করিম (ﷺ) বলেন, তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সে ঈমানের স্বাদ অন্তরে অনুভব করবে। ১. যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার কাছে সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া, ২. একজনকে ভালোবাসলে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসলে এবং ৩. ঈমান আনার পর কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করা যেমনটা আগুনে ঝাপ দেয়াকে কেউ অপছন্দ করে। (সহিহ বুখারী, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং-৯:ইমানের স্বাদ, হাদিস নং-১৫)

"হুজুর পাক (ﷺ) কে ভালোবাসার খুব একটা প্রয়োজন নাই বরং তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণই বেশি জরুরী" এটা বলা যেমন কথা, তেমনি আল্লাহ পাককে ভালোবাসার খুব একটা প্রয়োজন নেই বরং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করাই বেশি জরুরী এটা বলা একই কথা।

কারণ আল্লাহ পাকের উপরে ঈমান ও তাঁর প্রিয় হাবিবের উপরে ঈমান আনাকে আল্লাহ পাক আলাদা করেননি কোথাও। আল্লাহ পাকের প্রতি ভালাবাসাকে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে কোথাও আলাদা করেন নি। গত দুই পর্বের আলোচনা থেকে তা প্রতীয়মান।

আসলে এই উম্মতে রাসূল ও আশেকে রাসূল দুটো আলাদা আলাদা কনসেপ্ট দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে নবীজির ভালোবাসা থেকে দূরে সড়ানো। এটা এমন একটা ষড়যন্ত্র যার মধ্যে প্রচুর মুসলমান পতিত হচ্ছেন। তবে এই ষড়যন্ত্র নতুন নয়। নবীজির অনুকরণ ও অনুসরণই মূলকথা, ভালোবাসা, সম্মান এবং আদব আসল জিনিস নয়, এই কনসেপ্ট ইসলামের সেই প্রথম যুগ থেকেই একটা দলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। হাদিস শরিফে যাদেরকে খারেজী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের প্রচুর আলামতও উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে তাদেরকে শরীয়ত সুন্নাতে পরিপূর্ণ পাবন্দ হবে বলা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে বেয়াদবে রাসূল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভালোবাসার সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভালোবাসা ও অনুসরণ-অনুকরণ এক জিনিস নয়। ভালোবাসা হচ্ছে সম্পূর্ণরুপে অন্তরের একটা অবস্থার নাম। আর অনুসরণ-অনুকরণ হচ্ছে বাহ্যিক আমলের নাম। বরং ভালাবাসা হচ্ছে বৃক্ষ এবং অনুসরণ-অনুকরণ হচ্ছে তার ফল। বৃক্ষ লাগালে পরেই ফল আসে তার আগে নয়। তাই আগে নবীজির ভালোবাসা ও পরে অনুসরণ-অনুকরণ অবশ্যই করতে হবে।

CamScanner

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর ভালোবাসা যদি আমাদের পেতে হয় তবে হুজুর নবীয়ে পাকের (ﷺ) ইত্তেবা ও অনুসরণ-অনুকরণ ছাড়া কোন রাস্তা নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" (সূরা আহযাব- আয়াত নং-২১)

হুজুর নবী করিম (ﷺ) বলেন,

فمن رغب عن سنتي فليس مني

"যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে যায় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

صلوا كما رأيتموني أصلي

নবী করিম (ﷺ) আরো বলেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ সেভাবে নামাজ পড়।" (সহীহ বুখারী)

خذوا عني مناسككم

"আমার কাছ থেকে হজ্জ ও ওমরার হুকুম আহকাম গ্রহণ কর।" (বায়হাকী ফি সুনানিল কুবরা)

কাজেই গত পর্বসমূহ ও এই পর্বের আলোচনার আলোকে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, হুজুর নবীয়ে পাক (ﷺ) কে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে এবং সেই সাথে উনার যাবতীয় হুকুম-আহকাম মানার শতভাগ চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে, তবেই আমরা নবীজির খাঁটি আশিক ও উম্মত হতে পারব।

CamScanner

হুজুর নবী করিমের (ﷺ) পবিত্র কবর শরিফকে আমরা রওজা বলি কেন?

অনেকেই এই বিষয়টি জানতে চান যে, আমরা হুজুর নবী করিমের (ﷺ) পবিত্র কবর শরিফকে রওজা বলি কেন?

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত, হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, নিশ্চয়ই কবর হচ্ছে জান্নাতের বাগানসমূহের (রিয়াজ) একটি বাগান (রওজাহ) অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।

(তথ্যসূত্র: অনেক লম্বা হাদিসের খন্ডাংশ, সুনান তিরমিজী-হাদিস নং ২৪৬০, তাবরানি ফিল আওছাত, হাদিস নং-৮৬১৩)

এজন্য আমরা হুজুর পাকের (ﷺ) পবিত্র কবর শরিফকে রওজাহ বলি।

কোন মুসলমান কি এটা কখনো কল্পনা করতে পারে যে, হুজুর পাকের (ﷺ) পবিত্র কবর শরিফ জাহান্নামের গর্ত? নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। কখনই নয়। কাজেই উনার পবিত্র কবর শরিফ জান্নাতের বাগানসমূহের (রিয়াজ) একটি বাগান (রওজাহ)।

আর সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরিফে এসেছে, ما بين بيتي و منبري روضة من الرياض الجنة

হুজুর পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝখান হচ্ছে জান্নাতের বাগানসমূহের (রিয়াজ) একটি বাগান (রওজাহ)। (মুসলিম, হাদিস নং -১৩৯১, বুখারী, হাদিস নং-১১৯৬)

বাগান আরবি হচ্ছে রওজাহ। আমরা জানি যে হুজুর পাক (ﷺ) কে তাঁর ঘরসমূহের একটি ঘর মা আয়েশা সিদ্দীকার রা. ঘরে দাফন

করা হয়েছে যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। তো নিঃসন্দেহে তাঁর পবিত্র কবর শরিফ রিয়াজুল জান্নাতে আছে।

আমল ও মুহাব্বাত এক নয়

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, হুজুর নবী করিমের (ﷺ) জমানায় এক ব্যক্তি ছিলেন যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ আর লকব ছিল হিমার।

এ লোকটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হাসাতেন। হুজুর নবী করিম (ﷺ) শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় আনা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলে ওঠল, "হে আল্লাহ! তার উপর লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল।"

তখন হুজুর নবী করিম (ﷺ) বললেন, "তোমরা তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম আমি তাকে জানি যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।"

(সহিহ বুখারী, অধ্যায়: শরীয়তের শাস্তি, পরিচ্ছেদ: ২৮২৫, শরাব পানকারীকে লানত করা মাকরুহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়, হাদিস নং-৬৩২৩)

লক্ষ্য করুন, এই সাহাবীর আমল কি ছিল? কি ছিল তাঁর আমল? তিনি শুধু হুজুর নবী করিম (ﷺ) কে হাসাতেন।

দুনিয়ার সকল মানুষ যখন তাঁদের অভাব অভিযোগ নিয়ে আসতেন হুজুর নবী করিমের (ﷺ) কাছে, নবীজি (ﷺ) পেরেশান থাকতেন তাঁদের অভাব অভিযোগ মেটাতে মেটাতে, তখন এই সাহাবী তাঁকে হাসাতেন কৌতুক বলে। এই ছিল তাঁর আমল। তাঁর কোন নিজস্ব চাহিদা ছিল না।

CamScanner

হুজুর নবী করিম (ﷺ) থেকে তাঁর চাহিদা বা চাওয়া পাওয়া ছিল একটাই আর তা হল আল্লাহর রাসূল হাবিবে কিবরিয়া (ﷺ) কে একটু হাসানো। তাঁর মনকে ভারমুক্ত রাখা, একটু বিনোদন দিয়ে প্রফুল্ল রাখা। আমল বলতে এতটুকুই।

মদ পান করার অপরাধে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি তাঁকে অনেকবার দিয়েছেন নবীজি (ﷺ)। কিন্তু যখনই কেউ তাঁকে লানত করলেন হুজুর নবী করিম (ﷺ) বললেন, সাবধান কেউ তাকে লানত করবে না। আল্লাহর কসম আমি তাকে জানি যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

অপর এক হাদিসে এসেছে যে, যখন ঐ সাহাবী শুনতে পেলেন যে, এতবার মদপান করার অপরাধে শাস্তি দেয়ার পরও যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর সম্পর্কে স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন, তখন ঐ সাহাবী বললেন, খোদার কসম! আজকের পর থেকে আর কোনদিন আমি মদপান করব না। ঐ সাহাবী আর জীবনে কোনদিন মদপান করেননি।

কাজেই মুহাব্বাত আর আমল এক নয়। মুহাব্বাত হচ্ছে ঈমানের শিকড় আর আমল হচ্ছে ঈমানের ফল।

শিকড় যদি শক্ত থাকে তবে ফল ঠিকই আসবে একদিন না একদিন। আর শিকড় যদি ঠিক না থাকে তবে কোনদিনই ফল আশা করা যায় না।

আল্লাহর জিকির ও ইস্তিগফারের ফজিলত

মূল: তাফসিরে কুরতুবি

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রাহ. যখন তাঁর শেষ জীবনে সফরে সময় দিচ্ছিলেন তখনকার কথা।

CamScanner

একদা এক শহরে তিনি থামলেন। ইশার নামাজ শেষে ঐ রাতটি তিনি মসজিদে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিরহংকারীতার কারণে তিনি কাউকে পরিচয় দেবেন না বলে স্থির করলেন। কারণ পরিচয় দিলে অনেকেই হয়ত তাঁর মেহমানদারী করার জন্য পিড়াপিড়ি করবে।

কিন্তু এই পরিচয় না দেয়ার কারণেই মসজিদের খাদিম তাঁকে মসজিদে রাত্রিযাপন করতে অনুমতি দিল না। এক রুটি কারিগরের এই দৃশ্য দেখে মায়া লেগে গেল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রতি। তিনি তাঁর রুটির কারখানার পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. কে রাত্রিযাপন করতে দিলেন। রাতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ঐ রুটি কারিগরের কাজকর্ম পর্যবেক্ষন করতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, ঐ রুটি কারিগর রুটির খামির বানানো, রুটি বেলা এবং উনুনে রুটি তা দেয়া ও উনুন থেকে রুটি নামানোর পুরো সময়টিতে আল্লাহর জিকির এবং ইস্তেগফার করে কাটালেন।

পরদিন ভোরে ঐ রুটি কারিগরকে তিনি রাতের বেলার অবিরাম জিকির ও ইস্তেগফার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ঐ রুটি কারিগর বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! এটা আমার প্রকৃতিগত একটা অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এই অবিরাম জিকির ও ইস্তেগফারের কোন প্রতিফল কি কখনো প্রত্যক্ষ করেছেন?"

রুটি কারিগর বললেন, "আমি হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোআ করেছি, আর এমন কোন দোআ নেই যা আল্লাহ কবুল করেন নি, একখানা দোআ ব্যতীত।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. জিজ্ঞেস করলেন, "কবুল না হওয়া সেই একটি দোআ কি?"

CamScanner

কুটি কারিগর বললেন, আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের রাহ. সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করেছি যা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, "হে ভাই! আমিই সেই আহমদ ইবনে হাম্বল। আপনার দোআ কবুল হয়েছে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যই আমাকে এই শহরে এনেছেন।"

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তাঁর জিকির ও ইস্তেগফারের মধ্যে জীবন কাটানোর তওফিক দান করেন। আমিন।

সফল-সুখী দাম্পত্য জীবনের মূল রহস্য

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ আসলাম

শায়খ হাবিব ওমর বিন হাফিজ (ইয়েমেনের বিখ্যাত আলীমে দ্বীন ও সুফি মুর্শিদ) তাঁর আম্মা ও আব্বাজানের বিয়ের দিনের কথা স্মরন করে কাঁদছিলেন, তিনি বলছিলেন, আমার আব্বাজান ভয়াবহ দারিদ্র্য দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন, এমন অবস্থা ছিল যে, তিনি বিয়ের পর আমার আম্মাজানকে একটি চামচ ও কিছু হাড়ি-পাতিল ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেননি। হযরত ফাতেমার (আলাইহাস সালাম) যখন বিয়ে হয়েছিল মাওলা আলীর (আলাইহিস সালাম) সাথে, তখন তাঁকে একটি চামড়ার বালিশ দেয়া হয়েছিল যা ছিল খেজুর গাছের আঁশে পরিপূর্ণ। তাঁর ঘরে ছিল একটি পানির মশক, কিছু হাড়ি-পাতিল, খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি একটি অতি সাধারণ বিছানা এবং ভেড়ার চামড়ার তৈরি একটি বিছানার চাদর যার উপর তিনি নিদ্রা যেতেন। তারপরও তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সফল বৈবাহিক জীবন কাটিয়েছেন, তিনি জান্নাতের সর্দার সন্তানদের মা হয়েছেন।

অজস্র বৈবাহিক উপহার, ব্যংকে জমানো কোটি টাকা, আলোকোজ্জ্বল বিয়ের হল, ডি জে পার্টি, ভাঙরা, একমাত্র ইউনিক ডিজাইনের বিয়ের পোশাক, সুপার কার, মুআস, সুআস, সেলিব্রেটি ফটোগ্রাফার, স্টুডিও কিচেনসহ বিশাল বাড়ি এবং বিদেশে হানিমুন, কোন কিছুই সত্যিকারের সুখ-শান্তি এবং দীর্ঘ বৈবাহিক জীবন এনে দিতে পারে না।

তাক্বওয়া-পরহেজগারী, ত্যাগ, সমঝোতা এবং সত্যিকারভাবে একে অপরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তাঁর রাসূলের (ﷺ) ওয়াস্তে ভালোবাসাই হচ্ছে একমাত্র উপায় যা সত্যিকারের সুখ-শান্তি বয়ে আনার মাধ্যম। এগুলোই হচ্ছে সত্যিকারের অবলম্বন যা একটি দম্পতিকে খুবই কষ্টের সময় এবং সুখের সময় কাটাতে সাহায্য করে। এর প্রমান কি? হযরত সায়্যিদাহ ফাতেমাতুজ জাহরার (আলাইহাস সালাম) বিয়ে ও ঘর ছিল খুবই সাধারন। কিন্তু আজ ১৪০০ বছর পরও আমরা তাঁর মত সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করি এবং তাঁর সন্তানদের আদর্শে গড়া সন্তান কামনা করি।

কতগুলো খুব চটকদারী ডায়লগ ও আমার জবাব

"আমার পরিচয় আমি শুধুই মুসলিম এছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই।" "আমি শুধু কুরআন এবং সহিহ হাদিস মানি আর কিছু মানি না।" এই ডায়লগ দুটো খুবই চটকদার, মনলোভানো, শুনতে খুবই ভাল লাগে। "আমি শুধুই মুসলিম, আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা মুসলিম", কথাটির মধ্যে মুসলিম জাতির ঐক্য উপচে পড়ে। "আমি কুরআন ও সহিহ হাদিস ছাড়া আর কিছুই মানি না" এই ডায়লগটি থেকে যেন বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা উপচে উপচে পড়ছে, শুনলেই এমন একটা ফিলিংস হয়। কিন্তু ডায়লগ দুটোই বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্তঃসাড়শূন্য খোকলা এবং ঈমান চুরির একটা অন্যতম মাধ্যম। ইসলামের মূলধারা থেকে মানুষকে দূরে সড়ানোর

অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই ডায়লগ দুটো। প্রিয় পাঠক একটু ব্যাখ্যা করে বলি,

ডায়লগগুলোর ব্যবচ্ছেদ: আমাদের নিশ্চিতভাবেই একমাত্র পরিচয় শুধুই মুসলিম হওয়া উচিৎ ছিল। কুরআন শরিফে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে,

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

"তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও।" (সূরা হাজ্জ, ২২:৭৮)

নিঃসন্দেহে আমাদের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিৎ ছিল আমরা মুসলিম। আমরাও সেই একমাত্র পরিচয়েরই পক্ষে, আমরা নিঃসন্দেহে মুসলিম। কিন্তু সেই একমাত্র পরিচয়ের সাথে আরো একটি পরিচয় সংযোজন করতে আমরা মূলধারার মুসলমানগণ বাধ্য হয়েছি। তার প্রেক্ষাপট জানতে আমাদেরকে ইসলামের ইতিহাস জানতে হবে। হুজুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জমানা থেকে হযরত ওসমানের রা. খেলাফাত পর্যন্ত আমাদের সবার একমাত্র পরিচয় ছিল আমরা মুসলমান। মাওলা আলীর খেলাফাতের সময়ে ইমাম আলী (আ:) এবং আমির মুয়াবিয়ার রা. মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হলো। সিফফিনের সেই যুদ্ধে ইমাম আলীর আ: সৈন্যবাহিনীর একটা দল তাঁর দল ত্যাগ করে আলাদা হয়ে গেল মুআবিয়ার রা: সাথে সন্ধি করার প্রতিবাদে। ইসলামের ঐ প্রথম ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট দলটি দলত্যাগকারী বা খারেজী হারুরিয়াহ নামে পরিচিত হয়ে গেল।

খারেজীরা ওঠা বসা চলাফেরায় বাহ্যিক চালচলনে খাঁটি মুসলমানের চেয়েও খাঁটি লাগত তাদেরকে। নামাজ বেশি বেশি, রোজা বেশি বেশি, ইবাদাত বেশি, নবীজির (ﷺ) সুন্নাতের অনুসরণ বেশি বেশি। তারাও নিজেদেরকে মুসলমানই দাবি করত। কিন্তু তারা মাওলা আলী (আ:) এবং আমির মুআবিয়া রা. উভয়কেই কাফির বলত।

তারা বলত ان الحكم الا لله আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া আর কারো ফায়সালা নেই (আল- কুরআন)। মাওলা আলী আঃ এদের ব্যপারে বলেছেন, كلمة حق اريد بها باطل "সত্য কথা দ্বারা উদ্দেশ্য মিথ্যা"। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো ফায়সালা মানা যাবে না কথাটা কুরআনের অংশ নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু এই আয়াতের অপব্যবহার করে তারা আমি আলীর বৈধ খেলাফাত থেকে বের হয়ে আলাদা দল করে ইসলামকে বিভক্ত করে দিচ্ছে।

প্রিয় পাঠক দেখুন তো উপরের প্রথমে উদ্ধৃত দুটো ডায়লগের সাথে খারেজীদের উক্তি ان الحكم الا لله "আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া আর কারো ফায়সালা নেই" এর কোন সাদৃশ্য পান কি না? বর্তমানে তারা বলেন আমরা শুধু কুরআন এবং সহিহ হাদিস মানি আর কিছু মানি না আর তাদের পূর্বসুরীরা বলত: ان الحكم الا لله আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া আর কারো ফায়সালা নেই। দুটো কথারই উদ্দেশ্য মিথ্যা। আগে তারা ইমাম আলীর দলত্যাগ করতে চেয়েছিল। বর্তমানেও তারা এই ডায়লগের মাধ্যমে সাহাবাগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, নবীজির (ﷺ) আহলে বায়ত, মুজতাহিদ ইমামগণ, আউলিয়া আল্লাহ দের যে কুরআন হাদিসের দেয়া সঠিক ব্যাখ্যা তা থেকে বের হওয়া উদ্দেশ্য। কুরআন হাদিস আমরাও মানি কিন্তু তা আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী নয়, আমাদের অপরিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিবেচনা করে নয় বরং সাহাবাগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, নবীজির (ﷺ) আহলে বায়ত, মুজতাহিদ ইমামগণ, আউলিয়া আল্লাহ দের প্রদত্ত সঠিক ব্যাখ্যা অনুসারে।

খারেজীদের সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে অসংখ্য হাদিস এসেছে। তাদের প্রথম আলামত, তারা ছিল বেয়াদবে রিসালাত। তারা রাসূলের শানে বেয়াদবি করেছিল, নবীজির (ﷺ) আহলে বায়ত মাওলা আলী এবং তাঁর সাহাবী আমির মুআবিয়ার রা: শানে বেয়াদবি করেছিল।

CamScanner

পরবর্তীতে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর কুফার মুনাফিক যারা ইমাম হেসাইন রা. কে দাওয়াত দিয়েছিল কুফায় যেতে, কিন্তু বেইমানি করে তারা ইয়াজিদের হাতে বায়আত হলো, তাদেরই একটি অংশের মধ্যে এক পর্যায়ে অনুশোচনা আসল যে, হায় আমরা কেন ইমাম হোসাইনকে দুনিয়াতে থাকতে সাহায্য করলাম না? কেন আমরা তাঁকে আমাদেরই নিকটে কারবালা ময়দানে চোখের সামনে শহীদ হতে দিলাম? হায় হায় আমরা কি করলাম? তারা পরে আহলে বায়তের শানে অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি করে মিথ্যা আরো মনগড়া অনেক কাহিনী রচনা করে মেইনস্ট্রিম মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে আরেকটা দল বানাল যাদের নাম হলো শিয়া। তারা প্রথম তিন খলিফাকে অবৈধ ঘোষনা করল, সাহাবাগণকে মুরতাদ বলল, মা আয়েশা, হাফসার রা: নামে যা ইচ্ছা তা বলতে লাগল।

ইসলামের মধ্যে একের অধিক দল হওয়াটা অবধারিতই ছিল কারণ হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ইহুদীরা ৭১ ভাগে ভাগ হয়েছিল ও নাসারারা ৭২ ভাগে ভাগ হয়। আর এই উম্মত ৭৩ ভাগে ভাগ হবে। প্রত্যেক দল জাহান্নামে যাবে একটি ব্যতীত। প্রশ্ন করা হলো ঐ একটি দল কারা?" হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাব দিলেন, ঐ দলটি হচ্ছে আমার ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি তার সদৃশ যারা থাকবে।" (তিরমিজি, হাদিস নং-২৬৪০, আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৫৯৬, মুসনাদ আহমদ, ২/৩৩২)

এই খারেজি ও শিয়া দুটি ছোট গ্রুপের বাহিরে যারা ছিলেন মেইনস্ট্রিম মুসলিম তাবিয়িনগণ যারা সংখ্যায় ছিলেন অসংখ্য তারা তখন নিজেদেরকে একটা লেবেল দিতে বাধ্য হলেন। কারণ ঐ দুটো দলও নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবি করত। হক্বপন্থী মূলধারার মুসলমানগণ নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এর অনুসারী সুন্নী মুসলিম হিসেবে নামকরণ করলেন।

এখন আসুন এই নাম কেন দেয়া হলো? কারণ হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার পরে তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে

যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং সুন্নাতু রাসূলিহি (রাসূলের সুন্নাত)। (মুআত্তা ইমাম মালিক)

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, এখানে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে, হাদিস নয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের জন্য আমার সুন্নাহ এবং আমার খোলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত মানা আবশ্যক।" (আবু দাউদ, ৪৬০৭) আবারও সুন্নাহ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভূক্ত নয়।" (বোখারি, হাদিস নং-৫০৬৩, মুসলিম, হাদিস নং-১১৩)

"আমার উম্মতের ধ্বংসের সময় যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে সে একশত শহীদের সওয়াব পাবে"- (তাবরানি ফিল আওসাত্ব ২/৩১)

দেখুন উপরোক্ত সবগুলো হাদিসে সুন্নাহর অনুসরণের কথা বলা হয়েছে হাদিসের না।

১. সকল সুন্নাহই হাদিস, কিন্তু সকল হাদিসই সুন্নাহ নয়। সকল হাদিসই প্রিয় প্রিয়নবীর (ﷺ) কথা, কিন্তু উনার সর্বশেষ প্রমাণিত আমলই হচ্ছে উনার সুন্নাহ।

২. আমরা সরাসরি সকল হাদিসের অনুসরণ করতে পারব না, কারণ হাদিসের মধ্যে মানসুখ আছে যার হুকুম রহিত হয়ে গেছে অন্য কোন হাদিস অথবা কুরআনের আয়াত দ্বারা। কিন্তু ঐ মানসুখ হাদিসগুলো কিতাবে থাকবে হাদিস হিসেবে, আমরা স্টাডিও করব, কিন্তু অনুসরণ করব না।

৩. হাদিসের মধ্যে শাজ আছে যা সহিহ হতে পারে, যেই সহিহ হাদিসের বিপরীতে আরো অধিক গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীর অধিক

CamScanner

সহিহ হাদিস এসেছে, তাই ঐ শাজ সহিহ হাদিসেরও আমল আমরা করতে পারব না।

৪. হাদিসের মধ্যে মুদ্বতারাব (দ্বিধাপূর্ন হাদিস) আছে। একই বর্ণনাকারী একই বিষয়ে অনেক রকম কথা বলেছেন যা প্রমাণিত। একই সাহাবী তারাবির নামাজের কথা কোথাও বলেছেন, ২৩ রাকাত, কোথাও বলেছেন ১১ রাকাত, আবার কোথাও বলেছেন ১৩ রাকাত। তাই ঐ বিষয়ে উনার কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু হাদিসের কিতাবে তাঁর বর্ণিত সব হাদিসই লিপিবদ্ধ থাকবে।

এজন্য আমরা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ বলি বা সুন্নাতের অনুসারী। আহলে কুরআন বলি না, কারণ কুরআনের মধ্যেও মানসুখ বা রহিত আয়াত আছে, যার তিলাওয়াত রয়ে গেছে কিন্তু হুকুম রহিত। নবী করীমের (ﷺ) সর্বশেষ আমল বা সুন্নাহই এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য। আর আহলে কুরআন বললে হাদিস সম্পূর্ণ বাদ হয়ে যায়।

তাই বর্তমান সময়ের সবচাইতে বড় ফিতনা আহলে হাদিস নামটিই একটি বিদআত, যা নিকৃষ্ট নতুন আবিষ্কার। এই নামে উম্মতকে আবারো বিভক্ত করা হয়েছে।

এখন আসুন দেখি আমরা শেষে জামাআত কেন লাগাই। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন, আলাইকুম বিল জামাআহ। তোমাদের উপর জামাআত বা অধিকাংশ মুসলমান যেদিকে থাকে সেদিকে থাকা আবশ্যক।

নবীজি (ﷺ) আরো বলেছেন, ইয়াদুল্লাহি মাআল জামাআত। আল্লাহর কুদরতি হাত জামাআতের সাথে।

উপরোল্লিখিত ৭৩ ফিরকার উল্লেখিত হাদিস শেষে নবীজি (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সেই একমাত্র হক্বপন্থী নাজাতপ্রাপ্ত দল

কোনটি? এক বর্ণনায় এসেছে প্রিয় নবীজি (ﷺ) জবাব দিয়েছিলেন, জামাআত। অর্থাৎ অধিকাংশ মুসলমান যেদিকে থাকে সেই দল।

যাই হোক, আবার ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। খারেজী ও শিয়া মতবাদের দুটো দল হওয়ার পর মুতাজিলা, জবরিয়া, কাদরিয়া, ওয়াহাবি, সালাফি/আহলে হাদিস, বাহাই, কাদিয়ানী ইত্যাদি আরো নানান ফিরকা বা দলের জন্ম নেয়। এদের প্রত্যেকেই দাবি করে তারা মুসলমান। তাই আমরা বাধ্য আমাদের পূর্বসূরীদের দেখানো একমাত্র হক্ব দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী সুন্নী মুসলমানের লেবেল নিজেদের গায়ে লাগাতে।

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনার গ্রামের নাম কি? আমি বলব রিচি। যদি বলে রিচি কোথায়? আমি বলব সৈয়দ বাড়ি বা সাহেব বাড়ি। এটা একটা ন্যাচারাল বিষয়। নিজের পরিচয় একদম স্প্যাসিফিক করে দিতে হলে এভাবেই বলতে হবে।

কোন অমুসলিম যখন জিজ্ঞেস করবে আপনার ধর্ম কি তখন আমি বলব ইসলাম। পরে আবার যদি পাল্টা প্রশ্ন করে ইসলামের কোন ধারা আপনি অনুসরণ করেন? তখন আমাকে বলতেই হবে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত। আর না হয় সে আমাকে শিয়া, খারেজি, বাহাই, আহলে হাদিস, ওয়াহাবি অনেক কিছুই মনে করতে পারে।

ভাই ইসলামকে আমরা ভাগ করিনি। আমরা ইসলামের মূলধারাতেই আছি আলহামদুলিল্লাহ, অন্যান্যরা নিজেদেরকে নতুন নতুন নাম দিয়ে নতুন দল করে মূলধারা থেকে আলাদা হয়েছেন।

আবেগী মুসলমান না হয়ে আমাদের উচিৎ বাস্তববাদী হওয়া। ঐক্যের ডাক দিচ্ছি এখন। সকল মতবাদ মিটিয়ে সবাই ইসলামের মূলধারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ছায়াতলে চলে আসুন, তাহলে আমরা সবার শুধুই একটা পরিচয় থাকবে আমরা মুসলমান। আমরাও আর নিজেদেরকে সুন্নী মুসলমান বলব না তখন বলব শুধুই মুসলমান।

CamScanner

সবার জন্য পবিত্র রবিউস সানী মাসের উপহার।

রিসালাতের জয়ধ্বনির (যদিও তা কাল হাশর পর্যন্ত জারি থাকবে) মাস শেষে বেলায়াতের জয়ধ্বনির মাসে পদার্পন।

তরিকায়ে কাদেরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সুলতানুল আউলিয়া কুতুবুল আরিফিন হযরত সায়্যিদ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনির রাহ. পবিত্র বেসাল শরিফ ১১ রবিউস সানি।

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর বান্দাগণেরমধ্যে এমন কিছু বান্দা আছেন যাদেরকে নবী এবং শহীদগণও (হাশরের দিন) ইর্ষা করবেন।"

প্রশ্ন করা হলো, তাঁরা কারা? আমরা যেন তাঁদেরকে ভালোবাসতে পারি। হুজুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ", قِيلَ : مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ ، قَالَ :" قَوْمٌ تَحَابُّوا بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلَا أَنْسَابٍ وُجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة يونس آية ٦٢" . قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى, وَابْنُ حِبَّانَ

"তাঁরা সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহর নুরের জন্য একে অপরকে ভালোবাসেন, যাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নাই, বংশগত কোন সম্পর্ক নাই। তাঁদের চেহারাসমুহ নূরান্বিত থাকবে নূরের মিম্বরের উপরে তাঁরা আরোহিত থাকবেন। তাঁরা ভয় পাবেন না যখন মানুষ ভীত থাকবে, তাঁরা চিন্তিত হবেন না যখন মানুষ চিন্তিত

থাকবে। অতঃপর তিনি (ﷺ) পাঠ করলেন, সাবধান নিশ্চয়ই আমার আউলিয়াগণের কোন ভয় নাই এবং চিন্তিতও হতে হবে না। (সুরা ইউনুছ: ৬২)

(সুনান আবু দাউদ, ইজারা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: বন্ধক হাদিস নং-৩৫২৭), নাসাই শরিফ, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসতাদরাকুল হাকিম)

দুর্বল হাদিসের উপর সবলদের অত্যাচার

কথা শুরু করতে চাই লোকমুখে প্রচলিত একখানা মশহুর (উলুমুল হাদিসের পরিভাষার মশহুর নয় বরং লোকমুখে বহুল প্রচলিত সে হিসেবে মশহুর) হাদিস দিয়ে। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" ،أخرجه ابن ماجه في سننه

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অন্বেষন করা ফরজ। (সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৪)

এছাড়াও এই হাদিসখানা অন্য সনদে আসহাবে কেরামগণের মধ্য থেকে হযরত আনাস ইবনে মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু সায়ীদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, মাওলা আলী, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে ইমাম তাবরানির মু'জামুল কাবির আওসাত ও সাগীর, শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, জামিউ বায়ানিল ইলম লিল হাফিজ ইবনু আব্দিল বার, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, কানজুল উম্মাল, খতিব বাগদাদীর তারিখে বাগদাদ সহ আরো অসংখ্য কিতাবে এসেছে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই হাদিসখানা হাদিসের প্রধান ছয়খানা বিশুদ্ধ কিতাবের একমাত্র সুনানু ইবনে মাজাহ (বিশুদ্ধতার দিক

থেকে ছয় নাম্বার কিতাব) ছাড়া আর কোন কিতাবে আসে নাই। তবে যেহেতু এই হাদিসখানা অসংখ্য সনদে অসংখ্য তরিকায় বিভিন্ন সাহাবী থেকে এসেছে তাই মুহাদ্দিগিণগণ এই হাদিসখানাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। কিন্তু সহীহ হাদিসের যেসকল শর্ত আছে এই হাদিসের কোন সনদই আলাদা আলাদাভাবে সে সকল শর্ত পূরন করতে পারে নাই। অর্থাৎ মোহাদ্দিসিনে কেরাম এই হাদিসখানাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন তায়াদ্দুদুর রেওয়ায়াতে ওয়াস সনদ বা অসংখ্য সনদে ভিন্ন ভিন্ন হাদিসের কিতাবে আসার কারণে, হাদিসখানার কোন একটি সনদ প্রকৃতপক্ষে সহিহ হওয়ার কারণে নয়। ইমাম জাহাবি এই হাদিসখানা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, এই হাদিসখানা হযরত আনাস ইবনে মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু সায়ীদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, মাওলা আলী, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বিভিন্ন সনদে এসেছে, কিছু কিছু সনদ একটি আরেকটির চেয়ে অধিক দুর্বল, কিছু চলনগণ। ক্লাসিক্যাল মুহাদ্দিসীনগণ এই হাদিসখানা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। কোন কোন ইমাম এই হাদিসের সনদের তাবেয়ী পরবর্তী কিছু কিছু রাবির (যেমন হাফস ইবনে সোলায়মান, খুবই দুর্বল বর্ণনাকারী) উপর মিথ্যা হাদিস রচনার অভিযোগও এনেছেন। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতীর রাহ. মত হাদিসের উপর হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী মুহাদ্দিসও এই হাদিসখানাকে তাঁর তাদরিবুর রাবি কিতাবে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন, সহীহ বলেন নি। কিন্তু এই হাদিসখানাকে ঘিরে এত সন্দেহ শোবহাতের পরও হাদিসের উপর হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানী সাহেব ঠিকই এই হাদিসখানাকে সহিহ বলেছেন তার সহিহুল জামি কিতাবে। তার কারণ পরে বলছি।

কিন্তু আমি শতভাগ নিশ্চিত যে, এই হাদিসখানার বিশুদ্ধতা নিয়ে কোন আলাপ আলোচনা, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ একমাত্র ইলমে হাদিসে পারদর্শী কোন আলীম ছাড়া সাধারণ মুসলমানরা কোনদিন শোনেননি। তাদের কাছে এই হাদিসখানা সহিহ থেকে সহিহতম,

CamScanner

বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম হিসেবেই প্রতিভাত। এই হাদিসখানার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উলামায়ে কেরাম দ্বিধাবিভক্ত এই আলোচনা নিশ্চয়ই সাধারন মানুষের কর্ণগোচর হয়নি কোনদিন। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামগণ মাযহাবের কোন নির্দিষ্ট আমলের পক্ষে সহিহ হাদিস দিলে, প্রিয়নবীজির (ﷺ) ফজীলতে, আসহাবে কেরামের শানে, আহলে বায়তের শানে, আওলিয়ায়ে কেরামের শানে অথবা মুস্তাহাব আমলের স্বপক্ষে কোন সহিহ হাদিস দিলেও বিশেষ এক শ্রেণীর আলীম ইনিয়ে বিনিয়ে এসব হাদিসকে দ্বয়ীফ প্রমানের চেষ্টায় লেগে যান। ইউটিউব, ফেইসবুক, টিভি স্ক্রীন সরগরম হয়ে যায় তাদের চিৎকার চেচামেচীতে। আর যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামগণ মাযহাবের আমলের পক্ষে, প্রিয় নবীর (ﷺ) ফজিলতে, আসহাবে কেরামের শানে, আহলে বায়তের শানে, আওলিয়ায়ে কেরামের শানে অথবা মুস্তাহাব আমলের স্বপক্ষে কোন দ্বয়ীফ হাদিস আনেন তবে তো আর কোন কথাই নেই। এই হাদিসকে মওদু, জাল বা বানোয়াট হাদিস প্রমান না করে নিস্তার নেই ঐ বিশেষ এক শ্রেণির আলীমগনের।

আর যেই হাদিস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতের স্বপক্ষে দলিল নয় সেই হাদিস দ্বয়ীফ বা হাসান লি গাইরিহির পর্যায়ের হলেও তাকে সহীহের পর্যায়ে তুলে দিবেন। যেমনটা হয়েছে উল্লেখিত হাদিসখানার ক্ষেত্রে, যেহেতু এই হাদিসখানা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতের স্বপক্ষের কোন দলিল নয়, বরং জ্ঞানার্জনের মত আম একটি বিষয়, সেহেতু একে দ্বয়ীফ বা হাসান লিগাইরিহি থেকে সহিহের পর্যায়ে তুলে দিয়েছেন হাদিসের উপর হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানী সাহেব। এসবের কারণই হচ্ছে দলবাজী বা ফিরকাওয়ারিয়াত। নিজেদের মতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। দ্বয়ীফ হাদিস দিয়ে যেখানে ফরজ ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায়না বলে সলফে

সালেহীনগণ একমত সেখানে দ্বয়ীফ হাদিস বা হাসান লি গাইরিহির পর্যায়ের হাদিস দিয়ে জ্ঞানার্জন ফরজ সাব্যস্তও হয়ে যাচ্ছে।

হাদিসের দুটো অংশ থাকে। প্রথম অংশ হাদিসের বর্ণনাকারীদের নামসমূহের শিকল ক্রমধারাসহ একে সনদ বলে (Chain of Transmission of Hadith), দ্বিতীয় অংশটি হাদিসের কথা একে মতন বলে (Twe: of Hadith)। প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা যখন কোন হাদিসকে সহীহ, হাসান বা দ্বয়ীফ বলি তখন আসলে হাদিসখানার মতনের উপরে এই হুকুমটি বর্তায়না, বরং হুকুমটি সনদের (Chain of Transmission of Hadith) উপরে আসে। হতে পারে এই হাদিসখানারই মতন বা কথা (Twe: of Hadith) অন্য কোন দ্বয়ীফ, হাসান বা সহিহ সনদে এসেছে। তখন ঐ দ্বয়ীফ হাদিসটি আর দ্বয়ীফ থাকবে না বরং হাসান লিগাইরিহির পর্যায়ে ওঠে যাবে। এটা উলুমুল হাদিসের একটি মৌলিক কায়েদা।

এখন পরবর্তী মূল আলোচনাতে যাওয়ার আগে আসুন আমরা জানার চেষ্টা করি সহিহ, হাসান এবং দ্বয়ীফ হাদিস কাকে বলে। পরিশেষে আমরা এও জানার চেষ্টা করব যে দ্বয়ীফ হাদিস কি একদম পরিত্যাজ্য, নাকি দ্বয়ীফ হাদিস অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে আমল করা যায়, এ সম্পর্কে সালফে সালেহীনগণের মতামত কি।

সহিহ হাদিসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

الحديث الصحيح اصطلاحاً: ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضَّبط، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ، ولا عِلَّة

১. সহিহ হাদিস: সহিহ হাদিস হচ্ছে প্রত্যেক সেই হাদিস যা বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা ঠিক রেখে ন্যায়পরায়ন (মিথ্যা বলেন না এবং আমল-আখলাক ঠিক আছে এমন বালিগ, জ্ঞানবান মুসলমান থেকে বর্ণিত) ও পরিপূর্ন স্মরনশক্তি ওয়ালা বর্ণনাকারীর বর্ণনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, যা শাজ (অধিক নির্ভরযোগ্য

বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসের বিপরীত) নয় এবং যাতে এমন কোন লুকায়িত কারণ নেই যা সহিহ হওয়ার অন্তরায়।

২. হাসান হাদিস: হাসান হাদিসের সংজ্ঞাও সহিহ হাদিসের অনুরুপ তবে কোন এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর স্মরনশক্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল সহিহ হাদিসের বর্নাকারীদের তুলনায়।

৩. দ্বয়ীফ হাদিস: সহিহ এবং হাসান হাদিসের সংজ্ঞায় বর্ণিত কোন একটি শর্ত যে হাদিসে অনুপুস্থিত থাকে সেটাই দ্বয়ীফ হাদিস।

হাদিস দ্বয়ীফ হওয়ার কারণসমূহ:

১. বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা ঠিক না থাকা। সনদের কোন এক পর্যায়ে কোন এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়া।

২. বর্ণনাকারীদের কোন একজনের ন্যায়পরায়নতা ঠিক না থাকা। যেমন কোন বর্ণনাকারী আমল-আখলাক শতভাগ ইসলামিক না হওয়া। তবে কোন বর্ণনাকারী যদি মিথ্যা কথা বলেন বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে তবে তার হাদিসই জাল বা মওদু' বলে পরিগনিত যা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

৩. কোন এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর স্মরনশক্তি হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীদের তুলনায়ও কম হওয়া।

৪. শাজ (অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসের বিপরীত) হলে।

৫. যাতে এমন কোন লুকায়িত কারণ আছে যা সহিহ হওয়ার অন্তরায়। যেমন উদাহরনস্বরুপ বলা যায়, যদি হাদিসের আলোচ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় যা এমন সভায় বলা হয়েছে যেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন অথচ একজন ব্যতিত আর কেউ তা বর্ণনা করেন নি।

উপরে বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে কোন হাদিস দ্বয়ীফ বা দুর্বল হতে পারে।

CamScanner

এখন আসুন আমরা দেখি দ্বয়ীফ হাদিস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসিন ও ফোকাহাগণ কি বলেছেন। দ্বয়ীফ হাদিস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসিন ও ফোকাহাগণ মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত:

১. প্রথম মত: চার মাযহাবের ইমামগণ হযরত আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু দাউদ, ইবনুল হুম্মাম সহ অনেক ইমাম ও মুহাদ্দিসিনগণ বলেছেন, দ্বয়ীফ হাদিসের উপর আমল করা যায় চাই তা শরীয়তের কোন হুকুম আহকামের বিষয়ে হোক অথবা ফজীলতের কোন বিষয়ে হোক। শর্ত হচ্ছে: দ্বয়ীফ হওয়ার কারণটি কোন কঠিন দুর্বলতার (ضعف شديد) কারণ না হওয়া (যেমন হাদিসটির কোন বর্ণনাকারীর উপর মিথ্যা কথা বলার অভিযোগ থাকা, অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসের বিপরীত না হওয়া ইত্যাদি) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আর কোন হাদিস না থাকলে, যার ফলে উদ্ভূত বিষয়ে আমরা দ্বয়ীফ হাদিসটির উপরই নির্ভরশীল। তাদের দলিল হচ্ছে, দ্বয়ীফ হাদিসের সঠিক হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাই যখন দ্বয়ীফ হাদিসের বিপরীতে আর কোন সহিহ হাদিস না আসে তখন এই হাদিস অনুযায়ী আমল করা যায়।

২. দ্বিতীয় মত: হযরত ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু জাকারিয়া নিশাপুরী, ইমাম আবু জুরআহ রাজী, ইবনু হিব্বান, ইবনু হাজম, ইবনু তাইমিয়াহ, শেখ শওকানী, শেখ আলবানী তাদের মতে দ্বয়ীফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা যায় না, শরীয়তের হুকুম আহকামের ব্যাপারে তো না ই, বরং ফজীলতের ক্ষেত্রেও না। তাদের দলিল হচ্ছে, দ্বয়ীফ হাদিস ধারণাগতভাবে বিশুদ্ধ না হওয়ার ফায়েদা (ظني مرجوح) দেয়। সঠিকও হতে পারে তবে বেঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আল্লাহ পাক এবং রাসূল (ﷺ) ধারণা করাকে কুরআন ও হাদিসে অপছন্দ করেছেন।

৩. তৃতীয় মত: জমহুর মুহাদ্দিসিন ও ফোকাহাগণের মত হচ্ছে, শরীয়তের হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে (ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারাম

নির্ধারণে) দ্বয়ীফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা যাবে না, কিন্তু ফজীলতের ক্ষেত্রে (নফল ইবাদাত বন্দেগী) দ্বয়ীফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা যায়। শর্ত হচ্ছেঃ হাদিসের দুর্বলতাটি খুব বড় কোন দুর্বলতা নয় (মওদু' বা বানোয়াট হাদিস হওয়ার মত কারণ নয়), এর বিপরীতে কোন সহিহ হাদিস থাকতে পারবে না।

তৃতীয় মতের পক্ষেই অধিকাংশ মুহাদ্দিগিণ ও ফোকাহায়ে কেরাম রয়েছেন, বরং হাদিস ও ফিকহের অনেক কিতাবে এই মতের উপর উলামায়ে কেরামের ইজমা' আছে বলেও অনেকে উল্লেখ করেছেন। এই মতটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, শায়খ জাকারিয়া আল আনসারী, ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী, ইমাম সুয়ুতী, খতিব বাগদাদী, ইমাম নববী, ইরাকী, সাখাবির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।

ইমাম নববী (রাহঃ) বলেন, দ্বয়ীফ হাদিস ফজিলতের (নফল ও মুস্তাহাব ইবাদাতের ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রে, ওয়াজ মাহফিলে মানুষকে ভয় দেখাতে ও নেক আমলে উৎসাহিত করতে এবং ইতিহাসের কিতাবে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম ইবনুস সালাহ তার বিখ্যাত উলুমুল হাদিসের কিতাব মুকাদ্দিমাতে বলেন, হাদিস বিশারদগণ এই বিষয়ে ইজমা করেছেন যে, দ্বয়ীফ হাদিস অনুযায়ী ফজীলতের ক্ষেত্রে (নফল বা মুস্তাহাব আমলের ক্ষেত্রে) আমল করা যায়, তবে শরীয়তের হুকুম আহকামের ব্যপারে বা ঈমান আকিদার ব্যাপারে না।

অথচ কট্টরপন্থী ঐ বিশেষ এক শ্রেণির মুহাদ্দিসগণ দ্বয়ীফ হাদিসকে মওদু' বা বানোয়াট হাদিসের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। দ্বয়ীফ হাদিস মাত্রই তাদের কাছে একদম পরিত্যাজ্য। এটা দ্বয়ীফ হাদিসের উপর জুলম বা অত্যাচার। ঐ সকল শায়খদের দখলে এখন পেট্রোডলার, মিডিয়া, ইন্টারনেট সবই আছে, তাই তারা তাদের এসব ভ্রান্ত মতবাদ খুব জোরেশোরে প্রচার করছেন এবং আমাদের শিক্ষিত

CamScanner

সমাজকে ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। যেহেতু সাধারন শিক্ষিত ভাইবোনেরা উলুমুল হাদিস, মুসতালাহুল হাদিস, জরহ-তা'দিল, রাবিগণের পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তাই তারা মিডিয়া সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ঐসব তথাকথিত শায়খদের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করছেন। কট্টরপন্থী ঐসকল শায়খরা সহিহকে হাসান, হাসানকে দ্বয়ীফ এবং দ্বয়ীফকে মওদু' বানাচ্ছেন আর আমাদের সাধারন শিক্ষিত সমাজ তাই গ্রহণ করছেন।

অথচ মওদু' বা জাল হাদিসের ব্যাপারে বহু মুহাদ্দিগিণ বলেছেন যে, মওদু' হাদিস দ্বয়ীফ হাদিসের কোন প্রকার নয়। মওদু' হাদিসের পেছনে হাদিস শব্দখানা ব্যবহার করাই জায়েজ না। কারণ মিথ্যাবাদীরা মনগড়া হাদিস রচনা করে একটি মিথ্যা সনদ বানিয়ে তা নবীজির (ﷺ) নামের সাথে যুক্ত করেছে মূলত: যা নবীজির (ﷺ) কথাই নয়। তাই মওদু' বা বানোয়াট হাদিসকে হাদিসই বলা যাবে না।

আর দ্বয়ীফ হাদিস যদি শাজ (অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত) না হয় অথবা হাদিসটিতে এমন গোপন কোন কারণ যদি না থাকে যাতে মনে হয় যে হাদিসটির বিশুদ্ধ হওয়া অসম্ভব, তবে ঐ হাদিসটির বিশুদ্ধ হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থেকে যায়। তাইতো আমরা এর আগে ক্লাসিক্যাল মুহাদ্দিসিন ও ফোকাহা এবং প্রথম যুগের ইমামগণের মতামত থেকে দেখেছি যে, চার মাযহাবের ইমামগণ সহ অনেক ইমামই দ্বয়ীফ হাদিস অনুযায়ী আমল করাকে সকল ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছেন। ফজিলত, ইতিহাস, নফল আমল, তারগীব-তারহিবে তো তারা দ্বয়ীফ হাদিস গ্রহণ করেছেনই বরং শরীয়তের সকল হুকুম আহকামের ক্ষেত্রেও তারা দ্বয়ীফ হাদিস গ্রহণ করেছেন যদি ঐ বিষয়ে ঐ দ্বয়ীফ হাদিসটি ছাড়া অন্য কোন হাদিস না থাকে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমাদের নিকট কিয়াস করার চেয়ে দ্বয়ীফ হাদিস অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

"দ্বয়ীফ হাদিস শরীয়তের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য" এই মতের স্বপক্ষে খুব কম ক্লাসিক্যাল স্কলাররাই মত দিয়েছেন। হাতেগোনা কজন প্রথম যুগের ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ শুধু এই মতের স্বপক্ষে মতামত দিয়েছেন। বরং এই মতের স্বপক্ষে এই আধুনিক যুগের এক বিশেষ শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম এসে কট্টরভাবে দাঁড়িয়েছেন। দু:খজনক যে, ঐ সকল শায়খদের দখলে এখন পেট্রোডলার, মিডিয়া, ইন্টারনেট সবই। যেমনভাবে ইচ্ছা তারা এসব ভ্রান্ত মতবাদকে প্রচার করছেন এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

যদিও তৃতীয় মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। দ্বয়ীফ হাদিস ফজিলতের (নফল ও মুস্তাহাব ইবাদাতের ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রে, ওয়াজ মাহফিলে মানুষকে ভয় দেখাতে ও নেক আমলে উৎসাহিত করতে এবং ইতিহাসের কিতাবে গ্রহণযোগ্য। এর স্বপক্ষে আমরা ইজমা'ও পাই কোন কোন উলুমুল হাদিসের কিতাবে। কিন্তু দ্বয়ীফ হাদিস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য এরকম ধারণা করা একটা ফিতনা। দ্বয়ীফ হাদিসকে মওদু' বা বানোয়াট হাদিসের পর্যায়ে নিয়ে আসাটা নবীজির (ﷺ) হাদিসের উপর একপ্রকারের জুলম এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদীত একটি বিষয়।

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে হক্ব বুঝার জানার ও মানার তওফিক দান করেন। আমিন।

ঢাকা: ৩০.০৪.২০১৮ ইং

লেখাটির উৎস্য এবং এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে নিম্নের কিতাবগুলো পড়ুন:

১. আজকার, ইমাম নববী, দারুল ফিকর বৈরুত

২. তাদরিবুর রাবি, ইমাম সুয়ুতী

CamScanner

৩. মা'রিফাতু আনওয়াযড়উলুমিল হাদিস, বিখ্যাত মুকাদ্দিমাতু ইবনেস সালাহ নামে।

৪. তাকরিব ও তাইসির, ইমাম নববী।

৫. আল বাযড়সুল হাসিস ইলা ইখতিসারি উলুমিল হাদিস, ইমাম ইবনে কাসীর।

পোশাক-পরিচ্ছদঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আমাদের মুসলমান সমাজে বিতর্ক প্রায় সবকিছু নিয়েই হয়। সমালোচনা প্রায় সবকিছু নিয়েই চলে। দু:খের বিষয়, কিন্তু কি আর করা এভাবেই চলে আসছে। সে যাইহোক, পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়েও বিতর্ক আছে। কোনটা ইসলামিক পোশাক আর কোনটা অনৈসলামিক পোশাক! আসুন একটু কোরআন হাদিসের আলোকে দেখি আসলেই ইসলামিক পোশাক আর অনৈসলামিক পোশাক বলতে কিছু আছে কিনা!

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরিফে ইরশাদ করেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"হে বনী-আদম আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সাজ সজ্জার জন্য, আর তাকওয়া বা পরহেযগারীর পোশাক এটিই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা আরাফ, সূরা নং ৭ আয়াত নং-২৬)

কোরআন শরিফে আরো ইরশাদ হয়েছে যে, "আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের

যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা নুর, সূরা নং ২৪: আয়াত নং ৩১)

উপরের আয়াত দুখানার আলোকে আমরা দেখছি যে পোশাক পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত: তিনটি:

১. সতর ঢাকা এবং পবিত্রতা হাসিল (পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ এবং মহিলাদের জন্য মুখমন্ডল, হাতের কব্জির নিচ দিক এবং পায়ের ঘন্টার নিচ দিক এই তিন জায়গা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে, এটা মেয়েদের সতর যা ফরজ। সুরা নুরের উপরের আয়াতের "তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে" এই অংশের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারকগণ তাই বলেছেন। আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা রা: হতে বর্ণিত, হযরত আসমা রা: কে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) অনুরুপ উপদেশ করেছেন সতরের ব্যাপারে।

২. শরীরের হিফাজত ও

৩. সাজ-সজ্জা বা সৌন্দর্য।

কাজেই কোরআন শরিফ অনুযায়ী এই তিন উদ্দেশ্য যেই কাপড়েই পূর্ণ হয় সেই কাপড়ই ইসলামিক পোশাক। চাই তা জুব্বা হোক,

CamScanner

পানজাবি -পাজামা হোক, প্যান্ট-শার্ট বা ফতোয়া হোক, স্যুট-কোট, টাই হোক বা মেয়েদের ক্ষেত্রে শাড়ী- বা সালোয়ার-কামিজ হোক।

তবে আমি স্পষ্টত: বলে নিতে চাই যে, নবী করিম (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম বা তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামগণের পরিবারের মহিলাগণ যে ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন, সে ধরনের পোশাক পড়া ফজিলতপুর্ণ কাজ বা উত্তম কাজ। এর মানে এই না যে, অন্য সব ধরনের পোশাক পড়া হারাম বা গোনাহের কাজ। এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা নাই কোরআন হাদিসে। কাজেই অন্যান্য পোশাক পরিধান করা মুবাহ।

এমনকি বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যে, নবী করিম (ﷺ) কে বিভিন্ন দেশের ও জাতির সাহাবায়ে কেরাম বা রাজা-রাজন্যরা যে ধরনের পোশাকই উপহার দিয়েছেন হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাই পড়েছেন। যদি না তা উপরে বর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্যের যে কোন একটির বিপরীত হয়। তবে হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, পোশাকে প্রাণীর ছবি আঁকা হলে তা তিনি (ﷺ) পরিধান করতেন না।

হাদিস শরিফে আরো এসেছে যে, রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ, কাজেই রেশমী কাপড় ও স্বর্ণের কোনকিছু পুরুষলোক পরিধান করতে পারবেন না। আর তেমনিভাবে মেয়েরা পুরুষদের কাপড় পড়ে পুরুষ সদৃশ সাজতে পারবেন না। হাদিস শরিফে এ ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে। পুরুষ এবং নারী কারো কাপড়ই আটোসাটো এবং স্বচ্ছ হতে পারবে না। কাপড় স্বচ্ছ হলে সতর ঢাকা হয় না ও অঙ্গ প্রদর্শন হয়। ঠিক একই ভাবে পোশাক-আশাক ঢিলেঢালা হওয়া আবশ্যক, নয়ত অঙ্গের আকৃতি বুঝা যায়।

পোশাক-আশাকে অন্য যে কোন ধর্মের ধর্মীয় চিহ্ন ধারণ করা যাবে না। কারণ হুজুর নবী পাক (ﷺ) বলেছেন,

من تشبه بقوم فهو منهم

"যে অন্য কোন জাতির (ধর্মীয় সম্প্রদায়ের) সাদৃশ্য ধারণ করে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত। (সুনান আবু দাউদ)

কাজেই কোন বিধর্মীর ধর্মীয় চিহ্ন ধারণ করা যাবে না। যেমন তিলক দেয়া, সিদুর পড়া, ক্রুশ গলায় দেয়া, ত্রিশুল হাতে নেয়া ইত্যাদি । হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সন্যাসীরা বিশেষ এক ধরনের ও বিশেষ এক রঙের পোশাক পড়েন, ঐ পোশাকও পড়া যাবে না। কারণ ওগুলো তাদের ধর্মীয় লিবাস। যে কোন ধরনের টুপিই পড়া যাবে তবে ইহুদী খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় বিশেষ এক ধরনের টুপি আছে যা শুধুমাত্র মাথার তালুকে ঘুরে রাখে। ঐ ধরনের টুপি ব্যবহার করা যাবে না।

আসলে স্থান-কাল-পাত্রভেদে, দেশভেদে, অঞ্চলভেদে, আবহাওয়াভেদে একেক দেশে একেক কাপড়ের রীতি রেওয়াজ চালু আছে, যেগুলো পরিধান করা জায়েজ। হারাম হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় এবং এই জিনিস নিয়েই সবচাইতে বেশি বিতর্ক হয় আর তা হলো প্যান্ট-শার্ট, স্যুট-কোট তো ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ড্রেস, কাজেই এগুলো পড়া কীভাবে জায়েজ হয়?

প্রথমেই বলে নেই, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে, প্যান্ট-শার্ট, স্যুট-কোট ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ড্রেস। কারণ ইহুদী ও খ্রীষ্টান দুই ধর্মের জন্মই ফিলিস্তিনে এবং ফিলিস্তিন আরবদেশভূক্ত। তাদের পোশাকও আরবেরই পোশাক। অর্থাৎ তারাও জুব্বা পরিধান করেন। বরং প্যান্ট-শার্ট, স্যুট-কোট হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার পোশাক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যারাই পাশ্চাত্য দেশে বাস করেন তারাই প্যান্ট-শার্ট, স্যুট কোট টাই পড়েন। যেমনভাবে আমাদের দেশের অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের পোশাক হচ্ছে লুঙ্গি- পান্জাবি, কাবুলি, ধুতী, শাড়ী ইত্যাদি। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এসব পোশাক পড়েন।

দেখুন আরব দেশের কেউ পান্জাবি পড়েন না অথচ আমরা পাঞ্জাবিকে ইসলামিক পোশাকের মর্যাদা দিয়ে বসে আছি। হুজুর

CamScanner

নবীজিও (ﷺ) এরকম পান্‌জাবি পড়েন নাই। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ছাড়া কোন আরব দেশে এইরকম পাঞ্জাবি কেহ পড়েন না। পান্‌জাবি হিন্দুদের পোশাক। অথচ ইহুদী-খ্রিষ্টানরা আহলে কিতাব, তারা মুশরিকদের চেয়ে উত্তম। কিন্তু আমরা তথাকথিত ইহুদী খ্রিষ্টানদের ড্রেস (প্যান্ট শার্ট, স্যুট-কোট, হ্যাট, টাই) কে হারাম বলি আর হিন্দুদের পোশাক পাঞ্জাবিকে ইসলামিক ড্রেস মেনে নিয়েছি। আজব সেলুকাস।

একই জিনিস মেয়েদের শাড়ীর ব্যাপারেও বলা যায়। আমাদের দেশে মেয়েরা যে শাড়ী পড়ে তা কি ইসলামিক? হুজুর নবীজির (ﷺ) পরিবারের মহিলাগণ কি কোনদিন শাড়ী পড়েছেন? সাহাবায়ে কেরামগণের পরিবারের মহিলাগণ কি কোনদিন শাড়ী পড়েছেন? কোন আলীম ফতোয়া দিয়েছেন আজ পর্যন্ত যে শাড়ী পড়া হারাম? অথচ এটাও তো আদতে তথাকথিত হিন্দুয়ানী ও বিধর্মী সংস্কৃতি।

কাজেই মূলকথা হচ্ছে : আসলে কে পড়ে আর কে পড়ে না এটা কোন বিষয় নয় বরং ইসলামের মানদন্ডের সাথে এই কাপড় যায় কিনা সেটাই হচ্ছে ব্যাপার।

আর আল্লাহ পাক সূরা আরাফে বলেছেন যে,

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

এবং তাকওয়া বা খোদাভীরুতার পোশাক, এটিই সর্বোত্তম (সুরা আরাফ-সূরা নং -৭, আয়াত নং ২৬)

আর তাকওয়ার স্থান হচ্ছে কলব বা অন্তর। কাজেই তাকওয়া বা খোদাভীরুতার পোশাক অন্তরকে পড়াতে হয়, দেহ কে নয়। যেমনটা হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে,

তাকওয়া বা খোদাভীরুতা এখানে, বলে তিনি নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইশারা করলেন।

CamScanner

(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ নং : ৯ মুসলমানকে অপমান করা, তিরস্কার করা বা জুলম করা হারাম। হাদিস নং -৬৩৫৮।)

আমি ব্যাক্তিগতভাবে জুব্বা বা পান্‌জাবি-পাজামা পড়তে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি ও পছন্দ করি। কিন্তু চাকরী-বাকরীর প্রয়োজনে প্যান্ট-শার্ট, স্যুট-কোট পড়তে হয়। কোন কাপড়েই আমার ব্যাক্তিগত কোন আক্রোশ নেই, যতক্ষণ না সেই পোশাক উপরে আলোচিত শরীয়তের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকে।

তবে আমার ব্যাক্তিগত একটা শখ আছে। আর তা হল মানুষের ভুল ধারণার মূলে আঘাত করার জন্য ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন আমি স্যুট-কোট, টাই-সু পড়ে ওয়াজের মঞ্চে ওঠব। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন (ﷻ) এবং তাঁর পেয়ারে হাবিব হুজুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই অধিক জ্ঞাত আছেন।

পুরুষের জন্য টাকনু-গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে (إسبال الثوب) চলার হুকুম

সকল ফোকাহায়ে কেরামগণ (ইসলামিক আইনবেত্তাগণ) এই বিষয়ে একমত যে, অহংকার (الخيلاء) বশত: টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া হারাম এবং কবিরা গুনাহ। কিন্তু অহংকার ছাড়া টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া যাবে কিনা এ নিয়ে ফোকাহায়ে কেরামগণের মাঝে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন হারাম, কেউ বলেছেন মাকরুহ, কেউ বলেছেন জায়েজ। তবে চার মাযহাবের বেশিরভাগ ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এটা হারাম নয়।

CamScanner

১. ইবনু মুফলিহ আদাবুশ শরীয়াহ কিতাবে লিখেছেন, (খন্ড ৩: পৃষ্ঠা ৫২১) ইমাম আজম হযরত আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ কে মাটিতে কাপড় ঝুলিয়ে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করা হলো আমাদেরকে কি এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়নি? তখন তিনি জবাব দিলেন নিশ্চয়ই তা অহংকার (الخيلاء) বশত টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে যারা চলে তাদের ব্যপারে, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (আরো দেখুন: ফতোয়া আল হিন্দিয়া, খন্ড ৫: পৃষ্ঠা ৩৩৩)

২. মালেকি মাযহাবের কেউ কেউ একে হারাম বলেছেন। যেমন ইবনুল আরাবি, কারাফি প্রমুখ।

কিন্তু মালেকি মাযহাবের বিখ্যাত আলীম হাফিজ ইবনু আব্দিল বার তাঁর তামহিদ" কিতাবে (খন্ড:৩/পৃষ্ঠা ২৪৪) বলেছেন, হাদিস অনুযায়ী অহংকার ছাড়া যারা কাপড় ঝুলিয়ে চলবে তারা এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এটা ভাল কাজ নয়।

৩. শাফেয়ী মাযহাবের বেশিরভাগের মত হচ্ছে অহংকারবশত: না হলে এটা জায়েজ।

ইমাম নববী তাঁর আল-মাজমু কিতাবে (খন্ড:৩/পৃষ্ঠা ১৭৭) লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন, নামাজে এবং নামাজের বাইরে সর্বাবস্থায় অহংকার (الخيلاء) বশত: টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া হারাম। কিন্তু অহংকার ছাড়া টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়াতে অসুবিধা নাই।

৪. হাম্বলী মাযহাবের মত: বেশিরভাগণ বলেছেন হারাম নয়। আল ইকনা কিতাবে (খন্ড:১/পৃষ্ঠা ১৩৯) বলা হয়েছে, পুরুষের কাপড় কারণ ছাড়া টাকনুর নিচে পড়াকে মাকরুহ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনে কুদামাহ আল হাম্বালী যিনি ইবনে তাইমিয়্যার দাদা শায়খ আল মুগণী কিতাবে বলেছেন, জামা, পায়জামা টাকনুর নিচে পড়া মাকরুহ। আর যদি কেহ অহংকার (الخيلاء) বশত: টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়ে তবে তা হারাম।

CamScanner

ইবনু মুফলিহ আল-আদাবু আল-শরীয়াহ কিতাবে লিখেছেন, (খন্ড ৩: পৃষ্ঠা ৫২১), হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত আলীম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও একে হারাম নয় বলেছেন। (আরো দেখুন: ইবনে তাইমিয়্যাহ রচিত শরহুল উমদা পৃষ্ঠা: ৩৬১-৩৬২)

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী দাবিদার (আসলে তারা লা-মাযহাবি) ইবনে উসাইমিন, ইবনে বাজ সহ সকল সমসাময়িক তিন দিন আগের আলীমরা একে হারাম বলেছেন।

আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আমাদের হুজুরদের বিজ্ঞান ভাবনা: টাকনু গিড়ার নিচে কাপড় ঝুলানো সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান

ইদানীং আমাদের কিছু হুজুরদের ট্রেন্ড হয়ে গেছে, সাইন্স সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান না থাকার পরও কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ থেকে সাইন্স খুঁজে বের করতে চেষ্টা করা। এটা মূলত খারাপ না। কুরআন হাদিসে সাইন্টিফিক ফ্যাক্টস খুঁজে পেলে ঈমান তাজা হয়, মানুষের কাছে বর্ণনা করলে তাদেরও ঈমান তাজা হয়। কুরআন হাদিসে এরকম বহু সাইন্টিফিক ফ্যাক্টস আছে, যা ই'জাযুল কুরআন বা কুরআনের মুজিযা।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হুজুরদের সাইন্স সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান না থাকার কারণে এমন সব আজগুবি কথা বলেন যে, শিক্ষিত ও এলিট সোসাইটিতে ইসলাম নিয়ে মানুষ উপহাস করে, কারণ সবার তাকওয়া ও সহনশীলতার লেভেল এক সমান না।

তেমনি একটি সমস্যা নিয়ে আজ কিছুটা আলোকপাত করব ইন শা আল্লাহ। আমি শতভাগ নিশ্চিত যে, কিছু হুজুরকে ওয়াজে বলতে শুনেছি, টাকনুতে সেক্স হরমোন থাকে এবং টাকনু গিড়া খোলা

CamScanner

রাখলে তাতে বাতাস লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি, এতে বায়োলজিকাল উপকার আছে। টাকনুতে বাতাস লাগলেই যদি হরমোন বের হয়, তো প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রায় সব সময়ের আমল ছিল মোজা দিয়ে টাকনু ঢেকে রাখা। তো তখন বাতাস কীভাবে লাগত? মোজা পড়া সুন্নাত, তাও চামড়ার তৈরি মোজা। তো বাতাস কেমনে লাগে টাকনুতে তখন? আসলে টাকনু গিড়াতে সেক্স হরমোন থাকে এটা বায়োলজির বইয়ের দূর দূর থেকে কোথাও নেই। যতটুকু আমি রিসার্চ করেছি।

আসল বিষয় হচ্ছে, জামার আস্তিনের নিচে অনেক দূর এবং টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলাকে জাহেলিয়াত যুগে ধনীলোকের পরিচয় ও অহংকারের পরিচায়ক মনে করা হত। এজন্যই হুজুর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, টাকনুর নিচে যে অহংকারবশতঃ বাতরান বা খুইয়ালা কাপড় ঝুলিয়ে চলবে, (কাপড় ঝুলিয়ে চলা) আল্লাহ পাক হাশরের দিনে তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

সহিহ বুখারির, পোশাক পরিচ্ছদ অধ্যায়ের ৫৩৬৭ নং হাদিস থেকে দেখতে থাকুন। অনেকগুলো হাদিস এসেছে (বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)।

বাতরান বা খুইয়ালা দুটো আরবি শব্দ এসেছে এই ক্ষেত্রে, দুটোর অর্থই অহংকার বশতঃ।

চেয়ারে বসে নামাজ পড়া

যারা দাঁড়াতে পারেন তারা ফরজ, ওয়াজিব নামাজে অবশ্যই কিয়াম করবেন, এটা ফরজ। দাঁড়াতে অক্ষম হলেই কেবল জমিনে বসে নামাজ পড়বেন, জমিনে বসতেও অক্ষম হলে শুয়ে নামাজ পড়বেন। আবার অনেকেই পিঠের ও কোমরের বিভিন্ন জটিল সমস্যার কারণে জমিনে বসতে অক্ষম। সেক্ষেত্রেই কেবল চেয়ারে বসবেন।

CamScanner

আর যারা দাঁড়াতে পারেন দাঁড়ানোর সময় অবশ্যই দাঁড়াবেন, কিন্তু কোমর ভেংগে রুকু সিজদা করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে তারা রুকু ও সেজদার সময় বসে রুকু সিজদা দিবেন।

যারা ঠিকমত কোমর বাঁকিয়ে ও জমিনে পড়ে গিয়ে রুকু এবং সেজদা দিতে পারেন না শারীরিক অক্ষমতার কারণে তারাই কেবল চেয়ারে বসে রুকু এবং সেজদা দিতে পারেন।

তবে সুন্দরভাবে হেটে হেটে মসজিদে প্রবেশ করে চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়া যাবে না। দাঁড়াতে ও জমিনে বসতে অক্ষম হলেই কেবল চেয়ারে বসে নামাজ ও রুকু সিজদা জায়েজ।

সহিহ বোখারি, হাদিস নং- ১১১৭

، فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, অক্ষম হলে বসে নামাজ পড়, তাতেও অক্ষম হলে শুয়ে নামাজ পড়।

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কারো মত ননঃ

দাঁড়িয়ে বসে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদিসে আকিদার শিক্ষাঃ

روى مسلم (١٢١٨) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

(সহিহ মুসলিম হাদিস নং- ১২১৪)

CamScanner

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমি শুনতে পেলাম নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া নামাজের অর্ধেক (অর্ধেক কবুল হয় বা অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়) অতঃপর আমি নবীজির (ﷺ) নিকটে আসলাম এবং তাঁকে বসে নামাজ পড়া অবস্থায় পেলাম এবং আমি আমার হাত তাঁর মাথা মুবারকে রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী চাও হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর? আমি বললাম, আমাকে বলা হয়েছে আপনি বলেছেন, কোন ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া নামাজের অর্ধেক, কিন্তু ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি বসে নামাজ পড়ছেন?

হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ ঠিক, তবে আমি তোমাদের কারো মত নই।

অনেক মুফাসসির, ফুকাহা নিচের দুইখানা আয়াতকেও অক্ষমতার ক্ষেত্রে বসে ও শুয়ে নামাজ পড়া জায়েজ হওয়ার দলিল বলেছেন।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (১০:১২)

আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (৩:১৯১)

CamScanner

যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

সর্বশেষ কথা: হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করীও না, সুসংবাদ দাও (মানুষকে দ্বীন) থেকে দূরে সরাইও না। সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৯, ৬১২৪, ৬১২৫।

দুই বন্ধুর তুমুল বিতর্ক: প্রসঙ্গ খারাপ বিদআত ও ভাল বিদআত

রোজেন ও রেজা দু বন্ধুর মধ্যে গলায় গলায় ভাব। দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র। ঢাবিতে ভর্তির পর থেকেই তারা দুজন বেস্ট ফ্রেন্ড। তবে রোজেন বেশ কিছুদিন হলো নতুন আবিষ্কৃত (বিদআত) এক ইসলামি দলে যোগ দিয়েছে যারা মাযহাব মানে না, মূল ধারার ইসলামে প্রতিষ্ঠিত বহু বিষয়ই তারা মানে না বরং শিরক-বিদআত বলে সেসব কাজকে কটাক্ষ করে। তার দলের মুরুব্বিদের প্রভাব বেশ পড়েছে তার উপর, নিজেও কিছু পড়ালেখা করছে সে ইসলাম নিয়ে অনলাইন-অফলাইনে। তারই প্রভাবে আবহমান কাল ধরে চলে আসা ইসলামের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সে ইদানিং ঘোর আপত্তি তুলছে। অন্যদিকে তার বন্ধু রেজা ইসলামের মূল ধারাই অনুসরণ করছে। ইদানীং দুই বন্ধুর মাঝে বেশ ভালই তর্ক-বিতর্ক চলছে বেশকিছু বিষয় নিয়ে। তবে তারা কেউই কাউকে মন্দ কথা বলে না, কটু কথা বলে না, কুরআন-হাদিস এবং যুক্তির বাহিরে কিছু বলে না তারা। সত্য জানতে ও সত্যের সন্ধানে তারা দুজনেই উন্মুখ।

CamScanner

একদিন দু বন্ধুর মাঝে কথা ওঠল আমাদের সমাজে প্রচলিত ঈদে মিলাদুন্নবি (ﷺ) বা প্রিয় নবীজির (ﷺ) শুভাগমন দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে। রোজেনের মতে নবীজির (ﷺ) জন্মদিন একমাত্র রোজার মাধ্যমেই উদযাপিত হতে হবে, যেহেতু প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাঁর জন্মদিনে রোজা রেখেছেন যেমনটা মুসলিম শরিফের হাদিসে এসেছে। বাকি আমরা যা করি সব বিদআত, তাই এসবই পরিত্যাজ্য।

রোজেন বলল, মিলাদুন্নবিতে (ﷺ) আমরা এখন যা করছি তা সবই বিদআত। আর নবীজি (ﷺ) বলেছেন, كل بدعة ضلالة প্রত্যেক নব্য আবিষ্কারই পথভ্রষ্টতা।

রেজা জবাব দিল, তাহলে তো তুই আমি আমরা সবাই বিদআতের মাঝেই ডুবে আছি রে দোস্ত। মাইকে আজান, ইকামাত, মোবাইল, ঘড়ি, কম্পিউটার সবই তো বিদআত তথা নব্য আবিষ্কার যা আমরা..."

রোজেন রেজার কথা শেষ হওয়ার আসেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আরে আরে দোস্ত! আমি তো বলছি আমাদের ধর্মে, ইবাদাত-বন্দেগীতে প্রবিষ্ট নতুন রীতি নীতি নিয়ে, তুই যেগুলোর কথা বললি ওগুলো তো দুনিয়াবি আবিষ্কার। ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু প্রবেশ করানো যাবে না, যেহেতু প্রিয় নবী (ﷺ) বলেছেন,

من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد

অপর রেওয়ায়াতে এসেছে,

من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"যে আমাদের ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তার অংশ নয় তা বাতিল।

রেজা মুচকি হেসে বলল, বন্ধু! তোর বর্ণিত হাদিস খানাতেই তোর দাবির বিরুদ্ধে দলিল আছে।

CamScanner

রোজেন বলল, তাই নাকি?

রেজা বলল, হাদিসখানা আবার পড়ি চল। যে আমাদের ধর্মে নতুন কিছু প্রবিষ্ট করবে যা তার অংশ নয়" ما ليس منه তা বাতিল। আর যা অলরেডি খন্ড খন্ডভাবে তার অংশ হয়েই আছে তা বাতিল হবে কেন?

রোজেন বলল, দোস্ত খুলে বল কি বলতে চাস।

রেজা বলল, ধর তুই বলছিস ঈদে মিলাদুন্নবি (ﷺ) আমরা এখন যেভাবে উদযাপন করি তা বিদআত। কিন্তু আমরা এই উদযাপনের মধ্যে যে যে কাজ করছি সেগুলো কি সেই নবীজি (ﷺ) ও সাহাবাগণের যুগ থেকেই দ্বীন তথা ইবাদাতের অংশ নয়? এই কাজগুলো কি খন্ড খন্ডভাবে আলাদা আলাদাভাবে কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত নয়?

রোজেন বলল, দোস্ত উদাহরন সহ বল। ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না।

রেজা বলল, যেমন ধর, আমরা মিলাদ শরিফে বা মিলাদুন্নবির (ﷺ) মাহফিলসমূহে কুরআন শরিফ খতম করি, তিলাওয়াত করি, না'তে রাসূল (ﷺ) পাঠ করি, জিকির করি, প্রিয়নবীর (ﷺ) জন্ম ও সিরাত শরিফ আলোচনা করি, উনার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করি, উনার উপরে দরুদ ও সালাম পাঠ করি, দোআ করি। এখানে উল্লেখিত কোন কাজটি আলাদা আলাদাভাবে ইসলামের অংশ নয় বল। এই আমলগুলো করতে কি কুরআন-সুন্নাহ আমাদেরকে যথেষ্ট উৎসাহ দেয়নি? এগুলো কি সাহাবাগণের আমল ছিল না?

রোজেন এবার একটু চুপসে গিয়ে বলল, কিন্তু দোস্ত এভাবে অনেকগুলো আমল একসাথে করে প্যাকেজ আকারে নতুন রুপে নতুন কিছু ইসলামে প্রবিষ্ট করার কথা তো কুরআন-সুন্নাহতে আসেনি।

রেজা বলল, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

CamScanner

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

"অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জিল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্যবাদ, সে তো তারা নিজেরাই বিদআত বা উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (সূরা আল -হাদিদ, সূরা নং ৫৭-আয়াত নং ২৭)

দেখ এই আয়াতে আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলেছেন, হাওয়ারীয়্যিন বা ঈসার আ: অনুসারীগণ বৈরাগ্যবাদ বা বিয়ে না করে কুমার-কুমারী থাকার এই রীতি তারা নিজেরাই বিদআত বা উদ্ভাবন করেছেন, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করতে। আল্লাহ পাক তা তাদের উপর চাপিয়ে দেননি। তারা বিদআত করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এজন্য আল্লাহ পাক তাদের এই কাজের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে কেন তারা তাদের আবিষ্কৃত সেই বিদআতের উপর কায়েম থাকেনি সেজন্য সমালোচনাও করেছেন তাদের।

আল্লাহ পাক আরো বলছেন,

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

অর্থ: "যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। আর আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর রাখেন।" [সূরা নিসা, আয়াত নং ৮৫]

রোজেন অনেকটা হতাশা নিয়ে বলল, বুঝলাম দোস্ত। কিন্তু না, এই আয়াতগুলো স্পষ্ট নয় ভাল বিদআত দ্বীনের মধ্যে প্রবিষ্ট করার বিষয়ে।

রেজা বলল, আচ্ছা কুরআন শরিফের কোন বিষয় স্পষ্ট করে না বুঝলে সাহাবাগণ কার কাছে যেতেন?

রোজেন বলল, অবশ্যই প্রিয় নবীজির (ﷺ) কাছে।

রেজা বলল, তাহলে চল আমরাও সহিহ হাদিসের দ্বারস্থ হই।

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"যে ব্যক্তি ইসলামে একটি নতুন ভাল প্রথা আবিষ্কার করল তার জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে, এবং যারা এর উপর আমল করবে তাদের জন্যও উত্তম প্রতিদান রয়েছে। এতে লোকেরা যে অনুযায়ী আমল করেছে, তাকে সব আমলকারীর সমান সওয়াব দেওয়া হবে, আবার তাদেরকে ও কম দেওয়া হবে না। আর যে ইসলামে একটি খারাপ নতুন প্রথা চালু করেছে ও লোকেরা সে অনুযায়ী আমল করেছে, তাকে সব আমলকারীর সমান পাপ দেওয়া হবে। আবার তাদের পাপে কম করা হবে না। (সহিহ মুসলিম, ৮ম খন্ড, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ -৩, হাদিস নং ৬৬১০ প্রকাশনী: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-ঢাকা)

CamScanner

আর এর সমর্থনে হাদিস শরিফে আরো এসেছে: فما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيا فهو عند الله سيء

"মুসলমানরা যে কাজকে ভাল মনে করে, আল্লাহর কাছেও তা ভাল, আর যে জিনিসকে মুসলমানরা খারাপ মনে করে সে জিনিস আল্লাহর কাছেও খারাপ।" (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা: ৩৭৯, মুসতাদরাকুল হাকিম, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৪, ইমাম বাজ্জার মুসনাদে, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৪)

এই সহিহ হাদিস দুখানা স্পষ্টভাবে প্রমান করে যে, ইসলাম নতুন রীতি প্রবিষ্ট করার সুযোগ আছে।

রোজেন এবার রেজাকে একটু চেপে ধরার চেষ্টা করল, আচ্ছা তাহলে সাহাবাগণ নবীজির (ﷺ) পর কেন নতুন ভাল রীতিনীতি ইসলামে প্রবিষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন না? আমরা কি তাঁদের চেয়ে কুরআন সুন্নাহ বেশি বুঝি?"

রেজা বলল, তোকে কে বলেছে যে সাহাবাগণ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবিষ্ট করেননি? এই নে আমি তোকে কয়েকটা উদাহরন দিচ্ছি শুধু বুখারী শরিফ এক কিতাব থেকেই, তোরা তো আবার বুখারী খুব মানিস। কিন্তু সেই বুখারীই কি ভাল করে বুঝিস?:

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. কে যখন কুরআনে পাক একত্রিত করার হুকুম দিলেন, এক মলাটে সংরক্ষণ করার কথা বললেন তখন যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. আরয করলেন:

كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ قال هو خير-

"আপনি এ কাজ কেন করতে যাচ্ছেন, যা হুযুর (ﷺ) করেননি? হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ফরমালেন, এতো ভাল কাজ।" (বুখারী শরিফ : ৮ম খন্ড : كتاب فضائل القران এর جمع القران পরিচ্ছেদ, হাদিস নং-৪৬২১, প্রকাশনী: ই:ফা:)

অর্থাৎ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সমীপে আরয করলেন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন কুরআন এক মুসহাফে একত্রিতকরণ হচ্ছে বিদআত কাজ যা প্রিয় নবীজি (ﷺ) করে যান নি। তাই আপনি কেন এই বিদআতের উদ্যোগ নিচ্ছেন? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ইরশাদ ফরমালেন- বিদআত বটে তবে উত্তম বিদআত তা ভাল কাজ। এর থেকে প্রমাণিত হলো সাহাবায়ে কিরামের কাছে বিদআতে হাসানা গ্রহণযোগ্য ছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. চাইলেই বলতে পারতেন যে, নবী করিম (ﷺ) হাদিস শরিফে স্পষ্ট বলে গেছেন যে, তোমাদের জন্য আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীন গণের সুন্নাহ মানা জরুরী। কিন্তু তিনি তা না বলে বললেন যে, কোরআন এক জায়গায় জমা করা ভাল কাজ বা উত্তম কাজ।

২। হযরত উমর রা. স্বীয় খিলাফাতের যুগে নিয়মিতভাবে জামাত সহকারে তারাবির নামায আদায় করার হুকুম দিয়েছিলেন এবং জামাত অনুষ্ঠিত হতে দেখে বলেছেন نعم البدعة هذه -এতো বড়ই ভাল বিদআত। দেখুন হযরত উমর রা. নিজেই নিজের প্রচলিত কাজকে বিদআতে হাসানা বলেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাঁর জীবনে মোট তিনদিন তারাবির নামাজ পড়েছেন। বোখারি শরিফের তারাবির নামাজের অধ্যায়ে এসেছে, হযরত আয়েশা রাঃ বর্ণনা করছেন, নবীজি (ﷺ) রামাদ্বানের রাতে মসজিদে তারাবি নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন। তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে সাহাবাগণও জামাতবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে তারাবির নামাজের মুসল্লির সংখ্যা বাড়তে থাকলে নবীজি (ﷺ) তারাবির ৪র্থ রাত থেকে তারাবি নামাজ পড়া বন্ধ করে

দেন তা ফরজ হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে। নবীজি (ﷺ) কিন্তু কখনোই কোন সাহাবীকে ডাকেননি তাঁর পেছনে জামাতবদ্ধ হয়ে তারাবি পড়তে, বরং তাঁরা কিরাত পড়ার আওয়াজ শুনে নিজ থেকে এসে শামিল হতেন। হযরত আবুবকরের রা. সময়ও জামাত বদ্ধ তারাবির নামাজ ছিলনা। হযরত উমর রা. রামাদ্বানের রাতের ৩০ দিন জামাত সহকারে তারাবিহ নামাজ চালু করেন। হযরত উমর রা. একদা হযরত আব্দুর রহমান রা. কে সাথে নিয়ে রাতে বের হলেন, যখন তিনি সবাইকে জামাত সহকারে তারাবিহ নামাজ পরতে দেখলেন তখন তিনি খুশি হয়ে বললেন"এটা কতইনা উত্তম বিদআত!" (সহীহ বুখারী, তারাবি নামাজের অধ্যায়, তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং ১৮৮৩, প্রকাশনী: ই:ফা:)

এখানেও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হযরত ওমর ফারুক রা. চাইলেই বলতে পারতেন যে, নবী করিম (ﷺ) হাদিস শরিফে স্পষ্ট বলে গেছেন যে, "তোমাদের জন্য আমার ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন গণের সুন্নাহ মানা জরুরী। কিন্তু তিনি তা না বলে বললেন যে, কতই না উত্তম বিদআত এই তারাবির নামাজ জামাতের সাথে পড়া!

৩. হযরত ওসমান রা. তৃতীয় আরেকটি আজান চালু করেন জুমআ' বারে যা জওরা নামক বাজারে দেয়া হতো।

فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال : كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ ، إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَثُرَ النَّاسُ ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.

হযরত সায়িব ইবনু ইয়াজিদ রা. বলেন, জুমআর দিনে প্রথম আজান ছিল যখন ইমাম মিম্বরে বসবেন তখন। এভাবেই চলছিল প্রিয় নবী (ﷺ), আবুবকর ও ওমরের রা: সময়ে, পরে ওসমানের রা: সময়ে মানুষের সংখ্যা যখন বাড়ল তখন জওরা নামক স্থানে তৃতীয় আজানের ব্যবস্থা করা হলো। (বুখারী, জুমআর নামাজ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: জুমআর আজান, হাদিস নং-৮৬৬, প্রকাশনী: ই:ফা:)

৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা. একদা হযরত আয়েশা সিদ্দিকার রা. ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মসজিদে নববীতে (ﷺ) বসেছিলেন, আর তখন উনার সামনে কিছু লোক যারা সাহাবী ও তাবেয়িন ছিলেন, তাঁরা মসজিদে নববীতে সালাতুত দোহা পড়ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা. কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, বিদআত"। (সহীহ বুখারী, তৃতীয় খন্ড, হজ্জ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ১১১৪: নবীজি কতবার উমরা করেছেন? হাদিস নং -১৬৬১, প্রকাশনী: ই:ফা:)

অর্থাৎ সালাতুত দোহা ঘরে না পড়ে মসজিদে পড়া বিদআত। কিন্তু তিনি আগে পরে কোনদিন কাউকে মসজিদে সালাতুত দোহা পড়তে বাধা দেন নাই। মুখে বলেছেন ইহা বিদআত, কিন্তু যদি তা খারাপ কাজ হত তবে বাধা দেয়া ওয়াজিব ছিল, যা তিনি করেন নাই। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমরের রা. মত সাহাবী যদি বাধা দিতেন তবে সবাই তা মান্য করতেন। কারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা. ছিলেন প্রিয় নবীর (ﷺ) সুন্নাতের এক জ্বলন্ত নমুনা ও সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্যতম।

কাজেই দোস্ত রোজেন, আমরা দেখতে পেলাম যে, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িন বিদআতে হাসানাহ তথা ভাল নতুন কাজের পক্ষে ছিলেন হোক না তা নতুন কোন রীতি। তবে শর্ত ছিল একটাই সেই নতুন কাজটি কুরআন-হাদিসে অনুশাসনের বিপরীত কোন কাজ হতে পারবে না।

CamScanner

রোজেন স্বীকার করতে বাধ্য হলো, বন্ধু! রেজা আমি তো ভাই কোনদিন এভাবে চিন্তা করিনি। কিন্তু এই যে তুই বলছিস খারাপ বিদআত ও ভাল বিদআত, এর একাডেমিক ভিত্তি কী? অর্থাৎ ইসলামি জ্ঞানের যারা অথরিটি বা আমাদের সম্মানিত ইমামগণ তাঁদের কিতাবসমূহে কি এই প্রকারভেদের বিষয়ে কিছু এসেছে?

রেজা বলল, দোস্ত! বিদআত (ইসলামে প্রবিষ্ট নতুন রীতি-নীতি পদ্ধতি) যে দু প্রকার তা সহিহ হাদিসেই উল্লেখ আছে, যা আমরা আমাদের আলোচনায় আগে উল্লেখ করেছি (সহিহ মুসলিম, জ্ঞানের অধ্যায়ে, হাদিস নং-৬৬১০, ই:ফা: প্রকাশনী)। তবে তোর জানার জন্য বলছি, বিদআত যে মূলত: দুই প্রকার (খারাপ ও উত্তম) তা ভারতীয় কোন আলীম বা ইমামের একাডেমিক আবিষ্কার নয়, এমনকি সমসাময়িক কোন আলীমে দ্বীনের একাডেমিক আবিষ্কারও নয়। বরং প্রথম যিনি একাডেমিক্যালি এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় একটি মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আবু ইদ্রিস আস শাফেয়ী রাহ.। যার জন্ম ১৫০ হিজরীতে। তিনিই প্রথম বিদআতকে মূল দুই ভাগে ভাগ করেন। (তথ্যসূত্র: মানাকিবে ইমাম শাফেয়ী, লেখক: ইমাম বায়হাকি) উনার উল্লেখিত এই প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অপর একজন হাদিসের ইমাম হযরত ইমাম বায়হাকী রাহ. যাঁর জন্ম আজ থেকে ১০০০ এরও বেশি বছর আগে ৩৮০ হিজরী সনে।

পরবর্তীতে ইমাম নববী, ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আব্দিস সালাম রাহ:, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতীর রাহ: মত বড় বড় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঈমানগণ বিদআতকে ওয়াজিব, মাকরুহ ও মুবাহ সহ আরো বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। দোস্ত তাঁরা কেহই কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের ইমাম ছিলেন না। সবাই আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তাঁরা সকল মতবাদের মুসলমানগণের বিশ্বস্ত ইমাম।

CamScanner

রেজা বলল, দোস্ত! তোর কি মনে হয় তোর মুরুব্বিরা ও তুই নিজে ইবাদাত বন্দেগীতে বিদআতের আশ্রয় নেস না?

রোজেন বলল, না। আমরা কুরআন-সহিহ হাদিস ছাড়া নতুন কোন রীতি-নীতি মানি না।

রেজা এবার হেসে দিয়ে বলল, তুই কি তারাবির নামাজে কুরআন খতম দিস অর্থাৎ খতমে তারাবিহতে অংশ নিস? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কি তুই মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করিস?

রোজেন বলল, হ্যাঁ এগুলো তো অতি উত্তম কাজ, রামাদ্বানে খতমে তারাবিহ পড়া ও মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়া।

রেজা বলল, দোস্ত! প্রথমত: বেতনভুক্ত ইমামের পিছনে নামাজ পড়া ও বেতনভুক্ত মোয়াজ্জিন রাখা নি:সন্দেহে বিদআত। সিহাহ সিত্তার (বিশুদ্ধ ছয়খানা হাদিস গ্রন্থ) অন্যতম প্রধান কিতাব সুনান আবু দাউদের, সালাত অধ্যায়ের, ৪৫নং অনুচ্ছেদ: আজানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে, হাদিস নং ৫৩১ (যা সহীহ মুসলিম, নাসাই, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহতেও এসেছে) পড় আর দয়া করে আমাকে বল, টাকা দিয়ে রাখা বেতনভুক্ত ইমাম আর মুয়াজ্জিনের পিছনে যে নামাজ পড়ি তা কোন সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত? সহীহ হাদিস বাদ দে এই হাদিসের মুকাবেলায় একখানা দ্বয়ীফ বা হাসান হাদিস আমাকে দেখা যা প্রমান করে যে ইমাম ও মুআজ্জিনের জন্য বেতন নেওয়া জায়েজ। চিরকৃতজ্ঞ থাকব তোর প্রতি ও তোদের মুরুব্বিদের প্রতি যদি দেখাতে পারিস। এই হাদিস খানা বুখারী শরিফ ছাড়া সিহাহ সিত্তার বাকি পাঁচখানা কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে। বিদআতে হাসানাহ বা উত্তম নতুন রীতির প্রবর্তন ছাড়া ইসলামের হাজারো হুকুম আহকাম টিকবে না। তো আমরা নবীজির (ﷺ) উপর দরুদ ও সালাতু সালাম পাঠ করার নতুন রীতি মিলাদ শরিফ চালু করলে তোদের সমস্যা হয় কেন?

CamScanner

দ্বিতীয়তঃ তারাবি নামাজ জামাতে পড়ার সিস্টেম উমর রা. চালু করেছিলেন আর তারাবি নামাজে খতমে কোরআনের সিস্টেম চালু করেছিলেন তাঁর নাতি হযরত উমর ইবনু আব্দুল আজিজ (রহঃ) যিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন, সাহাবী ছিলেন না। এটা একটা উত্তম বিদআত। তোর মুরুব্বিগণকে বল তো নিয়ম করে খতমে তারাবি পড়ার পক্ষে একখানা সহিহ দূরে থাক দ্বয়িফ হাদিস দেখাতে।

কোন সেই সাহাবী যিনি জুমুয়ার দ্বিতীয় খুতবাতে সূরা নাহলের ৯০ নং আয়াত পড়ার রুসুম চালু করেন? পারবে জবাব দিতে? না প্রিয় ভাই তিনি নবীজিও নন কোন সাহাবীও নন বরং তাবেঈ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহ. জুমুয়ার দ্বিতীয় খুতবাতে সূরা নাহলের ৯০ নং আয়াত অর্থাৎ নিম্নোল্লিখিত আয়াতখানা পড়ার রুসুম চালু করেন।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (১৬:৯০)

আচ্ছা দোস্ত রোজেন! তবে কি ধরে নেব যে, নবীজির (ﷺ) শান ও মান এবং উনার দরুদ সালামকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে ও সবার কাছে পৌঁছে দিতে আমরা নতুন কোন ভাল বিদআত যা খন্ড খন্ডভাবে ইসলাম সমর্থিত এরকম কোন কাজ করলেই তোদের মুরুব্বিদের সমস্যা শুরু হয়?

এক পর্যায়ে রোজেন রেজাকে জিজ্ঞেস করল, এই যে আজানের আগে দরুদ পাঠ করা হয় এর হুকুম কী?"

CamScanner

রেজা বলল, এটা বিদয়াতে হাসানাহ, উত্তম বিদয়াত যা জায়েজ হবে, পাঠ করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই।

তখন রোজেন রেজাকে এন্টিভেনম প্রশ্ন করল, আচ্ছা ওকে। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে, আজানের আগে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওপরে দরুদ পড়ার রীতি উত্তম বিদআত, ভাল কাজ, তাই এটা করলে ভাল, না করলে গুনাহ নাই। তো আপনি আমাকে বলুন, জামায়াতের নামাজের আগে নামাজে আসতে মানুষকে আহ্বান করে আজান ইকামাত দেয়া, এটা ভাল কাজ না খারাপ কাজ?"

রেজা বলল, অবশ্যই ভাল কাজ।

রোজেন বলল, তাহলে ঈদের নামাজের আগে এবং জানাজার নামাজের আগে আজান ও ইকামাত দিয়ে মানুষকে আহ্বান করা শুরু করি? সেটা কেমন হবে?

রেজা বলল, না। এটা জায়েজ হবে না। কারণ, এটার জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কিছু নামাজ ঠিক করে দিয়েছে। সে সমস্ত সময়ে এবং সে সমস্ত ফরজ নামাজ আদায় করার আগে কেবল আজান ইকামাত দিতে হবে। কিন্তু প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরে কখন দরুদ পড়ব আর কখন দরুদ পড়ব না তার কোন সময় ও আমল প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করে দিয়ে যান নাই।

বরং বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই হাশরের দিনে আমার সবচাইতে নিকটে থাকবে যে আমার ওপরে সবচাইতে বেশি দরুদ পাঠ করে।

CamScanner

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দিয়ে যান নাই যে, এই সময়েই শুধু দরুদ পড়বে, এই সময়ে পড়বে না। এই আমলের আগে বা পরেই শুধু পড়তে পারবে এই আমলের আগে বা পরে পড়তে পারবে না।

পবিত্র শরীরে, পবিত্র জায়গায় যখন ইচ্ছা তখন আপনি প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওপরে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন। হোক তা আজানের আগে, হোক আজানের পর (এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ, আজানের পর দরুদ প্রেরণ), হোক নামাজের আগে, হোক নামাজের পর। হোক কুরআন তিলাওয়াতের আগে হোক কুরআন তিলাওয়াতের পর। হোক ঘুমুতে যাওয়ার আগে, হোক ঘুম থেকে ওঠে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত যখন খুশি যত খুশি দরুদ পাঠ করুন ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত নামাজ আদায় করে।

রোজেন অসহায়ের মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল। এক পর্যায়ে বন্ধু রেজাকে জড়িয়ে ধরে বলল, দোস্ত! জাযাকাল্লাহু খাইরান। আল্লাহ তোকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুই এরকম সুন্দরভাবে আমাকে বুঝিয়ে না বললে হয়ত আমি আমার প্রিয় নবীর (ﷺ) ভালোবাসা বহি:প্রকাশের এই আমলগুলো থেকে সারাজীবন দূরেই থাকতাম। আল্লাহ আমায় ক্ষমা করুন। আমার জন্য দোআ কর দোস্ত।

একটি উন্নত মানের কেরানী প্রজন্ম অথবা শিক্ষিত দিনমজুর প্রজন্ম অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য!

আজ একটু অরণ্যে রোদন করতে আসলাম। জানি আমার কথা কারো কাছে পৌঁছাবে না, তবুও বলছি। আমাকে যারা ব্যক্তিগতভাবে চিনেন তারা জানেন যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুবই আশাবাদী

CamScanner

পজিটিভ মন মানসিকতার একজন মানুষ। জীবন ও দেশ-দুনিয়া সম্পর্কে হতাশ ও নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করি না কখনোই। তবুও একটা আতংক আমাকে পেয়ে বসেছে ইদানিং আমাদের এই দেশ ও জাতি সম্পর্কে।

আমাদের শিশু-কিশোর, তরুন যারা আমাদের দেশকে পরবর্তীতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে তারা কি আসলেই সঠিক পথে এগুচ্ছে? কদিন আগে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে একটি নিউজ পড়লাম যে, বাংলাদেশ নতুন আবিষ্কারের দিক থেকে এশিয়াতে নিকৃষ্টতম দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। নির্মম রুঢ় সত্য, কিন্তু বাস্তবতাও তাই বলে। আমরা আবিষ্কারে দুনিয়ার প্রায় সকল দেশ থেকে পিছিয়ে। গত কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের দেশে বলার মত আবিষ্কার বলতে একটা জিনিস আমি উল্লেখ করতে পারব, আর তা হলো পাট থেকে পচনশীল পলিথিন আবিষ্কার যা পরিবেশগত কারণে সত্যিই একটি যুগান্তকারী বিষয়।

আর আমাদের এই পশ্চাৎপদশীলতার জন্য আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকগণ, আমরা শিক্ষক সমাজ এবং অভিভাবকগণ সবাই সম্মলিতভাবে শিশু-কিশোরদেরকে যে শিক্ষার পরিবেশ আমরা দিয়েছি তাতে আমি হলফ করে বলতে পারি, এই পরিবেশে শুধু ভাল কেরানী উৎপাদনই সম্ভব। মেধা-মননশীল যুগোপযোগী বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, উদ্যোক্তা, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার ও ভাল ম্যানেজারিয়াল ক্যাপাবিলিটি ওয়ালা ইনোভেটিভ ও ডাইনামিক একটা প্রজন্ম আমরা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আশা করতে পারি না। এই প্রজন্মের দ্বারা নতুন আবিষ্কার তো দূরের কথা ভাল অনুকরণও সম্ভব হবে না। আসলে তাদের মেধা বিকাশের সময় কোথায়?

CamScanner

ভেঙ্গে বলি, কথা বলছিলাম অংকুরেই শিশুদের মেধা ও প্রতিভা বিনষ্ট করে দেয়া শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে। আমাদেও মাথানষ্ট এই শিক্ষা পদ্ধতিতে ৪-৬ বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের সময়টা কাটে আইডিয়াল ভিকারুন্নেসার মত তথাকথিত নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নিতে। ৭-১০ বছর পর্যন্ত বয়সটা কাটে পিইসিতে জি পি এ ফাইভ পাওয়ার চাপে চাপে। ১২-১৪ বছর বয়সটা কাটে জে এস সিতে টপ করার চিন্তায়। পরে শুরু হয় এস এস সিতে জিপিএ ফাইভ আর গোল্ডেনের আসল টেনশন। এস এস সি পাশ করতে করতেই এইচ এস সিতে টপ করার প্রতিযোগীতা। পরে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিযুদ্ধ। সে তো এক মহারন।

আরে ভাই! আমি তো বলি বাচ্চাগুলো যে পাগল হয়ে যাচ্ছে না এটাই তো বেশি। এত এত ভর্তিযুদ্ধ, প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা ও বোর্ড পরীক্ষার মাঝে বাচ্চাদের মেধা বিকাশ ও প্রকৃত জ্ঞানার্জনের সময় কই? পরীক্ষার প্রিপারেশনের মধ্যেই তো তাদের জীবন কেটে যাচ্ছে! আজব সেলুকাস! পরীক্ষাতে পাশ করা ও টপ করার প্রিপারেশনকে নিশ্চয়ই সভ্য দুনিয়াতে জ্ঞানার্জন বলে না।

আমরা ভুলে গেছি যে, হান্টার দাবড়িয়ে প্রশিক্ষিত সার্কাসের জানোয়ার তৈরি করা যায়, প্রকৃত মানুষ না। আমার সন্তান অমুক স্কুলে পড়ে, আর তমুক স্কুলে পড়ে এটা বলার জন্য সন্তানটাকে শুরুতেই ভর্তিযুদ্ধে ঠেলে দিই। আর কি পড়ানো হয় সেসব স্কুলে? খবর নিয়ে দেখলাম, না, স্কুলে পড়ালেখা নেই! সব পড়ালেখা সেসব তথাকথিত নামকরা স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বাসা ও কোচিংয়ে। ঢাকার এক নামকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ডায়লগ পড়লে পড়, না হয় রিক্সা চালা গিয়ে যা। আন্দাজ করা যায় তিনি কি আদর্শ মানুষ গড়বেন!

CamScanner

এখন আসি অভিভাবকগণের কথায়। আরেব্বাপরে! অল্প কয়েকজন অভিভাবক ছাড়া, বেশিরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে সে তো এক মানসিক রোগীর গল্প। নার্সারিতে কার ছেলে ফার্স্ট আর কার ছেলে সেকেন্ড তা নিয়ে প্রতিযোগীতা ও মিষ্টি খাওয়া-খাওয়ি হয়। আজব সেলুকাস!

আমাদের স্কুলের নার্সারি ক্লাশের শিক্ষিত একজন গার্ডিয়ান আমাকে এসে একদিন বলছেন, স্যার! আপনার স্কুলের নার্সারির সিলেবাস তো খুব কম। অন্যান্য স্কুলে তো আরো অনেক কিছু পড়ায়।

আমি নিজেকে খুব কষ্টে সংযত করে ভদ্র ভাষায় বললাম, ভাইজান যে বয়সে আপনার ছেলে বাংলা, ইংলিশ ও আরবি বর্নমালা এবং সংখ্যাগুলো লিখতে শিখে গেছে সেই বয়সে ইউরোপ আমেরিকার বাচ্চাগুলোকে পেন্সিলই ধরতে দেয় না। তারা কি জ্ঞান-বিজ্ঞানে আজ পৃথিবীর উন্নত জাতি না? তারা কি আমাদের চেয়ে পিছিয়ে আছে? নার্সারির বাচ্চা রিডিং পড়া শিখে যাবে তা আশা করছেন? নার্সারির ক্লাসে তো কোন সিলেবাস থাকাই উচিৎ ছিল না। ৪-৫ বছরের বাচ্চারা শিখবে ও পড়বে মুক্ত বিহঙ্গের মত। কোন সিলেবাসের গন্ডীতে তাদেরকে বেঁধে দেব কেন?"

আরে এই বয়সে তো আমাদের জেনারেশনের কেউ স্কুলেই যায় নি। তো আমাদের জেনারেশনটা কি একদম পিছিয়ে গেছে?

ইউরোপ আমেরিকাতে ৪ বছর বয়সের বাচ্চাকে স্কুলেই নেয় না। আর নিলেও তাদেরকে শুধু খেলাধুলা করায়, রঙতুলি দিয়ে আঁকিজুকি করায় এবং সেই খেলার ছলে যদি দু চারটি অক্ষর শিখে নেয় তবে তাই যথেষ্ট। আমাদের দেশের মত এরকম চাপ দেয়া হয় না তাদেরকে অল্প বয়সে বেশি শেখার জন্য।

CamScanner

আফসোস যে, কেউ এসে জানতে চান না, মিথ্যা বলা পাপ, কাউকে ঠকানো অন্যায়, ওয়াদা ভঙ্গ ঠিক না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ, শেয়ারিং-কেয়ারিং, বাজে কথা না বলা, দেশের প্রতি, মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য এসব জিনিস শেখাই কি না!

আমাদের স্কুলে আমরা হাতের লেখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিই। হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকও নিয়েছি আমরা। তবুও আমাদের প্রিয় অভিভাবকগণের যত টেনশন বাচ্চাদের হাতের লেখা নিয়ে। এমন চাপ দেয়া হয় যে, তাদের হাতের লেখা হতে হবে ছাপা অক্ষরের মত। আজব! তারা কি নিজ হাতে বই লিখবে? হাতের লেখা ছাপা অক্ষরের মত কেন হতে হবে? নার্সারী শ্রেণি থেকেই ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়ার তাড়াও দেয়া হয়।

একদম নাম মাত্র ফিতে আমাদের স্কুলে শনিবার দিন ফানক্লাস নামে একটা বিষয় রেখেছি। বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও দেখাই, স্টোরিটেলিং ক্লাস হয়, তাদেরকে একটু ইন্টারেকশন করতে শেখাই, ড্রইং শেখাই, ক্রাফটিং শেখাই, দেশাত্মবোধক গান ও ইসলামি সংগীত শেখাতে চেষ্টা করি। এই ক্লাস নিয়েও অভিভাবকদের অনেকের কমপ্লেইন। স্যার ফানক্লাস নামক এরকম কোন জিনিস তো অন্য কোন স্কুলে নাই! তো হলো আপনার নতুনত্বের সমাধী?

তার উপর যোগ হয়েছে এখন বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল ডিভাইস। বাচ্চারা এখন স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবের কারণে পাশে বসে থাকা কারো সাথেই ইন্টারেকশন করতে আগ্রহী না। গেইমস আর ইউটিউব আছে আর তারা আছে।

এসব নানাবিধ কারণে আমাদের এই জেনারেশনের বাচ্চাদের মধ্যে লিডারশিপ কোয়ালিটি গড়ে ওঠছে না, বরং একটা শিক্ষিত দিনমজুর

CamScanner

শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। আমরা মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে দেখি ভীনদেশি লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট-সরকারী অফিস আদালত এবং ফ্যাক্টরির ম্যানেজারিয়াল পদগুলোতে বসে আছে আর আমাদের দেশীয়রা সেসব জায়গায় দিন মজুরসম কাজ করে যাচ্ছে। কারণগুলো কি কখনো আমরা খতিয়ে দেখেছি?

যদি এখনো আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন না আনি তবে সামনের সময়টা আরো খারাপ হবে। আফসোস! পি ই সি, জে এস সি নামক কিছু "মেধাঘাতক পরীক্ষা" যোগ করা সহ শত শত বার প্রশ্নফাঁসের মত নেক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। আফসোস!

CamScanner

লেখক পরিচিতি

সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আজহারি ১৯৮২ সালের ৬ই আগস্ট হবিগঞ্জ জেলার রিচি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম জনাব সৈয়দ গোলাম মোস্তফা এবং তার মায়ের নাম বেগম সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার। সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আজহারি হবিগঞ্জ থেকে দাখিল এবং মাদ্রাসা ই আলিয়া- ঢাকা থেকে আলিম ও পরবর্তীতে মুহাম্মাদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা থেকে ফাজিল পাশ করেন। ২০০৪ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য মিশরের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং ধর্মতত্ত্ব অনুষদের হাদিস শরীফ বিভাগ থেকে বি.এ. (অনার্স) সম্পন্ন করেন। ২০০৯ সালে মাস্টার্স করার জন্য ইংল্যান্ডের গ্লোস্টারশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ২০১০ সালে সেখান থেকে ইসলামিক ব্যাংকিং এর ওপর মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার দক্ষিণ বনশ্রীস্থ লিবারেল ইসলামিক স্কুল, ঢাকা (LISD) তে অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্তব্যরত আছেন। তিনি ঢাকা শান্তিপুর জামে মসজিদের খতিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

CamScanner